বংশ পরিচয়।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রজাপতি, মজলিস ও শ্রীরামপুর

সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০।

মূল্য—৩৲ টাকা।

কলিকাতা ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত রসিকলাল পান দ্বারা মুদ্রিত ও
২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

যিনি

বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙ্গালার শিল্পে,

বাঙ্গালায় বিদ্যাবিস্তারে

ও

বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে

অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া সমগ্র দেশের শ্রদ্ধা ও

কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন

সেই মহারাজ

স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই,

মহোদয়ের করকমলে

বংশ পরিচয় ৫ম খণ্ড

শ্রদ্ধা সহকারে

উপহৃত

হইল।

মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই।

সূচীপত্র।

স্বর্গীয় মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর

বংশ-পরিচয়

(পঞ্চম খণ্ড)

ভূকৈলাস রাজবংশ।

জেলা ২৪ পরগণার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের মধ্যে ভূকৈলাস রাজবংশই প্রথম উল্লেখযোগ্য। নানা প্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠান এবং দানশীলতার জন্য এই বংশ চিরদিনই বিখ্যাত। বঙ্গদেশের মধ্যে এমন কি ভারতের অন্যত্রও ভূকৈলাস রাজবংশের কথা সকলেরই কিছু না কিছু জানা আছে।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর। ইনি কলিকাতা গড়-গোবিন্দপুরের প্রসিদ্ধ ধনী ব্রাহ্মণ কন্দর্প নারায়ণ ঘোষালের পৌত্র। ফোর্ট-উইলিয়ম নির্ম্মাণকালে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট গোবিন্দপুর লইলে, কন্দর্প ঘোষাল খিদিরপুর গিয়া নূতন আবাস নির্ম্মাণ করেন। এই কন্দর্প ঘোষালের বংশধরগণই কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বাস হেতু "কলিকাতার ঘোষাল" বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার দুই পুত্র, কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষাল ও গোকুল চন্দ্র ঘোষাল।

গোকুল চন্দ্র বাঙ্গালার গভর্ণর ভেরেলষ্ট (Verelst) সাহেব বাহাদুরের দেওয়ান ছিলেন এবং স্বোপার্জ্জিত বিশাল সম্পত্তির অধিপতি হইয়াছিলেন। ত্রিপুরারাজ দুর্গামাণিক্য দেব বর্ম্মা বাহাদুর এক বার সদর

দেওয়ানিতে মোকর্দ্দমার সময় ইঁহার নিকট প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় ১৮০৯ খৃঃ অব্দে তিনি ত্রিপুরার সিংহাসনারোহণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণ দেওয়ান গোকুল চন্দ্রকে কয়েকটী গ্রাম নিষ্কর দান করেন। গোকুল চন্দ্রের দুই পক্ষ ছিল—প্রথমা স্ত্রী চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গোকুল চন্দ্রের সহগমন করিয়াছিলেন—খিদিরপুরের "সতী-ঘাট" ভগ্নাবস্থায় তাঁহাদের চিতার পবিত্র অনল যেন এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছে। দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (অর্থাৎ কৃষ্ণ চন্দ্রের একমাত্র পুত্র) জয়নারায়ণ ঘোষাল সেই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

জয়নারায়ণ ১১৫৯ বঙ্গাব্দে ৩রা আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫ বৎসর বয়সেই বাঙ্গালা, হিন্দি, সংস্কৃত, আরবী, পারসী, ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১১৭২ সালে তিনি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব মবারক উদ্দৌলার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিন বৎসর পরে সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জন্ সেকস্‌পেয়রের সহকারীর পদ গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় এবং সদনুষ্ঠানে এত দূর প্রীত হইয়াছিলেন যে গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ জাহান্দার শাহার নিকট হইতে ইঁহাকে রাজ সনন্দ আনাইয়া দেন। ১১৮৮ সালে তিনি বাদসাহ কর্ত্তৃক "মহারাজ বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন এবং সাড়ে তিন হাজারী মনসবদারী (অর্থাৎ সাড়ে তিন সহস্র অশ্বারোহী রাখিবার ক্ষমতা) প্রাপ্ত হন। তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার পরও বিবিধ রাজকার্য্য এবং জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে কোন বেতন বা পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। তিনি যে বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, উত্তরকালে আরও তাহা বিস্তৃত করেন।

সাড়ে তিন হাজারী হইবার পর "মহারাজ জয়নারায়ণ" খিদিরপুরের সন্নিকটে একটী বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে গড়বন্দী প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় স্থানে স্থানে শিব স্থাপনা ও অন্যান্য দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাসাদের নাম "ভূকৈলাস" রাখেন এবং তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পতিত-পাবনী মূর্ত্তি ও কমলেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর, রাজরাজেশ্বর নামে শিবলিঙ্গত্রয়, পঞ্চানন, মহাদেব, গঙ্গা, গণেশ, কার্ত্তিক, সূর্য্য, রাম সীতা, হনুমান, কালভৈরব প্রভৃতি বিগ্রহ এবং প্রাসাদ আঙ্গিনার শিব গঙ্গা ও সত্যগঙ্গা নামক সরোবরদ্বয় প্রকৃতই ঐ স্থানের "ভূকৈলাস" নাম সার্থক করিয়াছে। প্রতিবৎসর "শিবরাত্রি" ও "চড়কের" সময় সপ্তাহব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তিনি ১১৮৭ বঙ্গাব্দে কালীঘাটে ৺কালীমাতার ৪খানি হাত রৌপ্যে গড়াইয়া দেন।

মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল যেমন বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন তেমনই প্রচুর অর্থ, ধর্ম্ম ও সমাজের কল্যাণার্থে অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন এবং নর-নারায়ণের সেবার্থে অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ১৭৭৪ অব্দে কাশীতে ইঁহার পুণ্য কীর্ত্তির সূত্রপাত হয়, ঐ বৎসর তিনি এখানে বিজয় নগরম্ (Vizanagram) রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে "করুণানিধান" নামে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং ভূকৈলাস নামে আর একটী দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভূকৈলাসস্থ "গুরুধাম" মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের অক্ষয় পুণ্য স্মৃতি ধারণ করিয়াছে। এখানে দ্বাদশ শিবমন্দির পরিবেষ্টিত একটি "গুরু মন্দির" আছে। সেই মধ্য মন্দিরে শ্বেত পাথরের ও কোষ্ঠি পাথরের নির্ম্মিত একটী যুগলমূর্ত্তি বিরাজিত। প্রশান্ত সুন্দর শ্বেত গুরুমূর্ত্তির বক্ষে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কৃষ্ণমূর্ত্তি শিষ্য জয়নারায়ণ। শিষ্যের আত্মসমর্পণের যেন

জীবন্ত মূর্ত্তি। এই গুরুশিষ্য মূর্ত্তির জন্য উক্ত দেবালয়ের নাম "গুরুধাম" এবং বঙ্গদেশে ঝালকাটী (বরিশাল) প্রভৃতি স্থানে গুরুর স্মরণার্থে কাশীর অনুকরণে আরও অনেক গুরুধাম স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাশীতে বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, দর্শন এবং সংস্কৃত সাহিত্য ব্যতীত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ অভাব দর্শনে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঐস্থানে সকল জাতির বালকদিগকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, আরবী, পারসী ও ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য এক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, উক্ত বিদ্যালয় তিনি তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণের আহারের ও উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয়ের স্থায়ী মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করতঃ বহু বৎসর সুচারুরূপে চালাইয়াছিলেন। পরে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান বিশৃঙ্খল হইবার আশঙ্কায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে কাশীধামে চার্চ্চ মিশন সোসাইটীর মিশনারিরা তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার ও বহু জনহিতকর কার্য্য দেখাইয়া দেশবাসীকে মুগ্ধ করেন, উক্ত মিশনারীগণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া স্বর্গীয় মহারাজ জয়নারায়ণও মুগ্ধ হন, এবং তাঁহার শারীরিক পীড়ার জন্য তত্ত্বাবধানে অসুবিধা হইবে এই চিন্তা করিয়া ১৮১৮ অব্দে [illegible] অক্টোবর তারিখে দানপত্রের দ্বারায় চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটীর হস্তে উক্ত বিদ্যালয় অর্পণ করেন, এবং ঐ বিদ্যালয় পরিচালন ও ছাত্রদিগের ভরণপোষণ জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। উক্ত বিদ্যালয় ঐ সময় ভারতবর্ষের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বপ্রধান বিদ্যামন্দির হইয়া উঠিয়াছিল, বিদ্যালয়ে ঐ সময় ৩৫০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিত। * গ্রেট বৃটেনে লর্ড বেকন এবং বঙ্গে রাজা

* Vide—The History of Protestant Missions in India by the Rev.. M. A. Sherning M. A. L. L. B. London, Edited, 1825 Page 185)

স্বর্গীয় রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর

রামমোহন রায়ের মত কাশীতে মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল শিক্ষার স্রোত নূতন পথে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে জাষ্টিস্ সৈয়দ মামুদের History of English Education in India নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—

"সেকেলে 'পৌত্তলিক' প্রৌঢ় মহারাজ ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে একরূপ চক্ষে কাশী দেখিয়াছেন, আর একেলে 'অপৌত্তলিক' হিন্দু মহর্ষি ৺দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পৌত্র যুবা ৺বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর আর একরূপ চক্ষে কাশী দেখিয়াছেন"—এই ভাবে বিখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার 'কাশীর বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। * জয় নারায়ণ ঘোষালের সাহিত্যানুরাগ এবং কবিত্বশক্তি বড় সামান্য ছিল না। তিনি একজন রাজকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি "শঙ্করী সঙ্গীত" "ব্রাহ্মণার্চ্চনাচন্দ্রিকা" ও "জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম" নামে তিনখানা সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং "করুণা নিধান বিলাস" নামক শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন ও "কাশীখণ্ডের" বঙ্গভাষায় ছন্দোবন্ধানুবাদ প্রকাশ করেন। এইরূপ বহু সদ্গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গ দেশের ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে "কাশী পরিক্রমার" প্রধান বর্ণনীয় নগর বর্ণন-অংশ রাজা জয়নারায়ণ স্বয়ং রচনা করেন। ইনি কাশীতে বহুকাল বাস করিবার পর ১২২৮বঙ্গাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে "মণিকর্ণিকা তীর্থে" কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় দিবা দ্বিপ্রহরের সময় পরলোকে মহাপ্রস্থান করেন।

মহারাজ জয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল সিন্ধু সমরের সময় তাঁহার বদান্যতা ও সৎকীর্ত্তির জন্য লর্ড এলেন বরা কর্ত্তৃক "রাজা

(* ভারতবর্ষ ১৩৩০।১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা—কার্ত্তিক)

বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। রাজা কালীশঙ্কর কাশীতে অন্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অসহায় অন্ধগণের অশন, বসনাদির জন্য যাবতীয় ব্যয়ের তিনি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় এক মহাপুরুষ যোগী ভূকৈলাসে আবির্ভূত হন। এই মহাপুরুষকে শিবপুর গঙ্গাচরের নিকট ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহার সমস্ত দেহ শৈবাল ও জলজ বৃক্ষে আবৃত হইয়া গিয়াছিল, অনেকেই এই মহাপুরুষকে দেখিয়াছেন। বহু অর্থব্যয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মূল ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ সাধারণে সর্ব্ব প্রথম প্রচার করিয়া ইহা বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ জয়নারায়ণের চতুর্থ প্রপৌত্র ও রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র রাজা সত্য চরণ ঘোষাল বাহাদুর বর্ত্তমান কাশীর "জয়নারায়ণ কলেজ" ভবনটী অনেক টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া এবং স্কুলের ব্যয়নির্ব্বাহ ও পরিচালনার জন্য আরও বহু সহস্র মুদ্রা উক্ত কলেজের ট্রাষ্টী চার্চ্চ মিসনারী সোসাইটীর হস্তে অর্পণ করেন এবং বিদ্যার্থীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য এতৎব্যতীত ষাট টাকা মাসিক বৃত্তি ও একটি একশত টাকা মূল্যের স্বর্ণ পদক দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। ইঁহারই যত্ন ও উদ্যোগে কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ইনি উক্ত এসোসিয়েসনের (Foundation) ফাউনডেশন মেম্বর এবং সেক্রেটারী ছিলেন। ইনিও স্বদেশের কল্যাণার্থে বহু দান করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার মেডিকেল কলেজে রোগীদিগের জন্য ইঁহার নামে একটী ওয়াড´ আছে, ইহাতে তিনি দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ আরও অনেক সৎকীর্ত্তি তাঁহার আছে। ইনি পরে বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

স্বর্গীয় কুমার সত্যাঙ্গ ঘোষাল ।

মহারাজ জয় নারায়ণের পঞ্চম প্রপৌত্র রাজা সত্যচরণের অনুজ রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর সি, এস, আই, উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য হন।

রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুরের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার অগ্রজ রাজা সত্য চরণ ঘোষাল বাহাদুরের একমাত্র পুত্র সত্যানন্দ ঘোষাল ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন এবং রাজা সত্যানন্দই এই বংশের শেষ রাজা উপাধিধারী। রাজা সত্যানন্দের কনিষ্ঠদ্বয় কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল বাহাদুর ও কুমার সত্যসত্য ঘোষাল বাহাদুর। কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল বাহাদুর কলিকাতার প্রথম অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং সাধারণ কার্য্যের ও স্বায়ত্বশাসনের প্রথম অঙ্কুর কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর একজন পাণ্ডা ছিলেন। ইনি অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন।

এই "ভূকৈলাস রাজবংশ" চিরদিনই দানশীলতার জন্য এবং দেশ-হিতৈষণার জন্য বিখ্যাত। এমন কি সম্প্রতিও কলিকাতার প্রথম মেয়র স্বর্গীয় সি, আর, দাশ মহাশয়ের পরলোক গমনের কিছু পূর্ব্বে তাঁহাকে একটি বিশেষ ঋণভার হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। এই দানের সম্বন্ধে "ভূকৈলাসের" সকল কুমার বাহাদুরগণই একমত হইয়া বদান্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ভুলুয়া, ঢাকা, খুলনা, চব্বিশপরগণা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত জমিদারী আছে। ইঁহাদের বাৎসরিক গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব দেড়লক্ষাধিক টাকা।

স্বর্গীয় কুমার সত্যাঙ্ক ঘোষাল বাহাদুরের পুত্র কুমার সত্যপ্রিয় ঘোষাল বাহাদুর মহোদয়ের উদ্যমে ও সৌজন্যে আমরা ভূকৈলাসরাজ

বংশের এই ইতিবৃত্ত সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছি। এস্থলে উক্ত কুমার বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কুমার সত্যপ্রিয় ঘোষাল বাহাদুর শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আপন মাতামহ ফরাসী চন্দননগরনিবাসী স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে থাকিতে বাধ্য হন। পরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকান্তে আপন মাতুল স্বনামধন্য ডাক্তার বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ ও চরিত্রগঠন করিতে যথেষ্ট সুযোগ পান।

কুমার সত্যপ্রিয় ঘোষাল।

ভূকৈলাস রাজবংশ তালিকা।

সুধানিধি (কান্যকুব্জ হইতে গৌড়াগত)
|
ছান্দড় (রাঢ়ীয় বংশ প্রতিষ্ঠাতা)
|
শ্রীধর
|
সুরভি
|
সাগর
|
তমোপহ
|
বিশ্বামিত্র
|
জিতামিত্র
|
শরণি
|
পিঙ্গল
|
শিব ঘোষাল (বল্লালী কুলীন)
|
উধো (উদ্ধব)
|
কোচ
|
আভি (অভ্যাগত)
|
পশু (পশুপতি)
|
উদয়
|

বাণেশ্বর
বিশ্বনাথ
কংসারি
শ্রীধর
যদুনাথ পাঠক
গোপীকান্ত
রামকৃষ্ণ
রাজেন্দ্র পাঠক
বিষ্ণুদেব পাঠক
কৃষ্ণদেব পাঠক
O
রাম দুলাল
কন্দর্প ঘোষাল
রামনিধি
রাম লোচন
O
কৃষ্ণচন্দ্র
গোকুল চন্দ্র
রামচন্দ্র
O

কৃষ্ণচন্দ্র
মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর
বৃন্দাবন
রাম নারায়ণ
হরিনারায়ণ
লক্ষ্মী নারায়ণ
গঙ্গানারায়ণ
রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর
কুমার কালীকান্ত
কুমার সত্যপ্রসাদ
কুমার সত্যকিঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর
রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর
সত্যপ্রসন্ন
সত্যভক্ত
সত্যজীবন
সতীদেবী
সাবিত্রী দেবী
কুমার সত্যরঞ্জন,
সত্যকৃষ্ণ
বসুমতী দেবী
সত্যদয়াল
সত্যবল্লভ

গৌরীপুর রাজবংশ।

আসাম প্রদেশের মধ্যে রাঙ্গামাটির বড়ুয়া বংশ সম্মান ও মর্য্যাদায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্গদেশ, মিথিলা ও কামরূপের রাজদরবারেও ইহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এই বংশ অতি প্রাচীন। আসাম, বঙ্গদেশ মিথিলার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও এই বংশের অস্তিত্ব ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাংখ্যদাস। তাঁহার পুত্র টঙ্কপাণি এবং তাঁহার পৌত্র চক্রপাণি দাসকে তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা "জয়স্থ কায়স্থ টঙ্কপাণি ও চক্রদাস" বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহারা বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপালের রাজসভার সদস্য ছিলেন। ইহারা পিতা পুত্রে দুইজনে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কাশীদাসের "করণ বর্ণনা" বা "আদি ঠাকুর" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে কায়স্থ সাংখ্যদাস রাঢ় নামক দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র টঙ্কপাণি ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে পৈতৃক ভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং গৌড়ের রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপাল তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আপন দরবারে স্থান দেন এবং তাঁহাকে প্রধান সম্পাদকের পদ প্রদান করেন। অল্প দিনের মধ্যে আপন কার্য্যকুশলতার গুণে তিনি ধর্ম্মপালের চিত্ত আকর্ষণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহার নাম "মহা সিদ্ধাচার্য্য" হয়। তিনি তন্ত্র শাস্ত্রের কয়েক খানি ভাষ্য ও টীকা রচনা করেন এবং তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে

কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থও লেখেন। উক্ত তিব্বতীয় গ্রন্থকার বলেন যে, টঙ্কপাণির সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের পর তাঁহার পুত্র চক্রপাণি ধর্ম্মপালের রাজ সভায় পিতার শূন্যপদে উপবেশন করেন। তিনিও রাজা ধর্ম্ম-পালের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। চক্রপাণি দাস একজন শ্রেষ্ঠকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র সুরদাস ও ধীর দাস রাজানুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাটলিপুত্র ত্যাগ করিয়া উত্তর বঙ্গের বারেন্দ্র ভূমিতে আগমন করেন।

সুরদাসের প্রপৌত্র রাজ্যধর কুব্‌চায় বা কোচবিহারে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার পুত্র আর্য্য শ্রীধর লক্ষ্মীকর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি কামরূপের রাজার অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কর্ণাটের একদল সৈন্যকে পরাজিত করিয়া কোচবিহার রাজ্য পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। আর্য্য লক্ষ্মীকরের পুত্র শূলপাণি, তাঁহার অপর নাম বংশীদাস। তাঁহার দুইপুত্রছিল। পিনাকপাণি ও চক্রধর। চক্রধরের অপর নাম সূর্য্যধর তিনি এত পরাক্রমশালী ছিলেন যে, যদুবীরকে গ্রাহ্য করিতেন না। এই যদুবীর কে তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে তিনি সম্ভবতঃ যাদব বংশের জাতবর্ম্মার কেহ হইবেন এবং শ্যামল বর্ম্মা বা হরিবর্ম্মার পিতা হইবেন।

পিনাকপাণির পুত্র টঙ্কপাণি একজন বড যোদ্ধা ছিলেন। তিনি গৌড়ের রাজাকে সাহায্য করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া গৌড়াধিপতির মন্ত্রী স্বীয় কন্যার সহিত টঙ্কপাণির বিবাহ দিয়াছিলেন। কাশীদাস বলেন, টঙ্কপাণির সহিত গৌড়রাজ-মন্ত্রী কন্যার বিবাহ দেওয়ার ফলে দেব ও দাস বংশ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং উত্তর দক্ষিণ ভারতের কায়স্থদের মধ্যে মিলন হয়।

কাশীদাসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গৌড়ের মন্ত্রী, "দেব" উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। ভব বর্ম্মার বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে তাঁহার পিতামহ জাতবর্ম্মা কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাম-চরিত পাঠে জানা যায় যে তৃতীয় বিগ্রহপাল, চেদীরাজ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা যৌবনেশ্বরীকে বিবাহ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রীর নাম যোগদেব। চেদীরাজকুমারীর সহিত রাজার বিবাহের উৎসব যখন চলিতেছিল, তখন রাজা তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া মন্ত্রী যোগদেবকে তাঁহার কন্যার সহিত কোচবিহারের করদ রাজা টঙ্কপাণির বিবাহ দিতে বাধ্য করেন। টঙ্কপাণি রাজাকে যুদ্ধে সাহায্য করিয়া রাজার কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই বিবাহে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান প্রধান কায়স্থগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কায়স্থ জাতির সামাজিক ইতিহাসে এই দিনটি স্মরণীয় দিন। রাজা টঙ্কপাণির পুত্র রত্নপাণি ম্লেচ্ছদের হাতে পরাজিত হন এবং কোচবিহার রাজ্য ম্লেচ্ছদের হস্তগত হয়।

কামরূপের নানা স্থানে যে তাম্রশাসন পাওয়া যায় তাহা পাঠে দেখা যায় যে, শাল স্তম্ভ, বিগ্রহ স্তম্ভ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ রাজাদের নাম উল্লেখ আছে। এই ম্লেচ্ছেরা ভগদত্তের বংশধর। ম্লেচ্ছেরা "মেছ" নামে বর্ত্তমানে পরিচিত এবং বর্ত্তমানের কুচবিহার রাজবংশ।

রাজা রত্নপাণির পুত্র নরসিংহ দাসের "ঠাকুর" উপাধি ছিল। যদুনন্দনের "বারেন্দ্র ঠাকুর" নামক গ্রন্থে নরসিংহ দাসকে "কচ্ছ" বা কোচদের রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ্য হারাইয়া ঠাকুর নরসিংহ দাস সম্ভবতঃ কোচবিহার ত্যাগ করিয়া উত্তর বঙ্গে আসিয়া তাঁহার মাতামহের সহিত বাস করিতে থাকেন। তাঁহার মাতামহ উত্তর বঙ্গের একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন।

মাতামহের মৃত্যুর পর নরসিংহ দাস নিজে সেই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বাঙ্গালার রাজা রামপাল "মহাসলহানাকে" বঙ্গের প্রধান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। নরসিংহ দাস এখানে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শাহ সুলতান একটি গেট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গেটের উপরে "শ্রী নরসিংহ" এই কথা খোদিত থাকায়, এই বিশ্বাস হয় যে নরসিংহ দাস "রাজা" ছিলেন এবং রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ নরসিংহ দাস ঠাকুর, পাল রাজাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বল্লাল সেনের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন না। তিনি পাল রাজাদিগের এতদূর ভক্ত ছিলেন যে, তিনি তাঁহার তিন পুত্র বাটুদাস, পাটুদাস ও ভুবনের মধ্যে, বাটুদাস বল্লালের অধীনে পূর্ব্ব বঙ্গের গবর্ণরত্ব গ্রহণ করায় তিনি তাঁহাকে জমিদারীর স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বাটুদাসের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীধর "শক্তিকর্ণামৃত" নামক একখানি কবিতা পুস্তক লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই কবিতা-গ্রন্থে নিজের কতকগুলি সুন্দর কবিতা ছাড়া অনেক সংস্কৃত কবিদের মূল্যবান কবিতারাশি সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সেন রাজবংশেরও অনেক কবিতা ছিল।

দেবধর বা শ্রীধর ঠাকুর চক্রপাণির পুত্র ছিলেন। সূর্য্যধর যাদবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সামন্ত সেন কর্ণাট ক্ষত্রিয়-শাখাসম্ভূত ছিলেন। তিনি বল্লাল সেনের প্রপিতামহ ছিলেন। কর্ণাটের ক্ষত্রিয়েরা চেদী বংশীয় সম্রাট কর্ণদেবের সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন। সম্রাট কর্ণদেব গৌড় দেশ জয় করিয়া যখন সমগ্র ভারতে তাঁহার অপরাজেয় শক্তির বিকাশ দেখাইতে যত্ন করিতেছিলেন, তখন কর্ণাটের ক্ষত্রিয়েরা বঙ্গদেশের নানা স্থানে করদ রাজারূপে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

বলরামবাবুর
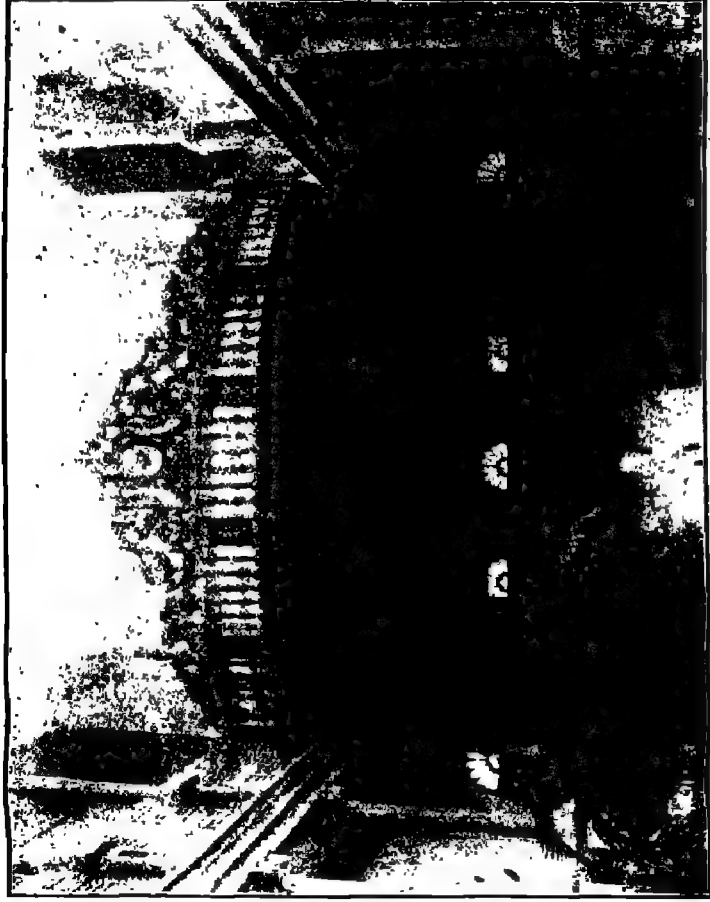
সম্রাট বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহারা পাল ও বর্ম্ম রাজাদের রাজ্য সমূহ একে একে অধিকার করিতে লাগিলেন। সূর্য্যধর আরও উন্নতি করিবার জন্য বিদ্রোহী ক্ষত্রিয় রাজাদের সহিত নৌকায় যাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সম্ভবতঃ যাদব রাজাদের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিতেন। তিনি যাদব রাজাদের শক্তির নিকট কখনও মাথা নত করিতেন না। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র শ্রীধর ঠাকুর বাল্যাবধি কর্ণাট ক্ষত্রিয়দের অভ্যুত্থান দেখিতেছিলেন এবং তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজাদের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন ক্রমে ক্রমে সমগ্র রাঢ় দেশের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাল ও বর্ম্ম রাজাদের প্রাধান্য নাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার জ্ঞাতি কর্ণাটক নান্যদেব একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে যাইয়া পরাস্ত হইয়াছিলেন এবং বিজয় সেন তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন। কর্ণাটক নান্যদেব বিজয় সেনের প্রভুত্ব স্বীকার করায় বিজয় সেন তাঁহাকে একদল সৈন্য দেন এবং তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। কর্ণাটক নান্যদেব সেই সৈন্যদের সাহায্যে মিথিলা রাজ্য জয় করেন। তাঁহার সহিত এই নূতন রাজ্যে সাহসী যোদ্ধা শ্রীধর ঠাকুর গিয়াছিলেন। মিথিলার ইতিহাসে নান্যদেবকে তত্রত্য কর্ণাটক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীধর ঠাকুরকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীধরের প্রপিতামহ লক্ষ্মীকর কর্ণাটক হইতে আসিয়া মিথিলার "বাসাইন" গ্রামে বাস করিয়াছিলেন একথা সত্য নহে। শ্রীধর বিষ্ণুর যে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই প্রতিমূর্ত্তির নীচে যে খোদিত অক্ষর সমূহ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ মূর্ত্তি বিজয়ী নান্যদেবের রাজত্ব কালে শ্রীধর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীধর বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে সূর্য্যস্বরূপ

ছিলেন। শ্রীধর যে বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় রাজসম্ভূত ছিলেন তাহা এই খোদিত কথাগুলি হইতেই স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে এবং শ্রীধর যে বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ হয় না। সম্ভবতঃ তিনি কর্ণাটক ক্ষত্রিয় নান্যদেবের সহিত মিথিলায় আসিয়াছিলেন। নান্যদেব ও তাঁহার বংশধরগণ তাঁহাদের এই নূতন রাজ্য বিনা প্রতিবন্ধকতায় ভোগ করিতে পারেন নাই। মগধের পালেরা তাঁহাদের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই সময়ে বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন মিথিলায় তাঁহার আত্মীয়কে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন যখন মিথিলায় যান তখন তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গদেশে দুইটি জনরব প্রচারিত হয়। প্রথম জনরব এই যে মিথিলায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, দ্বিতীয় জনরব এই যে বিক্রমপুরে তাঁহার লক্ষ্মণ সেন নামে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের জন্ম তারিখ স্মরণীয় করিবার জন্য মিথিলায় "লক্ষ্মণাব্দ" প্রচারিত হয়।

নান্যদেব ও তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বের সময় এবং শ্রীধরের মন্ত্রীত্বকালে বাঙ্গালা হইতে বহু কায়স্থ কার্য্যসূত্রেই হৌক অথবা আত্মীয়তা সূত্রেই হৌক মিথিলায় গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। মিথিলার ইতিহাস পাঠে ইহা জানা যায়। এই সমস্ত কায়স্থদিগকে কর্ণাটক দেশ হইতে আগত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহারা শ্রীধরের বংশধরগণের ন্যায় কর্ণাটের সমাজে খুব উচ্চপদস্থ ছিলেন বলিয়াও উল্লেখ আছে। শ্রীধরের পুত্র বোধিরাও বা বোধিদাস তাঁহার সময়ে মিথিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্র আনন্দকর রাজমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। আনন্দকরের পুত্র সূর্য্যাকর ঠাকুর মিথিলার সামাজিক

ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত। সূর্য্যকর রাজা হরিসিংহ দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে বংশাবলীর ক্রমিক ইতিহাস রাখিবার প্রথা প্রচলিত হয়। মিথিলার ব্রাহ্মণদের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজা হরি সিংহদেবের রাজত্বের দ্বাত্রিংশ বর্ষকালে অর্থাৎ ১২৪৬ শকাব্দে বা ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যেক বংশে আপন আপন বংশ তালিকা রাখার রীতি প্রচলিত হয়। ভাল ভাল বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে এই বংশ ইতিহাস লিখিবার ভার দেওয়া হয়। এই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশধরেরা এখনও এই প্রথা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। মিথিলায় ইহাদিগকে "পাঞ্জিয়া" বলে।

রাজা হরি সিংহদেবের রাজত্বকালে যে বংশ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বাভাইন সূর্য্যকর ঠাকুরের স্থান সর্ব্বোপরি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাকে কায়স্থ সমাজের নেতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

তাঁহাদের "দাস" উপাধি ছিল এবং তাঁহাদের বংশ মিথিলার কায়স্থ দিগের মধ্যে "কুলীন" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "মল্লিক" উপাধি পাইয়াছিলেন। দাসেদের পর দেব, কণ্ঠ, দত্তেরা মিথিলায় কায়স্থদের মধ্যে সম্মানভাজন হয়।

প্রীতিকর লক্ষ্মীদাস সূর্য্যকরের পুত্র ছিলেন। তিনি পার্থিব সমস্ত বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া কেবল শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার প্রিয় পুত্র বিখ্যাত অমৃত কর ঠাকুর মিথিলার রাজা শিব সিংহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক লোকদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিজয়কর ও নিত্যকর মিথিলার রাজা কংসনারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। নিত্য করের দুই পুত্র ভেলু ও নরহরি দাসের মধ্যে নরহরি

অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় কামরূপ কামাখ্যায় অতিবাহিত করিতেন।

নরহরি দাসের দুইপুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম রাম দাস ও পয়োনিধি। রাম দাস মিথিলার রাজসরকারে কাজ করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সহিত কামাখ্যায় তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন। এখানে পিতা পুত্রে দুইজনে ভুঁইঞা কর্ত্তৃক রাজাদের পতন ও মেছ কর্ত্তৃক রাজাদের অভ্যুত্থান দেখিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে শাক্ত নরহরি দাস শক্তি উপাসনার পীঠস্থান কামাখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর পয়োনিধি দাস আর মিথিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অধিষ্ঠানভূমি কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, তাঁহাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল সেই কারণেই তিনি পিতৃপিতামহের ভূমি পরিত্যাগ করেন। রাম দাসের বংশধরেরা আজিও মিথিলার কায়স্থদের মধ্যে অতি সম্মানের আসন পাইয়া আসিতেছেন। আর তাঁহার ভ্রাতা পয়োনিধির বংশ হইতে গৌরীপুর রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রচীন শাস্ত্রাদিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কোচবিহারের অধিপতি রাজা বিশ্ব সিং পয়োনিধিকে তাঁহার দরবারের পণ্ডিত ও মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। পয়োনিধির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া রাজা বিশ্ব সিং শিবশক্তির একনিষ্ঠ উপাসক হইয়া উঠেন। তিনি কামাখ্যা দেবীর পূজা ও উপাসনা বিস্তারে বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার দুইপুত্র মাল্লাদেব ও সুখদেবকে শাস্ত্র অধ্যায়ণার্থ কাশীধামে পাঠাইয়াছিলেন এবং বারাণসীধাম হইতে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া স্বরাজ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপন করতঃ তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার দুইপুত্র কাশীধামে ছিলেন এবং তাঁহার

জ্যেষ্ঠ পুত্র নরসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তিনি রাজকীয় কার্য্যে আদৌ কোনপ্রকার আগ্রহ ও যত্ন দেখান না। তখন পয়োনিধির দুইপুত্র কাশীধাম হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের দুই ভাইয়ের সহিত কাশীধামে পয়োনিধির জ্যেষ্ঠপুত্র বাণীনাথ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। বাণীনাথ সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারে এতাদৃশ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন যে কাশীধামের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "কবীন্দ্র" উপাধি দেন। ইঁহারা দুই ভাই দেশে ফিরিয়া আসিলে নরসিংহ সিংহাসন পরিত্যাগ করেন এবং নরনারায়ণ সিংহাসনে উপবেশন করেন। সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধনায় নিরত হন। নবীন রাজা কবীন্দ্রকে প্রধান মন্ত্রী (পাত্র) পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নরনারায়ণ ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ কোচবিহারে রাজত্ব করেন। এতাবৎকাল কবীন্দ্রও তাঁহার প্রধান মন্ত্রীরূপে কাজ করিয়াছিলেন। দরঙ্গ রাজের বংশবিবরণ পাঠে জানা যায় যে, যুবরাজ সকলধ্বজ কবীন্দ্র পাত্রের সাহায্যে কামরূপ, মণিপুর, জয়ন্ত, ত্রিপুরা, ডুমরও, ডাজো ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের ভূস্বামীদিগকে স্ববশে আনিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোচবিহার, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, শিল্পে ও সামাজিক বিষয়ে উন্নতির উচ্চশিখায় আরোহণ করিয়াছিল। বিশ্ব সিং তাঁহার রাজ্যের বিস্তারসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী কায়স্থ ভূঁইঞাদের সহিত বিবাদ করিতে হইয়াছিল। অনেক চেষ্টার পর তিনি ভূঁইঞাদের শক্তি নষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভূঁইঞাদের প্রভাব হ্রাস হইলে কবীন্দ্র মিথিলা, যশোহর ও বাঙ্গলার অন্যান্য স্থান হইতে চতুর্দ্দশ জন কায়স্থ আনয়ন করেন। এই সমস্ত কায়স্থদের লইয়া তিনি এতদঞ্চলকে একটী নূতন কায়স্থপ্রধান স্থানে পরিণত

করিলেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধ কায়স্থ বিষ্ণুর অবতার সন্ন্যাসী শঙ্কর দেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।

কবীন্দ্র পাত্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের অনুকরণে বংশাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতেন। মিথিলার যে দাসেরা কুলীন বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, কামরূপেও দাসেরা তেমনি কুলীন বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। দাসেদের পরেই "দেব" ও "দত্তেরা" সামাজিক মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। এইরূপ শ্রেষ্ঠত্বের পদ্ধতি এখনও কামরূপের কায়স্থদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সঙ্কোশ নদীর পূর্ব্বভাগস্থ জমিদারী তাঁহার ভাই শুক্লধ্বজকে দিয়াছিলেন এবং ঐ নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী জমিদারী তিনি নিজ অংশে রাখিয়াছিলেন। সঙ্কোশ নদী এই উভয় ভ্রাতার জমিদারীর সীমা-নির্দ্দেশক ছিল।

১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অতি দুর্ব্বলচেতা জমিদার ছিলেন এবং মতলববাজ লোকেরা প্রতিনিয়তই তাঁহাকে কুপথে পরিচালিত করিতেছিল। তিনি কবীন্দ্র পাত্রকে পদচ্যুত করেন, কিন্তু শুক্লধ্বজের উত্তরাধিকারী রঘুদেব নারায়ণ কবীন্দ্রকে আপন রাজসভায় সাদরে আহ্বান করেন। কবীন্দ্রকে রঘুদেব আপন দরবারে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রঘুদেবের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং রঘুদেবকে কি প্রকারে জমিদারীচ্যুত করিবেন সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতে থাকেন। কিন্তু রঘুদেবের উপর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পূর্ব্বেই রঘুদেব মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তৎপুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ সিংহাসনে

আরোহণ করেন। রঘুদেবের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। খুল্লতাতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করিয়া পরীক্ষিতনারায়ণ সম্রাটের নিকট অভিযোগ করিবার জন্য কবীন্দ্র পাত্রের সহিত দিল্লী যাত্রা করিলেন। "রাজ বংশাবলী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে রাজা পরীক্ষিতনারায়ণ কবীন্দ্র পাত্রের সহিত আগ্রায় আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ পরীক্ষিতনারায়ণকে একখানা খেলাত দ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং একখানি সনন্দের দ্বারা পরীক্ষিতনারায়ণকে তাঁহার পিতার যাবতীয় রাজ্যের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরীক্ষিতনারায়ণ স্বদেশে ফিরিবার পূর্ব্বে কবীন্দ্র পাত্রকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ আগ্রায় রাখিয়া আসেন। দুঃখের বিষয় স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াই পরীক্ষিতনারায়ণ বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কবীন্দ্র পাত্র সম্রাট্‌কে পরীক্ষিতের মৃত্যুসংবাদ দিয়া জানাইলেন যে পরীক্ষিতের কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নাই। সম্রাট্ ইহাতে পরীক্ষিতের রাজ্য একটি নামমাত্র "নবাবের" অধীনে রাখিয়া কবীন্দ্র পাত্রকে "কানুনগো" নিযুক্ত করেন। তদবধি কামরূপের এই অংশ সর্ব্বপ্রথম মুসলমান শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাঙ্গামাটি কানুনগোর রাজধানী হয় এবং কবীন্দ্র পাত্র নানা সূত্রে বহু পরিমাণে জমীদারী ক্রয় করিয়া নিজে একজন বড় জমিদার হইয়া পড়েন। যে চারিটী সরকারের কবীন্দ্র পাত্র কানুনগো হন, ঐ সকল—সরকার কামরূপ, সরকার দাক্ষিণাবন্দ, সরকার ঢকরী ও সরকার বাঙ্গালাভূমি এই নামে অভিহিত ছিল। এই চারিটী সরকার রঙ্গপুর ও গৌহাটির মধ্যে অবস্থিত। এই বিস্তীর্ণ জমিদারীর মধ্যে কবীন্দ্র পাত্র আপন ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকারী ছিলেন। সম্রাটের নিকট ইহাতে তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ যে সনন্দ পাইয়াছিলেন, তাহাতে এই প্রদেশের মধ্যে তাঁহাদিগকে

ফৌজদারী, দেওয়ানী ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ১৬০৬ সালে কবীন্দ্র পাত্র দিল্লীতে যান এবং সম্ভবতঃ পরবৎসর তিনি এই চারি সরকারের কানুনগো পদের অধিকার লইয়া আসেন। কবীন্দ্র পাত্রের চেষ্টাতেই মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীর সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কবীন্দ্র পাত্রের প্রতি একটা তীব্র হিংসার ভাব পোষণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের উত্তরাধিকারী রাজা বীর নারায়ণ রাজ্যমধ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় ধীরে ধীরে তাঁহার অনেক জমিদারী হারাইতে লাগিলেন।

কবীন্দ্র পাত্রের ছয় পুত্র ছিল:—রঘুনাথ, কবিবল্লভ, বিষ্ণুদেব, মহাদেব, নিরঞ্জন ও নিত্যানন্দ। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য "কবিশেখর" উপাধি পাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুত্র—"কবিবল্লভ"ও যে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন তাহা তাঁহার উপাধি দেখিলেই বুঝা যায়, কোচবিহারের রাজা বিরুনারায়ণের রাজত্বকালে কবিশেখর ধীরে ধীরে প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছিলেন। তিনি ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আজিও তাহা গৌরীপুর রাজসরকারে রক্ষিত হইতেছে।

যে সমস্ত প্রাচীন কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে কবীন্দ্র ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মারা যান। কবিশেখর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে যে সমস্ত সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহার মধ্যস্থ একখানি পাঠে জানা যায় যে কবিশেখরের পূর্ব্ব পুরুষেরা জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটের নিকট হইতে অনেক নিষ্কর জমি পাইয়াছিলেন। সম্রাট্ জাহা-

ঙ্গীর তাঁহার শাসন দক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরও অনেক নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে যে সমস্ত সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা পাঠে জানা যায় যে, কবিশেখর সুবা কোচ-বিহারের "কানুনগো" ছিলেন। কোচবিহারের সরকারী কাগজ পত্র পাঠেও জানা যায় যে, কবিশেখর রাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহার রাজ্যের শাসন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "আসাম বুরুঞ্জী"র গ্রন্থকর্ত্তার মতানুসারে জানা যায় যে কবিশেখর রাজা প্রাণনারায়ণের দরবারে সভাসদ্ পণ্ডিত ছিলেন।

কবি শেখরের তিন পুত্র; শ্রীনাথ, কৃপানাথ ও হরিনন্দন। শ্রীনাথ কবিরত্ন বড়ুয়া উপাধি পাইয়াছিলেন। শ্রীনাথ সম্রাট সাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং সেই সনন্দ অনুসারে তিনি উপরোক্ত চারিটি সরকারের কানুনগো পদে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ তিনি আরও অনেক সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবিরত্ন শেষে রাজা প্রাণনারায়ণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় কানুনগো পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার স্থলে তাঁহার ভ্রাতা কবিবল্লভের পুত্র জয়ানন্দ উপবেশন করেন। কবিরত্ন রাজা প্রাণনারায়ণের সহিত যোগ দিয়া সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পদচ্যুতি হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তরবঙ্গের দুইজন শক্তিশালী লোক—রাজা প্রাণনারায়ণ ও কবিরত্ন এতদূর ক্ষমতাপন্ন ছিলেন যে তাঁহারা সম্রাটের আদেশ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিতেন। কবিশেখর যে রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন আজিও তাঁহার বংশধরগণ সেই "রাজা" উপাধি ব্যবহার করিতেছেন। কবিরত্নের পুত্র দেবরাজ সম্রাটের সন্তুষ্টি সাধন করিয়া ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিকট হইতে সনন্দ লাভ করেন।

কবিরত্নের তিন পুত্র—দেবরাম, গোকুলচাঁদ ও হরিহর। দেবরামের মৃত্যুর পর গোকুলচাঁদ কয়েকবৎসর কানুনগো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে তিনি অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়া প্রজা-সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী রাঙ্গামাটিতে অনেক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গোকুলচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীপ্রসাদ কানুনগো পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে যে সনন্দ দেওয়া হয় সেই সনন্দ অনুসারে তিনি চারি সরকারের সমস্ত দস্তুর ও নন্‌কর জমি প্রাপ্ত হন। সম্রাট আওরেঙ্গজেবের রাজত্বের পঞ্চবিংশতি বর্ষে বিলায়ত কোচের কানুনগো দেবীপ্রসাদ ভৈরব, ডাকি ও বাড়ি পরগণার দস্তুর ও নন্‌কর আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত পড়িয়া জানা যায় যে এই সময়ে ইঁহাদের বংশ সম্মান, প্রতিপত্তি, মর্য্যাদা, অর্থ, বিত্ত ও ধনসম্পত্তিতে বিশেষ সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দেবী প্রসাদের পুত্র গোরী প্রসাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেবরামের বংশ বিলোপ হয়, কাজেই গোকুলচাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যচন্দ্র এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য্য চন্দ্রের ভ্রাতা বংচাঁদের পুত্র বুলচন্দ্র বড়ুয়া এই বংশের কর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। তিনি খুরলা, আরঙ্গাবাদ, মাক্রামপুর, জামিরা ও গোল আলমগঞ্জ এই পাঁচটি পরগণার জমিদারী লাভ করেন। সূর্য্যচন্দ্রের দেবী দুর্গার পূজার জন্য বুল চন্দ্র বড়ুয়াকে কিছু নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন। মাননীয় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা বোর্ডের সার্কুলার পাঠে জানা যায় যে, বলরাম চৌধুরী জমিদারী পরিচালনে অক্ষম হওয়ায় এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জমিদারেরাও জমিদারী চালাইতে অক্ষম হওয়ায় এবং যথা সময়ে কোম্পানীর ঘরে রাজস্ব দিতে না পারায় তাঁহাদের জমিদারী চালাইবার

জন্ম বুলচন্দ্রবড়ুয়ার সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে বুলচন্দ্র কিছু নূতন ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র বড়ুয়ার শাসন সময়ে কোম্পানী জমিদারদের সহিত একটা বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে বিজনীর রাজা বলিতনারায়ণ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের হাতে দুর্ব্ব্যবহার পান। বীর চন্দ্র বড়ুয়ার চেষ্টায় সেই অত্যাচারের কাহিনী গবর্ণর জেনারেলের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি অত্যাচার বন্ধ করিয়া দেন। বিজনীর রাজা বীর চন্দ্রের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক নিষ্কর জমি দান করেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কবীন্দ্র বড়ুয়ার সময় হইতে রাঙ্গামাটী এই বংশের প্রধান আবাসস্থান ছিল। মোগল আমলে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইহাদের বংশকে "রাঙ্গামাটীর রাজবংশ," আখ্যা দেওয়া হইত। বাঙ্গালায় কোম্পানীর রাজত্ব আরম্ভ হইলে রাঙ্গামাটীর জমিদারদিগকে রাজস্ব স্বরূপ কোম্পানীর ঘরে প্রতি বৎসর ২১টি হাতি দিতে হইত। কিন্তু এই হাতিসকলকে পালন করা এতদূর ব্যয়সাধ্য ছিল যে, কোম্পানী এই হাতি দ্বারা আদৌ উপকৃত হইত না। এই কারণে কোম্পানী ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদিগকে বার্ষিক ৩১১১ টাকা রাজস্ব দিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পরে এই রাজস্বের পরিমাণ ৪২২১ টাকা হয়। বীর চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী জয়দুর্গা গুণানন্দের পুত্র ধীরচন্দ্রকে পোষ্য গ্রহণ করেন। ধীরচন্দ্র কবিশেখরের ভ্রাতা রবিবল্লভ হইতে বংশপরম্পরায় সপ্তম। ধীরচন্দ্র রাজা রাজড়ার ন্যায় বাস করিতেন।

ধীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্র জমিদারীর স্বত্বাধিকারী হন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাঙ্গামাটি হইতে আবাসস্থান গৌরীপুরে স্থানান্তরিত করেন। এখানে তিনি প্রজাদের শিক্ষা ও রোগ চিকিৎসার

জন্য অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী স্কুল ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি জেলা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে ধুবড়ী প্রদান করেন। তদবধি গোয়ালপাড়ার পরিবর্ত্তে ধুবড়ী জেলা হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভুটান যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্টকে তিনি যে সাহায্য করেন তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। এই বংশ চিরকাল "রাজা" উপাধি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, কাজেই তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লইবার জন্য দরবারে উপস্থিত হন নাই। তারপর ডেপুটি কমিশনার মিঃ ক্যাম্বেল নিজে তাঁহাকে সনন্দ দিতে আসিলে তিনি অগত্যা উপাধি-পত্র গ্রহণ করেন। মিঃ ক্যাম্বেল জমিদারদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না; ফলে প্রতাপচন্দ্রের সহিত মিঃ ক্যাম্বেলের একটু মনান্তর হইয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় মারা যান; কাজেই তাঁহার বিধবা পত্নী রাণী ভবানীপ্রিয়া, কুমার প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়াকে দত্তক গ্রহণ করেন।

রাণী ভবানীপ্রিয়া অতি ধর্ম্মপরায়ণা ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। কাশীধামের গণেশমহল্লে একটি "ছত্র" প্রতিষ্ঠা তাঁহার বদান্যতার অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই ছত্রে আজিও ২৫ জন ব্রাহ্মণকে দৈনিক ভোজন করান হয়। ১৯০৯ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি কাশীধামে ৺কাশীপ্রাপ্ত হন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কুমার প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া সাবালকত্বে উপনীত হন। ১৯০১ সালে তিনি ব্যক্তিগত গুণের জন্য "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মধ্য-ইংরাজী স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করেন। তিনি ধুবড়ীতে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়া স্যার হেন্‌রী কটন নামে তাহার নামকরণ করেন।

রাজা শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া

তিনি স্বরাজ্যে অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আসাম-বাসিদের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত রাণী সরোজবালা বড়ুয়াণীর বিবাহ হয়। রাণী শঙ্করদেবের মহাপুরুষীয় বংশোদ্ভবা ছিলেন। প্রায় দুই বৎসর তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি নিজেও সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মপরায়ণা, আচারে ব্যবহারে তিনি হিন্দু ললণাগণের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন।

রাজা বাহাদুরের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। কুমার শ্রীপ্রমথেশ চন্দ্র ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কলিকাতা সিমলার বিখ্যাত কায়স্থ বীরেন্দ্র নাথ মিত্রের কন্যা বধূরাণী মাধুরীলতাকে বিবাহ করেন।

রাজকুমারী নিহারবালা ১৯০৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন; ১৯১৭-সালে তাঁহার সহিত মুকুন্দ নারায়ণ বড়ুয়া বি-এর বিবাহ হয়।

রাজকুমারী নীলিমা সুন্দরী ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বড়ুয়া বি-এর বিবাহ হয়।

কুমার প্রকৃতীশ চন্দ্র বড়ুয়া ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে বাড়ীতে পড়ান হয়।

কুমার প্রণবেশ চন্দ্র বড়ুয়া ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশ।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী বংশ সমগ্র বঙ্গে বিখ্যাত। এই বংশ অতি প্রাচীন। প্রায় আট পুরুষের উপর হইতে এই বংশ শ্রীরামপুরে বাস করিতেছেন। কান্যকুব্জ হইতে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীরামপুরে আগমন করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অন্যতম বিখ্যাত তান্ত্রিক লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী আলিবর্দ্দী খাঁ ও মহারাষ্ট্রাদিগের সহিত সন্ধি প্রস্তাব আদান প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ অদ্বৈত প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থা হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এই সময় হইতেই এই বংশের উপাধি "গোস্বামী" হয়। এই বংশের লোকেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রাজ সরকারে ও ব্যবসাবাণিজ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হরি নারায়ণ গোস্বামী—স্বর্গীয় রাজা কিশোরী লাল গোস্বামীর প্রপিতামহের সহিত শ্রীরামপুরে দিনেমারদিগের সহিত ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন। হরি নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম নারায়ণ গোস্বামী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় আসামের দেওয়ান ছিলেন। রামনারায়ণ ও হরি নারায়ণ দুই ভাই পারিবারিক বিগ্রহ রাধামাধব জিউ প্রতিষ্ঠা করেন, রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন ও এই বিগ্রহ দেবতার পূজার্চ্চনার জন্য সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত করেন।

"পুরাণ বাড়ী" নামে তের মহল বাড়ীর যে ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয় এবং বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকাদির যে ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও

স্বর্গীয় রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী
এম্, এ, ; বি, এল্,

ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐশ্বর্য্যবান ও ধনসম্পত্তিশালী ছিলেন। তারপর তাঁহারা পরস্পরে পৃথক হওয়ায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির হ্রাস হইতে থাকে। এই বংশের প্রধান শাখার পূর্ব্ব পুরুষ রাঘবরাম ও রঘুরাম বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। রঘুরাম বিখ্যাত জন পামারের সহযোগিতায় বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। জন পামার ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্যও ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁহার দুরবস্থার সময় রঘুরাম তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

রঘুরাম তাঁহার সোপার্জ্জিত জমিদারী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সম্পত্তি হইতে পৃথকীকৃত করেন। কাজেই তাঁহার অংশে অধিক পরিমাণে ধন সম্পত্তি ও ভূসম্পত্তি থাকে। তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে পৈতৃক প্রাসাদ প্রদান করিয়া নিজে একটী নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। রঘুরাম শ্রীরামপুরে দিনেমারদিগের যে উপনিবেশ ছিল তাহা ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাধা দেওয়ায় তিনি তাহা ক্রয় করিতে পারেন না।

তাঁহার দুইপুত্র গঙ্গা প্রসাদ ও গোপীকৃষ্ণ। গোপীকৃষ্ণ তাঁহার পৈতৃক ভূসম্পত্তি বাড়াইয়াছিলেন এবং দরিদ্রের প্রতি দয়া বদান্যতা প্রভৃতি গুণের জন্য অন্য ভাই অপেক্ষা সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের দুই পুত্র; হেমচন্দ্র ও গোপাল চন্দ্র। গোপালচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। হেমচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান হয় না। গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন এবং তিনি রাধামাধব জীউর পূজা করিতেন। সংকীর্ত্তনের সময় তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া যাইতেন। তিনি বৃন্দাবনে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তৃতি এবং বৈষ্ণবগণের সেবার

জন্য বৃন্দাবনে যে সমস্ত দান-ধ্যান করিয়াছিলেন, আজিও বৃন্দাবনবাসী মাত্রে তাহা স্মরণ করিয়া থাকে।

গোপীকৃষ্ণ পারিবারিক বিগ্রহ দেবতার পূজার্চনা ও দানধ্যানাদির জন্য প্রভূত সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান।

গোপীকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র রাজেন্দ্র লাল গোস্বামী ৺কাশীধামে একটি ছত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্রীরামপুরে ছাত্রদের জন্য একটি ফ্রী বোর্ডিংএরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

গোপী কৃষ্ণের পাঁচপুত্রের মধ্যে দুইজন জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তন্মধ্যে নন্দলাল জমীদারী কার্য্য-পদ্ধতিতে বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। রাজা কিশোরি লাল গোস্বামী পৈতৃক সম্পত্তি কেবল যে বাড়াইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি এই বংশের নাম সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ও কৃতি ছাত্র ছিলেন। তিনি "এম্-এ-বি-এল্" পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার অন্য কোন জমিদার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিভূষণে ভূষিত হন নাই। অল্প কয়েক বৎসর হাইকোর্টে ওকালতী করিবার পর তিনি স্বীয় জমিদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। কিন্তু যে কয়েকদিন তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিয়াছিলেন, সেই কয়েকদিনে তিনি এতাদৃশ আইনজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, ৺ভূপেন্দ্র নাথ বসু একদিন বলিয়াছিলেন "কিশোরী বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি হইবার উপযুক্ত।" তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিলে হয়ত ভবিষ্যতে বিচারাসনে বসিতে পারিতেন। কিন্তু আপন জমিদারী পর্য্যবেক্ষণের জন্য তিনি ভবিষ্যতের

কুমার তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

এই সম্মানের আশা ত্যাগ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও নিখিল ভারতীয় জমিদার সভা তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিতেন। বঙ্গীয় শাসন পরিষদে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সদস্য। তিনি নিজের পিতা ও মাতার নামে শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুর জলের কল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালের ৫ই জানুয়ারী ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্রের নাম তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। দেশে ফিরিয়া আসিবামাত্র তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনের সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর তিন মাস ছিল, ইতঃপূর্ব্বে এত অল্প বয়সে অন্য কেহ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনারসহ বি-এ পাশ করিয়া তিনি ইংলণ্ডে যান এবং অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনার সহ এম এ পাশ করেন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি অধিকাংশ সময় রাজনীতির অনুশীলনেই অতিবাহিত করেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল থানার সামিল খানাকুল কৃষ্ণনগরের অধীন রাধানগর গ্রামে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে প্রসিদ্ধ রায়বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রামমোহনের বৃদ্ধপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব সরকার হইতে তাঁহার কৃতিত্বের জন্য রায় উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে আসিয়া এই স্থান গুপ্ত বৃন্দাবন হওয়ায় পরম বিষ্ণুপরায়ণ কুলীনপ্রধান কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের শোভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আদি বাসস্থান মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া এই রাধানগরে নবাব সরকারের খাস যায়গায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করেন। রাজা রামমোহন রায়ের অতিবৃদ্ধ পিতামহ পৌরহিত্য আদি যাজ্যক্রিয়া ত্যাগ করতঃ স্বধর্ম্মে থাকিয়া বেদ আদি অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করা এবং নানারূপ জনহিতকর কার্য্য করিবার সুযোগ পাইবার জন্য নবাব সরকারের উচ্চ পদে আসীন হইয়া কার্য্যাদি করা স্থিরসঙ্কল্পে নবাব সরকারের উচ্চপদ গ্রহণ করেন।

রাজা রামমোহন বড়লোকের পুত্র হইয়াও বাল্যকাল হইতেই কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতামহ দেশগুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আদি পুরুষ শ্যাম ভট্টাচার্য্য। ইনি চাতরায় বাসস্থান স্থির করেন। তিনি সেকালের বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গুরু ছিলেন।

রাজা প্রথম আরবী ও পারসী পড়িয়াছিলেন; পাটনা তাঁহার পাঠস্থান ছিল। তাঁহার পিতৃবংশ বিষ্ণুপরায়ণ ও মাতামহবংশ শাক্ত ছিলেন, সুতরাং বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

আরবী পারসী পড়িয়া একেশ্বরবাদী হইয়াছিলেন এবং ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক বই লেখেন। এই বই লেখায় তাঁহার মাতা, পিতা ও মাতামহ সকলেই তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। তৎপরে তিনি ৪ চারি বৎসর তিব্বত প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ২০ বৎসর বয়সে দেশে ফিরিয়া আসেন এবং পিতা পুত্রে এবার সদ্ভাব স্থাপন হয়। এইবারে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সংস্কার জন্মে যে "একেশ্বরবাদ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি-পাদ্য এবং সেই সকল শাস্ত্রের পর নানা নূতন ও অসার মত প্রচলিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মকে দূষিত করিয়াছে"। তৎপরে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

ইংরাজী ১৮০০ হইতে ১৮১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রামমোহন রায় তৎকালীন বাঙ্গালীদের পক্ষে যাহা দুরাশার পদ সেই কালেক্টরের দেওয়ানী পদে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। সেই সময়েই তিনি ইংরাজী শিক্ষা করেন ও ইংরাজদের সহিত মিশিতে থাকেন। তৎপরে চাকরী হইতে অবসর লইয়া তাঁহার মত প্রচারে সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। তিনি ইংরাজী, আরবী, পারসী প্রভৃতি কয়েকটী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

হিন্দু সমাজকে বজায় রাখা এবং ঐ ধর্ম্মকে পরিশোধিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই ক্ষণজন্মা অসাধারণ মনীষী পুরুষই পুরাতন আদর্শের স্থলে নূতন আদর্শ স্থাপন করেন।

দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন জমিদারীর রাজস্বে দিল্লীর বাদসাহের ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া দাবী করায় সেই আবেদন ভারতবর্ষের শাসন-কর্ত্তাদের দ্বারা বাদসাহের অনুকূল না হওয়ায় বাদসাহ রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দিয়া ইংলণ্ডাধিপতির নিকট আবেদন করিবার জন্য উপযুক্ত

ক্ষমতা দিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট দিল্লীশ্বরের প্রদত্ত রামমোহন রায়ের "রাজা" উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডাধিপতির রাজ্যাভিষেক কালে বিদেশীয় দূতগণের সঙ্গে তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। লণ্ডনের সেতু নির্ম্মিত হইয়া সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হইবার সময় যে প্রকাণ্ড সভা হইয়াছিল ইংলণ্ডেশ্বর তাহাতে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

সতীদাহ নিবারণ, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি যাবতীয় মহৎ কার্য্য সংশোধিত করিয়া তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিষ্টল নগরে ভারতের গৌরব রত্ন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রায় রমাপ্রসাদ রায় বাহাদুর কলিকাতা মহামান্য হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী জজ মনোনীত হন। রায় বাহাদুরের দুই পুত্র, হরিমোহন ও প্যারীমোহন। ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। স্বর্গীয় প্যারীমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ধরণীমোহন রায় মহাত্মার যাবতীয় সদ্গুণে ভূষিত হইয়া প্রজাপালন করিতেছেন। ধরণী বাবু দ্বারা দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন হইতেছে ও হইবে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ "রায় বংশ"

কানাই
ত্রিলোচন
রাজনারায়ণ
মথুরানাথ
রামলাল
মতিলাল
বৈকুণ্ঠনাথ
প্রাণকৃষ্ণ
রাজকৃষ্ণ
রামরতন
সুরথ
প্রবোধ
অমৃত
পশুপতি
বিশ্বমোহন
পদ্মলোচন
হারানন্দ
প্রভাস
হরিপ্রসন্ন
সুরেন্দ্র
উপেন্দ্র
নগেন্দ্র
যতীন্দ্র
ব্রহ্মমোহন
ব্রজমোহন
কুঞ্জবিহারী
বিজন
বিমান
সুধীরকুমার
গিরিজা
প্রমোদা
বরোদা
বিমলা
সৌরিন্দ্র
ফণীন্দ্র
মনমোহন
শ্রীমোহন
মনমুরারি
রাজেন্দ্র
ভবেন্দ্র
মনীন্দ্র
ফণীন্দ্র
বীরেন্দ্র
রামকিশোর (ক)
কীর্ত্তিচন্দ্র
নবকিশোর
গৌরহরি
নরহরি
বিশ্বম্ভর
কৃষ্ণনাথ
আনন্দ
শ্রীকৃষ্ণ

মতিলাল
যদুনাথ
হরিনাথ
তারাপদ
যোগেন্দ্র
যাদব
শ্রীনাথ
রাধানাথ
সতীন্দ্র
হেমেন্দ্র
গোপীনাথ
চূড়ামণি
প্রাণনাথ
প্যারী
বারীন্দ্র
সৌরিন্দ্র
অমরেন্দ্র
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
উপেন্দ্র
গোকুল
ব্রজ
ত্রৈলোক্য
দ্বারকানাথ
জাত ১২৬০ সাল ১৫ই চৈত্র
তিরোধান ৩রা অগ্রহায়ণ
১৩১৯
শ্রীহরি
নন্দহরি
নানগোপাল
নলিনাক্ষ্য
সতীশ
শরৎ
মৃত্যুঞ্জয়
রাধামোহন (খ)
মদনমোহন
রামপ্রসাদ
মথুরানাথ
গোলকনাথ
কৃষ্ণমোহন
সীতারাম
ঈশান
প্রাণহরি
দ্বারকানাথ
রসিক
হরিশ
উমেশ
হরিপদ
রমণীমোহন
সৃষ্টিধর
অমূল্য
উপেন্দ্র
মৃণীন্দ্র
গিরীন্দ্রমোহন
জ্ঞানেন্দ্রমোহন
(সাং চাতরা শ্রীরাম
পুর)

গোপীমোহন (গ)
বৃন্দাবন
রামতনু
দুর্গাপ্রসাদ
খুদিরাম
(ইহারা মুর্শিদাবাদ জেলায় সৈদাবাদে বাস করিতেছেন।
রামকান্ত (ঘ)
মৃত্যু ১২১১।১০ ইং ১৮০৪।৫
জগমোহন
রাজা রামমোহন
রামলোচন
গোবিন্দপ্রসাদ
(জন্ম ১১৭৯ ইং ১৭৭৬
মৃত্যু ১২৪০ তাং ১৩ই
আশ্বিন ইং ১৮৩৩
২৭শে সেপ্টেম্বর)
শ্রীপতি
ভূপতি
ক্ষিতিপতি
শচীপতি
রাধাপ্রসাদ
মৃত্যু ১২০৯ ২৭শে ফাল্গুন
ইং ১৮৫২ ৯ই মার্চ
রায় রমাপ্রসাদ
রায় বাহাদুর জন্ম ১২।২৫।১৪ই
শ্রাবণ ইং ১৮১৮।২৮শে জুলাই
মৃত্যু ১২৭৯।১৭ই শ্রাবণ
ইং ১৮৭২ ১লা আগষ্ট
হরিমোহন
প্যারীমোহন
(মৃত্যু ১৩২৫।২৯ জ্যৈষ্ঠ বুধবার)

ধরণীমোহন
শচীন্দ্রমোহন
ছোট খোকা
রামরাম (ঙ)
ভুবনমোহন
শিবচন্দ্র
রমেশচন্দ্র
কুমুদচন্দ্র
ব্রজগোপাল
জয়গোপাল
সরসীমোহন (ইনি জমিদার ধরণী বাবুর ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)
হরেন্দ্রমোহন
রামেন্দ্রমোহন
বিষ্ণুরাম (চ)
গৌরমোহন
রামজয়
শ্রীধর
হলধর
হরিপদ
মাধবচন্দ্র
অক্ষয়চন্দ্র
বীরেন্দ্র
দুর্গা
সমরেন্দ্র

নকীপুরের জমিদার বংশ।

জেলা যশোহরের অন্তর্গত সরশুনা গ্রাম নিবাসী পাকরাশী গাঁই ও ধনমালী গোষ্ঠীসম্ভূত শুদ্ধশ্রোত্রীয় ৺যশোবন্ত রায় চৌধুরী মহাশয়, প্রথমে বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তঃপাতী নকীপুর গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। যৎকালে ইনি এদেশে আসিয়াছিলেন, ঐ সময়ে যশোহর জেলা কশবা জেলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল; এবং এই সকল দেশ কশবা জেলার অন্তর্গত ছিল। এই মহাপুরুষ বর্ত্তমান নকীপুরের জমিদার বংশের আদিপুরুষ। ইঁহারা চারি সহোদর; তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর সরশুনায় বাস করিতে-ছিলেন, এবং মধ্যম ভ্রাতা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকে গমন করেন, ও তৃতীয় ভ্রাতা পাবনা জেলায় গমন করিয়াছিলেন, আর তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাবধি পাবনা জেলায় বাস করিতেছেন। ৺যশোবন্ত রায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, ইনিও পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সরশুনা গ্রামে বসবাস করিতেছিলেন; কিন্তু পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত যশোবন্তের নানা কারণ বশতঃ মনোমালিন্য হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমশঃই ঐ ভ্রাতৃবিরোধ-বহ্নি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে ঐ বিবাদ এতাধিক হইয়া উঠিল, যাহার শেষ ফলে তাঁহাকে স্বদেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বঙ্গীয় ১০২৫ সালের বর্ষাকালে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের নানাবিধ অত্যা-চারের হস্ত হইতে প্রতীকার পাইবার জন্য সরশুনা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদা-বাদ গমন করেন; এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর। যশোবন্ত একাকী তথায় গিয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে তিনি অবিবাহিত, সুতরাং স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সন্তান সন্ততি ছিল না এবং যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নানাবিধ

প্রকারের কৌশলদ্বারায় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ গমন করিয়া অর্থাভাবে যশোবন্তকে প্রথমে বড়ই কষ্টে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। তবে যশোবন্ত অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও সুপুরুষ ছিলেন; কিছুকাল এইরূপ কষ্টে অতিবাহিত হওয়ার পরে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি সদয় হন। নবাবসরকারের জনৈক মুসলমান রাজপুরুষের সহিত ঘটনা-ক্রমে তাঁহার পরিচয় হইয়া পড়ে। এই মুসলমান রাজপুরুষ তাঁহার থাকিবার বাসস্থান এবং আহারাদির সুবিধা করিয়া দেন ও জনৈক পারসী ভাষাভিজ্ঞ মৌলবীর সহিত পরিচয় করিয়া দেন এবং তাঁহাকে পারসী-ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। যশোবন্তের পরিধেয় বস্ত্র ও পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি যে সমস্ত আবশ্যক হইত উক্ত রাজপুরুষ তৎসমুদয়ের সাহায্য করিতেন। যশোবন্ত তাঁহার জীবনের কোন সময় অকারণ আলস্যে অথবা আমোদ প্রমোদে নষ্ট করেন নাই। যশোবন্ত অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে সন্ধ্যা-আহ্নিক কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পশ্চাৎ বেলা ৮ ঘটিকা হইতে ১২ঘটিকা পর্য্যন্ত মৌলবী সাহেবের নিকট পারসী-ভাষা অধ্যয়ন করিতেন, পরে স্নানাহ্নিক ও আহারাদি সমাপন করিয়া অতি সামান্যকাল বিশ্রা-মান্তেই পুনরায় নবাব সরকারে যাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত তথায় বৈষয়িক কার্য্যাদি শিক্ষা করিতেন এবং সন্ধ্যার পরে যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর গৃহস্বামীর একটি পুত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, কারণ যশোবন্ত বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া, উহাতে বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং একজন সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে উক্ত মৌলবী মহোদয়ের সাহায্যে যশোবন্ত পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অর্থাৎ ঐ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে ও লিখিতে সক্ষম হইলেন। সাধারণভাবে পারসী

ভাষায় কার্য্যাদি চালানর পক্ষে কোন প্রকার বিঘ্ন হইত না। যশোবন্তকে পূর্ব্বোক্ত মুসলমান রাজপুরুষ পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, আরও তিনি বঙ্গদেশের একটী বিখ্যাত বংশের ও সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান, একারণ তিনি সাধারণ কর্ম্মচারী অপেক্ষা যশোবন্তকে একটু বিশেষ দয়ার চক্ষে দেখিতেন। ক্রমান্বয়ে উক্ত রাজপুরুষের সাহায্যে এবং যশোবন্তের কার্য্য-দক্ষতা ও স্বভাব চরিত্রের গুণে তিনি মুর্শিদাবাদ নবাবের সদর সেরেস্তায় সাধারণের নিকট পরিচিত হইলেন ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ভাগ্য বিপর্য্যয়ে যাঁহাকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, সহসা পুনরায় ভাগ্যের পরিবর্ত্তন স ঘটিত হওয়ায় সেই যশোবন্ত ভগবানের দয়ার চক্ষে পতিত হইলেন। ঠিক এইরূপ সময়ে বঙ্গদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে কয়েকটি পরগণা বন্দো-বস্তের কার্য্য এবং কতকগুলি জঙ্গল জমি হইতে নিকটবর্ত্তী ভূস্বামীগণের অধিকৃত জমির প্রজাগণের উপর বন্যপশুর অত্যাচার বশতঃ ঐ সকল স্থান প্রজাগণের বসবাস করার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠায় এবং ঐ সকল জঙ্গলজমি বিলী করা বিশেষ আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় নবাব সরকারে নানারূপ আলোচনা হইতে থাকে; সদর সেরেস্তায় প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারীগণ যশোবন্তের কার্য্যকলাপে এবং স্বভাব চরিত্রে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; একারণ তাঁহারা যশোবন্তকে ঐ বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করার জন্য মনোনীত করিয়া নবাব বাহাদুরকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। নবাব বাহাদুর যশোবন্তকে এই পদে নির্ব্বাচন করিয়া সনন্দ প্রদান করেন। যশোবন্ত নিম্নলিখিত মর্ম্মে সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, "মুর্শিদাবাদ নবাব অধিকৃত বঙ্গদেশস্থিত নিম্ন বঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের যাবতীয় জঙ্গল জমি অর্থাৎ আবশ্যক বোধে যে সকল জমি বন্দোবস্তের যোগ্য ঐ সকল জমি বিলি বন্দোবস্ত, কর-ধার্য্য ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য যশোবন্ত তাঁহার

নিজের মনের মত স্বাধীনভাবে সম্পাদন করতঃ ঐ সকল কাগজ পত্রাদি মুর্শিদাবাদ সদর সেরেস্তার দপ্তরখানায় হাজির করিবেন" এবং এই সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর যশোবন্তকে রায় চৌধুরী খেতাব প্রদান করিয়াছিলেন।

যশোবন্ত নবাবের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত লোকজন সমভিব্যাহারে কিছুদিনের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া মফঃস্বলে উপস্থিত হইলেন। সুন্দরবনের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া যশোবন্ত অনেক জঙ্গল জমি বিলি বন্দোবস্ত করেন এবং কয়েকটি রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া লোকের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা করিয়াছিলেন ও কতকগুলি স্থানের প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য কয়েকটি বড় বড় পুষ্করিণী খনন করেন; লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী যে সকল জঙ্গল গ্রামের সহিত যুক্ত হইয়াছিল ও হিংস্র জন্তুর উৎপাতে অধিবাসিগণ ঘোরতর বিপদাপন্ন অবস্থায় কালযাপন করিতেছিল, ঐ সকল জঙ্গল জমি বিলি হইয়া যাওয়ায় এবং গ্রামরূপে পরিণত হওয়ায় লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। এই সকল কারণ বশতঃ যশোবন্ত সাধারণের নিকট আশীর্ব্বাদের ও সুখ্যাতির পাত্র হইয়াছিলেন। কিছুদিবস পরে এই সকল কার্য্যের কতদূর কি হইল অর্থাৎ যশোবন্ত তাঁহার মনিবের আদিষ্ট কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তদ্বিস্তারিত সংবাদ জ্ঞাপন করার জন্য মুর্শিদাবাদ দপ্তরখানায় তাঁহার তলব হইয়াছিল। একারণে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য মফঃস্বল পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতে হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ উপস্থিত হওয়ার পরে, তাঁহার সহিত মফঃস্বলস্থিত কার্য্য-কলাপের আলোচনা করিয়া এবং কাগজপত্রাদি দেখিয়া ও ভূস্বামীগণের দরখাস্তাদি পর্য্যালোচনা করিয়া মুর্শিদাবাদ সদরের অনেক রাজপুরুষগণ

যশোবন্তের প্রতি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। ক্রমান্বয়ে এই কথা নবাব বাহাদুরের দরবারে পৌঁছিল। নবাব বাহাদুর, যশোবন্তের মফঃস্বল সংক্রান্ত কার্য্যাদির বিষয় জ্ঞাত হইয়া, যশোবন্তকে দরবারে হাজির হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে যশোবন্ত নবাবের দরবারে হাজির হইলে, নবাব তাঁহার সহিত সুন্দরবন সংক্রান্ত নানাবিধ বৈষয়িক ও রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া, যশোবন্তকে নকীপুর পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সেই আদেশানুযায়ী নকীপুর পরগণা যশোবন্ত নবাব সরকার হইতে জমিদারী ডৌল প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি এই নকীপুর পরগণা যশোবন্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের জমিদারী হইতেছে। তৎপরে সুন্দরবনের কতকগুলি কার্য্যের বিশেষরূপ উৎকর্ষ সাধন করায়, নবাব বাহাদুর তাঁহার প্রতি সন্তোষ লাভ করিয়া, উক্ত পরগণার অন্তর্গত রঘুনাথপুরের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে তাঁহার স্থায়ী কাছারী করিবার জন্য আদেশ দেন। তিনি ঐ স্থানে অবস্থান করতঃ সুন্দরবনের যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে স্থানে এই কাছারী বা মোকাম সাব্যস্ত হইয়াছিল ঐ স্থান 'চৌধুরাটী' নামে আখ্যাত বা কথিত হইয়াছিল। তৎকালে এই নকীপুর পরগণার অন্তর্গত এই চৌধুরাটী গ্রাম অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমানে এইস্থান বাজিতপুর পরগণার অন্তর্গত এবং নকীপুর হইতে প্রায় ৫ মাইল ব্যবধান। যে সময়ে যশোবন্ত রায় চৌধুরী নবাব সরকার হইতে নকীপুর পরগণা বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, সে সময়ে নকীপুর একটী বড় পরগণা ছিল অর্থাৎ ইহার চৌহদ্দি অধিকতর বিস্তারিত ছিল। নকীপুর পরগণার দক্ষিণ সীমানায় বংশীপুর ও চণ্ডীপুর এবং উত্তর সীমানায় জাহাজঘাটার নিকটবর্ত্তী মালিখালির খাল, পূর্ব্ব সীমানায় খোলপেটো নদী, পশ্চিম সীমানায় যমুনা নদী প্রবাহিত ছিল। এই পরগণার অন্ত-

ভুক্ত ন্যূনাধিক একলক্ষ বিঘা জমী ছিল। ক্রমান্বয়ে এই নকীপুরের অবয়ব অত্যল্প মাত্রায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার অধিকাংশ জমী সুন্দর-বনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। আটুলিয়া, কুপট, তালবেড়ে, নওয়াবেকী, দরগাবাটী, বুড়িগোয়ালিনী, হেঞ্চি, যোগীন্দ্রনগর, কালিকাপুর, জয়নগর, বিরেনকী, কাশীমারী, কাঁটালবেড়ে, কাছি হারা-নিয়া, খুঁটীঘাটা, সঙ্করকাঠি, চাতরা, থানপুর, পার্টনিপুকুর প্রভৃতি গ্রাম ও মৌজা এই নকীপুরের সামিল ছিল।

এই নকীপুর পরগণা বন্দোবস্ত গ্রহণের পরে যশোবন্ত বিবাহ করেন, এবং ক্রমান্বয়ে উক্ত চৌধুরাটি গ্রামে তিনি বাসস্থান মনোনীত করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নকীপুর পরগণা বন্দোবস্ত লইয়া গৌরীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তিকে এই বিষয়ের জঙ্গলাবাদ প্রভৃতি কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গৌরীকান্ত প্রভুপরায়ণ ভৃত্য ছিলেন। প্রভুর কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, সর্ব্বদাই গৌরী-কান্তের হৃদয়ে এই চিন্তা বলবৎ ছিল। গৌরীকান্ত এই পরগণার অন্তর্গত চণ্ডীপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। যশোবন্ত ভৃত্যের কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডীপুরের মধ্যে ১৫০ শত বিঘা জমী, গৌরীকান্তকে নিষ্কর দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান চণ্ডীপুরের ঘোষবংশীয় প্রিয়নাথ ঘোষ প্রভৃতির আদি পুরুষ গৌরীকান্ত ঘোষ অদ্যাবধি এই চণ্ডীপুরের উক্ত নিষ্কর জমি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

সুন্দরবনের বন্দোবস্তের কার্য্য শেষ হইয়া আসিলে অর্থাৎ নবাব সরকারের আদিষ্ট যে সকল জমী বন্দোবস্ত করার আবশ্যক, ঐ সকল জমী বিলি বন্দোবস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে মুর্শিদাবাদ সদর হইতে যশোবন্তকে মুর্শিদাবাদ মোকামে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ হইয়াছিল। তিনি তদনুসারে কাগজপত্রাদিসহ মুর্শিদাবাদ উপস্থিত হইলে, নবাব সরকারের

প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ ঐ সকল কাগজপত্রাদি দৃষ্টে, যশোবন্তের কার্য্যাকলাপে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। নবাবের দরবারে যশোবন্তের কার্য্যাদির আলোচনা হইয়া, যশোবন্ত একজন কার্য্যদক্ষ লোক এবং মনিবের হিতৈষী কারপরদাজ সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হওয়ায়, নবাব বিশেষ আনন্দ সহকারে তাঁহার রাজধানীর মোক্তারকে একজন প্রধান কার্য্যকারকত্বের পদে উন্নীত করিয়া সদর কাছারীতে প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ প্রদান করেন। যশোবন্ত ঐ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নবাব বাহাদুরের নিকট দরবার করেন যে, তাঁহার বাটীতে দ্বিতীয় কোন একজন ব্যক্তি অভিভাবক নাই, মাত্র তাঁহার স্ত্রী এবং অল্প বয়স্ক সন্তান আছে, সুতরাং তাহাদিগকে ছাড়িয়া এতাধিক দূরদেশে অবস্থান করা যশোবন্তের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব বিধায় উক্ত পদোন্নতি স্ব ইচ্ছায় তিনি ত্যাগ করিতেছেন, এজন্য হুজুর হইতে মেহেরবাণি করিয়া তাঁহার এই প্রার্থনা বজায় রাখিতে হুকুম হয়। তখন নবাব তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া আদেশ করেন যে, যশোবন্তকে সরকার হইতে এপ্রকার বক্‌সিস দেওয়া হউক, যাহাতে তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং অন্য কোন স্থানে কোনরূপ চাকুরী করিতে না হয়। যশোবন্ত সেই সুযোগ বুঝিয়া সুন্দর বনের অন্তর্গত যমুনা নদীর পশ্চিম তীরস্থ মিরনগর নামক পরগণা তাঁহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় জন্য দরবার করেন। সহজেই তাঁহার এই দরবার সুসম্পন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ নবাব বাহাদুর যশোবন্তকে মেহেরবাণি করিয়া এই সম্পত্তি বন্দোবস্ত করার আদেশ দিয়াছিলেন।

যশোবন্ত নবাব সরকার হইতে যৎকালে এই মিরনগর পরগণা বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, তৎকালে, তাহাতে ৪০ হাজার বিঘা জমি ছিল; ক্রমান্বয়ে এইক্ষণ বাজেয়াপ্ত হইয়া মিরনগর পরগণা অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সময়ে দুরমুস্‌খালি, হরিণগড়, ফুলটুকরী, শিরিজপুর,

ফকিরাণ, দেবনগর, ফুলবাড়ী, মাড়ক, গৌরীপুর, দাসকাটী, মুরারি-কাটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি মৌজাসমূহ এই মিরনগর পরগণার অন্ত-র্ভুক্ত ছিল। মিরনগর পরগণার এবং ধুনিয়াপুর পরগণার সামিল এই পরগণার অনেক জমি বাহির হইয়া, বর্ত্তমানে ৪০০০০ হাজার বিঘা জমার পরিবর্ত্তে ১০০০ কি ৮০০০ বিঘা জমী আছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি এই সময়ে ধুমঘাট পরগণা বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পরগণায় প্রায় লক্ষ বিঘা জমী ছিল। ইহার অন্তর্গত সোরা রমজান-নগর, কালিঞ্চা, ভেটখালী, পাত্‌রাখোলা,ভৈরবনগর প্রভৃতি মৌজা ছিল। বর্ত্তমানে এই পরগণায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার বিঘার অধিক জমি নাই।

যে সময়ে যশোবন্ত এই সকল পরগণা নবাব সরকার হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, তৎকালে এ দেশের অবস্থার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অনেক পার্থক্য ছিল, ঐ সময়ে এতদ্দেশে রেলপথ বিস্তার ছিল না, লোকেরা অধিক আইন আদালতের সহিত পরিচিত ছিল না, দেশময় এপ্রকার সভ্যতার বাড়াবাড়ি হয় নাই, লোকে সহসা একটা অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে কিংবা কাহারও মর্ম্মে আঘাত করিতে—এমন কি একটী মিথ্যা কথা বলিতে স্বীকার করিত না। সে সময়ে এতাধিক বিলাসিতা বৰ্দ্ধিত হইয়া দেশের নানাবিধ সর্ব্বনাশকর কার্য্যের সংঘটন হয় নাই, একাকী সকল ভোগ করিব বা একাই তাহা খাইব এ প্রবৃত্তি ধনী বা গৃহস্থদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। দেশের সর্ব্বত্র অথবা বঙ্গ দেশের কোন স্থানে কি দরিদ্র কি ধনী কাহারও অন্নবস্ত্রের কষ্ট ছিল না। ঐ সময়ে দেশে চাউলের মন ।০ আনা হইতে ৸০ আনার উর্দ্ধ ছিল না, দ্রব্যাদির বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত অর্থাৎ ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈল পাওয়া যাইত ইত্যাদি ব্যাপার দেশে প্রচলিত ছিল। ভূস্বামীগণ প্রায় প্রজা-

পালন করাই জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রজা-গণ ভূস্বামীকে বাস্তু দেবতা জ্ঞানে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। ভূস্বামীদিগের ত্যাগ স্বীকার ও ক্ষমাগুণ ঐ সময়ে তাঁহাদের সদাব্রত ছিল অর্থাৎ ভূস্বামী ও প্রজায়, মহাজনে ও খাতকে কোনরূপ বিকল্প বা মতভেদ উপস্থিত হওয়া কচিৎ দৃষ্ট হইত। মোটের উপর তখন লোকে এতাধিক শিক্ষিত না হইলেও, এতাধিক বুদ্ধিমান না হইলেও দেশের সর্ব্বত্র কোনরূপ অশান্তি ছিল না, লোকের মনে সর্ব্বদাই শান্তি ছিল। দেশে কোন কষ্ট বা হাহাকার ছিল না।

যশোবন্ত মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাটীতে আসিয়া অর্থাৎ চৌধুরাটী পৌছিয়া কিছুদিনের মধ্যেই আরও কয়েকটী সম্পত্তি লইয়াছি-লেন। ঐ সকল সম্পত্তির জঙ্গল আবাদ প্রভৃতি কার্য্যে যশোবন্তকে অনেক অর্থ ব্যয় ও নিজে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এদেশের সর্ব্বত্রই একসময়ে যশোবন্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিখ্যাত হইয়াছিল এবং যশোবন্তের দয়ালু অন্তঃকরণ এবং ধর্ম্মের জন্য দেশের যাবতীয় লোক তাঁহার সুখ্যাতি করিত। তিনি লোকের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। যশোবন্ত কখনও কোন প্রজার বা কোন লোকের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। নিজের স্বার্থের বিঘ্ন করিয়া পরের উপকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা বিচলিত হইতেন না এবং নিজ ক্ষমতায় মনে ধর্ম্মভাব স্থাপন করিয়া প্রকৃত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ঐ সকল অর্থের কোন অপব্যবহার করেন নাই এবং অকাতরে পরের জন্য ঐ সকল অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

যশোবন্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের যখন বিশেষ উন্নতির সময়, এবং যে সময়ে তিনি এইদেশের সর্ব্বত্রই এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ঐ সময়ের একটী গল্প অদ্যাপিও চলিয়া আসিতেছে। ৺যশবন্ত

রায় চৌধুরী মহাশয়ের সদ্ব্যবহার গুণে ও উদার কার্য্যকলাপে সাধারণ লোকে এতাদৃশ মোহিত হইত যে তাহার তুলনা করা এই সময়ে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। একদল ডাকাইত তাঁহার বাটিতে ডাকাইতি করার অভিপ্রায়ে ডাকাইত দলভুক্ত দস্যুগণকে একটু দূরে রাখিয়া, দস্যুদলপতি ৩।৪ জন লোকসহ ঐ কার্য্যের অনুসন্ধানাদি লওয়ার অভিপ্রায়ে অর্থাৎ কি করিয়া আক্রমণ করিলে তাহাদের অভীষ্টকার্য্য সুসম্পন্ন হয় এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার জন্য, যশোবন্তের বাটীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে অতিথিভাবে উপস্থিত হয়। ঐ দিবস রাত্রিকালে ডাকাইতি করার জন্য উহারা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বাটীর লোকজনের আতিথ্য সৎকারে এবং তাঁহার স্বকীয় সদালাপে ঐ সকল দস্যুদলবর্গ মোহিত হইয়া আত্মভাব গোপন করিতে সক্ষম হইল না। তাহারা যশোবন্তের নিকট নিজেদের বিস্তারিত পরিচয় ও মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

যে সময়ে যশোবন্ত নকীপুর পরগণা, মিরনগর পরগণা ও ধূমঘাট পরগণা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে এদেশে প্রজার ভাগ কম ছিল, সুতরাং জমী জমার একটা বিশেষ আদর ছিল না। কাজেই তিনি কতক কতক জমী গাঁতি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং কতকাংশ জমী প্রজাইবিলি ভাবে খাস রাখিয়াছিলেন। গাঁতীদারগণের সহিত যে সকল জমী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ঐ সকল জমীর নিরিখ বা হার প্রতি বিঘা চারি আনা হইতে ছয় আনার অতিরিক্ত ছিল না এবং খাসে প্রজাই বিলী অর্থাৎ প্রজাগণের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ঐ সকল জমীর নিরিখ ।৹ আনা হইতে উর্দ্ধ সংখ্যায় ১৲ একটাকার অধিক কর প্রজাদিগকে বহন করিতে হইত না। ঐ সময়ে ১১৹ হাত রশির

মাপ প্রচলন ছিল। জমী প্রজাগণকে তোষামোদ করিয়া গতাইতে হইত। আজকাল যেমন জমীর জন্ত দেশের ইতর ভদ্র ছোট বড় সকল লোকে লালায়িত, তখন কেহ সেরূপ লালায়িত ছিল না, বরং প্রজাগণ সর্ব্বদাই তাহাদের মনের ইচ্ছা এরূপভাবে চালিত করিত যে, উহারা চাষ-বাস করিয়া এবং তদ্দারা কোন প্রকারে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইলেই তাহারা মহা আনন্দিত হইত। জমাজমার যাবতীয় স্বত্ব স্বামিত্ব দায় দফা সকলই ভূস্বামীগণের উপর ন্যস্ত ছিল, পক্ষান্তরে ভূস্বামীগণ তাহা-দিগকে নিজ পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রজাগণের সুখে সুখী হইতেন, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেন। অর্থাৎ ভূস্বামী ও প্রজাগণের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার বিবাদ হইলে উভয় পক্ষই তজ্জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেন।

৺যশোবন্ত রায় চৌধুরী মহাশয় অনেক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন এবং দেশের লোকের শিক্ষার জন্ত বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। জনসাধারণের সুচিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিজ বাটিতে রাখিয়াছিলেন এবং বিনা অর্থব্যয়ে ঔষধ ও পথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেমন এই সকল জঙ্গল সম্পত্তি আবাদ হইতে লাগিল, ও প্রজাগণ বাস করিতে আরম্ভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাস্তাঘাট ও পুষ্করিণী ও হাট বাজার স্থাপিত হইতে লাগিল। ফলতঃ যশোবন্তের দ্বারা দেশের অধিবাসিগণের কোন অভাব ছিল না। কিছুদিন পরে তাঁহার এই নকীপুর পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগর মৌজায় স্বয়ং একটী কাছারী বাটী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে কয়েকটী পুষ্করিণী ও নানাপ্রকার ফল ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে চৌধুরাটী অপেক্ষা এই গ্রামের উন্নতি অধিকতর দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে ৺যশোবন্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশধরগণ এই শ্যামনগর গ্রামে

বসবাস করিতে থাকেন। তদবধি চৌধুরাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নকীপুরের চৌধুরী মহাশয়গণ এপর্য্যন্ত শ্যামনগর গ্রামে বাস করিতেছেন। নকীপুর একটী পরগণার নাম। কোন মৌজা বা গ্রামের নাম নকীপুর নাই; তবে যে শ্যামনগর গ্রামে এইক্ষণ নকীপুরের জমীদার মহাশয়েরা বাস করিতেছেন ঐ স্থানটী সাধারণের কাছে নকীপুর নামে পরিচিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ঐ স্থানের নাম শ্যামনগর।

৺ যশোবন্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র চাঁদদেব রায় চৌধুরী ও তদীয় পুত্র (বা যশোবন্তের পৌত্র) ভূপতি নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের আমল হইতে ইঁহারা শ্যামনগর নকীপুরে বসবাস করিতেছেন। ভূপতির প্রপৌত্র রাম ভদ্র রায় চৌধুরীর চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম গোপাল রায়, তৃতীয় পুত্র রাম রাম রায়, কনিষ্ঠ পুত্র শ্যামরাম রায় এবং মধ্যম বা দ্বিতীয় পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। একারণ তাঁহারা তিন ভ্রাতায় পৃথক হইয়া তিনটী হিস্যা বা অংশ সৃষ্টি করেন। বড় ভ্রাতার অংশ বড় হিস্যা ও তৃতীয় ভ্রাতার অংশ সেজ হিস্যা এবং ছোট ভ্রাতার অংশ ছোট হিস্যা নামে অভিহিত হইয়া তিন অংশ স্থাপিত হইয়াছে। তৎপরে জ্যেষ্ঠ সহোদর রামগোপালের দুই পুত্র হয়, প্রথম পুত্রের নাম মুকুন্দ রাম রায় চৌধুরী। ইনি সম্পত্তির অর্দ্ধ অংশ প্রাপ্ত হইয়া বড় হিস্যা নামে তদবধি ইঁহার বংশধরগণ কথিত হইতেছেন; এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামকিঙ্কর রায় চৌধুরী সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হওয়ায় নূতন হিস্যা বা (ন হিস্যা) নামে তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাবধি কথিত হইয়া আসিতেছেন। অধুনা বহু সরিক হওয়ায় কতকগুলি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এই বংশের প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ভৈরব চন্দ্র রায় চৌধুরী ও পার্ব্বতী চরণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মাগণ এতদ্দেশের লোকের নিকট নানাবিষয়ে প্রশংসার পাত্র ছিলেন এবং সাধারণের অনেক হিতকর অনুষ্ঠান তাঁহাদের দ্বারায় সুসম্পন্ন হইত;

৺মুকুন্দ রাম রায় চৌধুরী মহাশয়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠপুত্র দেবীপ্রসাদ রায়, মধ্যম কালীপ্রসাদ রায়, তৃতীয় জগন্নাথ রায়, ও কনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ রায়। এই চারি সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুত্র, ভবানী প্রসাদ ও হরপ্রসাদ। এই দুইজনের মধ্যে ভবানী প্রসাদ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হইয়াছিলেন।

নকীপুরের জমীদার বংশ বহুপরিবারে বিভক্ত হওয়ার ফলে কতকগুলি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, ক্রমান্বয়ে জমীদারী নষ্ট হইতে থাকে, কয়েকটী সম্পত্তি তাঁহাদের হস্ত হইতে বহির্গত হইয়া যায়। কালের পরিবর্ত্তনে ভাগ্যবিপর্য্যয় সর্ব্বত্র উপস্থিত হইয়া থাকে, এখানেও সেই ভাগ্যচক্র বিস্তারিতভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। বহু পরিবার বিধায় সর্ব্বদাই সর্ব্বকার্য্যে তাঁহাদের মতভেদ হইতে লাগিল, সম্পত্তি রক্ষা হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিল। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়, অন্যান্য সরিকগণের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসার জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করেন এবং যে সম্পত্তিগুলি এই বিবাদের সময়ে অপরের হস্তগত হইয়াছিল, হরপ্রসাদ বিস্তর চেষ্টা, যত্ন ও বহু অর্থব্যয়ে ঐ সকল পুনরায় হস্তগত করিয়াছিলেন।

৺হরপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুত্র, প্রিয়নাথ ও চন্দ্রনাথ। হরপ্রসাদ এই বংশে অথবা এতদ্দেশের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই মহাপুরুষ বাল্যকাল হইতে যেরূপ সাংসারিক, বৈষয়িক ও সামাজিক ছিলেন তেমনই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

হরপ্রসাদ উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তি বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং পিতার আমলে সাংসারিক অবস্থা যেরূপ ছিল, তদপেক্ষা তিনি স্বীয় অবস্থার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন ও

তাঁহার নিজের দেশের সামাজিক রীতি নীতি পদ্ধতির সংস্কার-সাধন করিয়া দেশের ভদ্রাভদ্র জনসাধারণের চরিত্রের সমধিক উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছিলেন। তিনি দেশের লোকের এবং প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য অনেক স্থানে বিস্তর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্য দেশের নানা স্থানে রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দেশের লোকের স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করার যাহাতে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য নিজের জমিদারীর মধ্যে অনেক স্থলে হাট, বাজার সৃষ্টি করিয়া, যাহাতে দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানির সুবিধা হয়, তাহার উপায় করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ হরপ্রসাদ দেবালয় নির্ম্মাণ, উহাতে হিন্দু দেবদেবী প্রতিষ্ঠা, ঐ সকল বিগ্রহের নিত্য নৈমিত্তিক সেবার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং ঐ সকল অনুষ্ঠানে দরিদ্র লোকগণ যাহাতে নিত্য নিত্য প্রতিপালন হইতে পারে তাহারও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি নকীপুর এষ্টেটে তাঁহার ঐ সকল সুব্যবস্থা ও সুনিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। নকীপুরের বাটীতে অতিথিশালা স্থাপন করিয়া প্রত্যহ শত শত নরনারী যাহাতে পানভোজন উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারে, তাহার জন্য প্রকৃষ্ট উপায় বিধান করিয়াছিলেন। জনসাধারণকে অকাতরে অন্নদান করা, মহাত্মা হরপ্রসাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ তাঁহার কার্য্যকলাপের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, ব্যক্তিমাত্রই সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ধর্ম্মপ্রাণ হরপ্রসাদ তাঁহার নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য কিছুই করিতেন না। প্রায় এক শত বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, হর-প্রসাদ বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপিও নকীপুরের জমিদার বাটীতে তাঁহার কৃত নিয়মসমূহ চলিয়া আসিতেছে। হরপ্রসাদ

বাবুর দুইটী পুত্র সন্তান, প্রিয়নাথ ও চন্দ্রনাথ। তাঁহার জীবিতকালে কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

হরপ্রসাদ বাবু স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার পুত্র প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী মহাশয় পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিত্বে বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। প্রিয়নাথ বাল্যাবধি স্বভাবতঃ দয়ালু ও ধার্ম্মিক ছিলেন, পরের দুঃখ দেখিলে তিনি একেবারেই গলিয়া পড়িতেন। ধনী লোকের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সহৃদয় প্রিয়নাথ নিতান্ত গরীব দুঃখীগণের সহিত সর্ব্বদা বসবাস করিতেন, কদাচ তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখি-তেন না। পিতৃবিয়োগের পর প্রিয়নাথ জমিদারীর কার্য্যাদি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, পিতার আমলের পুরাতন ভৃত্যগণের পরামর্শ লইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন। অল্পকালের মধ্যেই নিজের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দেশের মধ্যে অনেক স্থলে পুষ্করিণী খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন, প্রভৃতি জন-সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে, ইংরাজ রাজা তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া, তাঁহাকে বংশ পরম্পরায় (Hereditary) রায় উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

তদবধি তাঁহার বংশ পরম্পরায় রায় উপাধি চলিতেছে। রায় প্রিয়নাথ পিতার যথেষ্ট সঞ্চিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐ সকল অর্থের দ্বারায় নিজের বিষয় সম্পত্তি অনায়াসেই বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া মুক্ত হস্তে ঐ সকল অর্থ দরিদ্র প্রজাগণের ও নিঃস্ব প্রতিবেশীগণের নানাপ্রকার উপকারার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। যদ্যপি তাঁহার এষ্টেটের কোন কর্ম্মচারী, কিম্বা কোনও আত্মীয়স্বজন ঐ প্রকারে অজস্র অর্থ ব্যয় করার পক্ষে নিষেধ করিতেন, তিনি তাহাতে এই উত্তর করিতেন, "লোকে সঙ্গে করিয়া কিছু আনে নাই এবং সঙ্গে

করিয়া কিছুই লইয়া যাইবে না, সুতরাং দুই পাঁচ দশ দিনের জন্য আমার আমার করিয়া বিশেষ কি ফল ফলিবে।" অদ্যাবধি লোকে তাঁহার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে এই সকল কথা বলিয়া থাকে। বঙ্গের ভূস্বামীগণের যেরূপ ব্যবহার বর্ত্তমান সময়ে চলিতেছে, তাহার সহিত রায় প্রিয়নাথের কার্য্যকলাপ, আচার-ব্যবহার তুলনা করিলে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করা উচিত। রায় প্রিয়নাথ তাঁহার জীবনে কোন খাতকের নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করেন নাই, অথবা কোন খাতকের নামে নালিশ করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করেন নাই। খাতকগণের অবস্থার বিপর্য্যয়ে অনেক টাকা তিনি ত্যাগ বা বেহাত করিতেন। প্রজাবৎসল রায় প্রিয়নাথ কখনও কোন প্রজার নামে বাকি করের নালিসের দ্বারায় ডিক্রী হাসিল করিয়া তাহাকে সামান্য ভূসম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করেন নাই, অথবা মাল ক্রোক করিয়া উহার অস্থাবর সম্পত্তি লয়েন নাই। রায় প্রিয়নাথ বিপুল সম্পত্তি সাধারণের উপকারার্থে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে সাধারণের কার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। বলা বাহুল্য যে, দরিদ্রগণের ঘর দরজা প্রস্তুত বা মেরামত, দরিদ্রগণের চিকিৎসার জন্য ঔষধের মূল্য ও পথ্যাদির মূল্য, শীতক্লিষ্ট দরিদ্রগণকে শীতবস্ত্র দান, পরিধেয় বস্ত্র দান, দরিদ্রদেশবাসীগণের মধ্যে যাহাদের উদরান্নের সংস্থান ছিল না, তিনি ঐ সকল সংবাদ উপযাচক হইয়া গ্রহণান্তর নিজ এষ্টেট হইতে জমী জমা প্রদান করতঃ ঐ সকল লোকের অন্নের সংস্থান প্রভৃতি কার্য্য রায় প্রিয়নাথ স্বীয় কর্ত্তব্যজ্ঞানে সম্পাদন করিতেন। দেশস্থ অথবা বিদেশস্থ কোন লোক কোন প্রকারের বিপদগ্রস্ত হইয়া হউক, আর কোন প্রকারের অভাবগ্রস্ত হইয়াই হউক, একবার রায় প্রিয়নাথের সম্মুখীন হইলে, তাহার আর কোন চিন্তার কারণ থাকিত না, রায় প্রিয়নাথ কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহার প্রতী

৺ রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুর

কারের ব্যবস্থা করিতেন। প্রিয়নাথ অল্প বয়সে (৩৮ বৎসর বয়সে) মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার দুই কন্যা ও একমাত্র পুত্র রায় হরিচরণ। প্রিয়নাথের দুই ভার্য্যা প্রথমা ভার্য্যা নিস্তারিণী দেবী চৌধুরাণী। ইনি অপুত্রক ছিলেন, এবং কনিষ্ঠা ভার্য্যা শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দেবী চৌধুরাণী। ইঁহার গর্ভজাত দুই কন্যা ও একমাত্র নাবালক পুত্র। রায় প্রিয়নাথ হরিচরণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়, দীন দরিদ্র দেশবাসিগণকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, শান্তিধামে গমন করিয়াছিলেন।

রায় হরিচরণ এক বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন, তাহার কিছুকাল পরে তাঁহার স্নেহময়ী জননী ব্রহ্মময়ী দেবীচৌধুরাণী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক (নাবালক) হরিচরণের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া, পতির অনুগমন করিয়াছিলেন। অগত্যা হরিচরণ পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়িলেন। রায় হরিচরণের একমাত্র বিমাতা নিস্তারিণী দেবী ব্যতীত নিকট আত্মীয় আর বড় কেহ রহিল না। রায় হরিচরণ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান হইয়াও, বাল্যাবধি এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার কোমল ও সরল স্বভাবের পরিবর্ত্তন করেন নাই। বিমাতা নিস্তারিণী দেবী তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও যত্ন করিতেন, তিনিও বিমাতার উপদেশ ও আদেশ গ্রহণ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না এবং ঐ স্বর্গীয় দেবী স্বরূপিণী বিমাতার পদধূলি গ্রহণ না করিয়া কোন স্থানে পদক্ষেপ করিতেন না। নিস্তারিণী দেবীকে আদর্শ বিমাতা বলা যাইতে পারে।

রায় হরিচরণের পিতামহ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ রায় চৌধুরী পছন্দ করিয়া, তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র রায় প্রিয়নাথের বিবাহ দিয়া নিস্তারিণী দেবীকে নকীপুর জমীদার ভবনে আনয়ন করিয়া-

ছিলেন। যৎকালে নিস্তারিণী বিবাহিতা হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে তিনি নবমবর্ষীয়া বালিকামাত্র। এতদ্দেশে এইক্ষণ পর্য্যন্ত লোকে এই কথা বলিয়া থাকে যে, যদবধি নিস্তারিণী নকীপুরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তদবধি নকীপুরের বাবুদের কোন অবনতি বা অমঙ্গল হয় নাই, পক্ষান্তরে তাঁহাদের উন্নতি হইয়াছে। নিস্তারিণী গরিব ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়া রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজরাণী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য তাঁহার কোনরূপ গরিমা লোকের নিকট প্রকাশ পায় নাই। দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণ সেবা, অতিথি সৎকার প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি নিজের বেশ-ভূষার জন্য অথবা আহারাদির পারিপাট্যের জন্য কোন সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন না। নকীপুরের জমিদার বাটীতে প্রত্যহ অতিথি অভ্যাগত সর্ব্বসমেত তিন শত লোক পান ভোজন করিয়া থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের জন্য বহু পাচক-পাচিকা ও দাস-দাসী নিয়োজিত আছে; কিন্তু উহাদের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, প্রতিদিন ভোরে ৫ ঘটিকার সময়ে নিস্তারিণী দেবী ঐ সকল স্থানে নিজে উপস্থিত থাকিয়া আহারাদির তদ্বির করিতেন এবং ইতর ভদ্র, অতিথি অভ্যাগত, দাসদাসী, সকল লোকের আহারাদি সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া তিনি নিজে আহার করিতে বসিতেন। এইরূপে দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত ঐ সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান লইতেন। ইতর,ভদ্র, ফকির, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, মোহান্ত, আহুত, অনাহুত কোন প্রকারের লোক নকীপুরের বাটী হইতে কোন দিন অভুক্ত অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করে নাই। অধিকন্তু যে যাহা খাইতে ইচ্ছা করিত অর্থাৎ ভাত লুচি, রুটি, ফলমূলাদি তাহার জন্য তাহাই প্রস্তুত হইত। অবস্থা নির্ব্বিশেষে কিংবা জাতি নির্ব্বিশেষে

নিস্তারিনীর নিকট ভোজ্য দ্রব্যের পার্থক্য ছিল না, অর্থাৎ যে দিন ভাল খাবার প্রস্তুত হইত, সেদিন বাটীর মেথর লইতে প্রাণাধিক হরিচরণ পর্য্যন্ত একই প্রণালীতে একই দ্রব্য পান আহার করিত। আর ইদানীং এই বঙ্গদেশের কোন কোন জমীদার মহিলা বিত্তল ত্রিতলস্থিত সুরম্য বাসগৃহে বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পাচকপাচিকা দাসদাসী পরিবেষ্টিতা হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের তুলনায় নিস্তারিণীকে অন্নপূর্ণা বলা যাইতে পারে। রায় হরিচরণ বাল্যাবধি এই দেবীস্বরূপীণী বিমাতার তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত হইয়াছিলেন।

রায় হরিচরণ স্বধর্ম্মপরায়ণ, স্বদেশানুরাগী ও স্বজাতিপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেশে নানাপ্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইল। রায় হরিচরণ যার পর নাই বিনয়ী ছিলেন। বিবাদ বিসম্বাদকে তিনি বিশেষ ভয় করিতেন। ইতর শ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকের উপর কখনও তিনি কোনরূপ উপেক্ষা বা ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন না। রায় হরিচরণ সমকক্ষ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা দরিদ্রগণের সংসর্গ ভাল বাসিতেন। বিলাসিতা, অমিতব্যয় প্রভৃতিকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। অথচ দেশের উপকারের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দরিদ্রগণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করা এবং সাধ্যমত ঐ সকলের প্রতিকার করা তাঁহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। তিনি ক্ষমা গুণের আধার ছিলেন। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কাহারও কোন অনিষ্ট বা অহিতাচরণ করেন নাই।

রায় হরিচরণের নাবালক অবস্থায় উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ফসল না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ হয়। দরিদ্র প্রজাবর্গের ও দেশবাসীর সংরক্ষণ হেতু এষ্টেটের সঞ্চিত ধনধান্য প্রচুর পরিমাণে ব্যয়িত হওয়ায়, মজুত

তহবিল এককালীন নিঃশেষ হইয়াছিল, কারণ তাঁহার পরমারাধ্যা বিমাতৃদেবী দেশবাসী জনসাধারণের অন্নকষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া মুক্ত হস্তে ধনাগারের যাবতীয় অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। রায় হরিচরণ ২২ বৎসর বয়সে উপনীত হইলে তাঁহার বিমাতৃদেবী তাঁহাকে জমিদারীর কার্য্যের ভার অর্পণ করেন।

রায় হরিচরণ স্বীয় জমীদারীর কার্য্যের ভার হস্তে লইয়া জানিতে পারিলেন যে, এক কিস্তী রাজস্ব প্রদানোপযোগী অর্থ মালখানায় মজুত নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ ফসল না হওয়ায় দুর্ভিক্ষের জন্য এষ্টেট হইতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে ঐ সকল অর্থ আদায় হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। ঐ সকল অর্থ আদায় করিতে হইলে, দরিদ্র প্রজাবর্গকে ও দরিদ্র দেশবাসীগণকে বিশেষরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে হইবে, এমন কি অনেককেই সর্ব্বস্বান্ত ও ভিটাচ্যুত হইতে হইবে, এই বিবেচনায় তিনি ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে এষ্টেটের অর্থের অসচ্ছলতা দূর করিয়া নিজের বিষয় সম্পত্তি যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ধনসম্পত্তির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; এই হেতু কোন দিন কোন ব্যক্তিকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দেন নাই; অথবা কোন অধর্ম্মের কার্য্য করেন নাই—ইহাই তাঁহার দেশব্যাপী সুখ্যাতির মূল।

বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে, অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ এম্ এ, উপাধিধারী না হইলে লোকে তাহাকে পণ্ডিত বলে না, কিম্বা সমাজের দশ জনের মধ্যে তিনি গণ্যমান্য হইতে পারেন না। কিন্তু আমাদের দেশের চন্দ্রস্বরূপ রায় হরিচরণ ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত না হইলেও আমরা তাঁহাকে জ্ঞানী ও ধর্ম্মাত্মা বলিতে পারি। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, স্বদেশানুরাগী ও স্বজাতি বৎসল ছিলেন,

এই সকল সদ্‌গুণের পরিচয় স্বতঃই তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে।

রায় হরিচরণ জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে, লবণাক্ত জল প্লাবনের জন্য, দেশে ফসল উৎপন্ন না হওয়ায়, দেশ উৎসন্ন যাওয়ার পথে উঠিয়াছে। দেশস্থ ইতর ভদ্র যাবতীয় লোকের দিন দিন অবস্থা বিপর্য্যয়ে দেশের সর্ব্বত্রই হাহাকার ধ্বনি হইতেছে। তিনি নিজে ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা সহকারে ও বহু অর্থব্যয়ে বাঁধবন্দির সৃষ্টি করেন। ঐ বাঁধ বন্দির দ্বারায় ধান্য ক্ষেত্র সমূহ লোণা জল হইতে রক্ষা পাওয়ায় দেশের সর্ব্বস্থানে সুচারুরূপে ফসল উৎপন্ন হইতে থাকায় দেশের দুরবস্থা দূরীভূত হইয়াছে।

রায় হরিচরণ দেখিলেন যে, দেশের দরিদ্র বালকগণের বিদেশে যাইয়া ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করার অসুবিধা প্রযুক্ত অধিকাংশ বালক লেখাপড়া ত্যাগ করিতেছে, কারণ এতদ্দেশে যে সকল বঙ্গ বিদ্যালয় ও মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, উহার পাঠ সমাপন করিয়া, অনেক বালকের আর উচ্চশিক্ষা লাভ করা ঘটিত না। এজন্য তিনি নিজে আগ্রহ সহকারে বহু অর্থ ব্যয় স্বীকারে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরস্ত না হইয়া বিদেশস্থ দরিদ্র বালকগণের সুবিধার জন্য নিজব্যয়ে একটী ফ্রি বোর্ডিং স্থাপিত করিয়া দেন। উহাতে বিদেশস্থিত দরিদ্র বালকগণ ও শিক্ষকগণ বিনাব্যয়ে যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন তৎপক্ষে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

দেশের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দূরদেশ হইতে উপযুক্ত ডাক্তার কবিরাজ আনয়ন করতঃ রোগীদিগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের দ্বারায় এতদ্দেশবাসী ভদ্রাভদ্র সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। ঐ সকল দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধের

মূল্য প্রভৃতি যাবতীয় ব্যয়ভার নিজ এষ্টেট্ হইতে সঙ্কুলান করার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত খুলনা জেলার উড্ বরণ হাঁসপাতালে দরিদ্র রোগীদিগের চিকিৎসার সুবিধার জন্য এককালীন বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন।

স্বধর্ম্মপরায়ণ রায় হরিচরণ, হিন্দুসমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার আভাস পাইয়া এবং সমাজস্থিত জনসাধারণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তরোত্তর হ্রাস হইতেছে জানিয়া এবং দেশের কোনস্থানে ধর্ম্ম চর্চ্চার পন্থা না থাকায় ও দেশবাসী ছাত্রবৃন্দের দেশের কোনস্থানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করার উপায় না থাকায়, নকীপুরে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া উহাতে সুযোগ্য অধ্যাপক নিয়োজিত করেন এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে একটী ছাত্রনিবাস স্থাপিত করিয়া, উহার যবতীয় ব্যয়ভার এষ্টেট হইতে প্রদান করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উক্ত চতুষ্পাঠীতে দেশ বিদেশের বহু ছাত্রবৃন্দ সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছে। ৺কাশীধামে মন্দির স্থাপনা করিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করিলে যে ফললাভ হইতে পারে রায় হরিচরণের এই মহদনুষ্ঠানে তদপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

স্বদেশপ্রিয় রায় হরিচরণ দেশের মধ্যে যাহাতে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হয়, তজ্জন্য তাঁহার জীবনে বহু অর্থ ব্যয় ও বহু প্রয়াস পাইয়াছেন। কলিকাতা প্রদর্শনী মেলাতে (Exhibition) দেশীয় কৃষি ও শিল্পের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য একালীন বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন।

সর্ব্বসাধারণের গমনাগমনের সুবিধার জন্য দেশের মধ্যে অনেকস্থলে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেশের লোকের পানীয় জলের জন্য স্থানে স্থানে সুন্দর দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন করেন, উহাতে সুন্দর ও সুবৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত করিয়া লোকের জল ব্যবহার করার সুবিধা

করিয়া গিয়াছেন, নিজ হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে এদেশে তড়িতবার্ত্তা (টেলিগ্রাফ) আনয়ন করিয়াছেন। অদ্যাবধি ঐ টেলিগ্রাফের ব্যবহার দ্বারায় উহার বাৎসরিক সম্পূর্ণ ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায় নকীপুর এষ্টেট হইতে টেলিগ্রাফের অবশিষ্ট ব্যয় দেওয়া হইয়া থাকে।

খুলনা জেলার সাতক্ষিরা সবডিভিসনে ১৩০২।৩ সাল ব্যাপী যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, উহাতে দেশের লোকের অত্যন্ত দুরাবস্থা হইয়াছিল। ইংরাজ রাজা ঐ জন্য রিলিফ বসাইয়াছিলেন। রায় হরিচরণ রিলিফ ফণ্ডে দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্য অর্থদান করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি দরিদ্র প্রজাবর্গের নিকট এক বৎসর খাজনা লয়েন নাই, তদ্ব্যতীত এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন নকীপুর বাটীতে শত শত দরিদ্রগণ অতি সমাদরের সহিত ভোজন করিত, ইহাতে তিনি একদিনের জন্যও কোনরূপ কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই; অধিকন্তু কাঙ্গালী ভোজন সময়ে প্রতিদিন বেলা ১২টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই ব্যাপার দেখিবার জন্য অনেক দর্শক প্রতিদিন নকীপুর বাটীতে উপস্থিত হইতেন। খুলনা জেলার তৎকালের প্রধান রাজপুরুষ (District Magistrate) ভিনসেণ্ট সাহেব বাহাদুর এবং সাতক্ষিরার সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত হরিকৃষ্ণ নিয়োগী মহাশয় প্রভৃতি অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারীগণ অনেক সময়ে আগমনপূর্ব্বক অতি আনন্দের সহিত ঐ দৈনিক কাঙ্গালীভোজন দর্শন করিতেন। বলা বাহুল্য, রায় হরিচরণ চৌধুরী মহাশয়ের এই সদনুষ্ঠান ও সহৃদয়তার কার্য্য ভিনসেণ্ট সাহেব বেঙ্গল গভর্ণরের নিকট জানাইয়াছিলেন।

মহামান্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট রায় হরিচরণের এতাদৃশ অসাধারণ ও অলৌকিক সদ্গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অযাচিতভাবে তাঁহাকে

"রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, বেলভেডিয়ার রাজপ্রাসাদে বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বঙ্গেশ্বর মহামতি সার জন্ উড্‌বর্ণ সাহেব বাহাদুর, উপাধি-বিতরণ দরবারসভায় সমগ্র বঙ্গদেশের ভূস্বামীবৃন্দের সম্মুখে বলেন, রায় হরিচরণ দরিদ্র প্রজাবর্গে বেষ্টিত হইয়া, রাজধানী কলিকাতা নগরীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, স্বীয় জমিদারীতে অনুক্ষণ বাস করেন, (Residential Zeminder) এবং তাঁহার নিজের দেশে জন সাধারণের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের দ্বারায় দেশের লোকের সর্ব্ববিধ অভাব অভিযোগ দূরীকরণ করিয়া থাকেন।" লাট বাহাদুর এই সকল গুণকীর্ত্তণ করিয়া রায় হরিচরণকে বঙ্গের (Model Zeminder) একজন আদর্শ জমিদার এই বাক্যের দ্বারা বক্তৃতা শেষ করিয়াছিলেন।

দেশের সাধারণ ভদ্রাভদ্র লোক রায় হরিচরণের গুণে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি তাহাদের এরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল যে, রায় হরিচরণ, "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, রাজধানী হইতে দেশে প্রত্যাগত হইলে, দেশবাসী যাবতীয় লোক ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন করেন এবং ঐ সভায় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার উপস্থিতমতে, সকলে এক বাক্যে পরমানন্দে বলিয়াছিলেন যে লাট সাহেব তাঁহাকে তদীয় সদ্গুণের পুরস্কার স্বরূপ "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন, আর আমরা নিঃস্ব ও নিরক্ষর দেশবাসীগণ আজ হইতে তাঁহাকে "কাঙ্গালের ঠাকুর" উপাধি প্রদান ব্যতীত আর আমাদের এমন কিছু নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার এবম্বিধ সৎকার্য্যের পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে।

রায় হরিচরণ চৌধুরী রায় বাহাদুর মহাশয়ের দুইটী পুত্র, জ্যেষ্ঠ রায় সতীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ রায় যতীন্দ্রনাথ। সন ১৩২১ সালের

রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

৫ই চৈত্র তারিখে পরিবারবর্গকে অকূল শোক সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া, অর্থ সামর্থ্য বিরহিত দেশবাসীকে ইহকালের মত ঘোর অন্ধকারে ত্যাগ করিয়া, তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ৪৭ বৎসর বয়সে রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

রায় সতীন্দ্র নাথ ও রায় যতীন্দ্র নাথ প্রাপ্তবয়স্ক। পিতৃবিয়োগের পর তাঁহারা এবং উভয় ভ্রাতা এষ্টেটের কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিতেছেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিতেছেন।

৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়

বংশ পরিচয়, জন্ম ও শিক্ষা।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার অধিনে শাকনাড়া নামে একটী অতি প্রাচীন গ্রাম আছে, ইহা দামোদের নদীর পশ্চিমপারে অবস্থিত। একসময়ে এই গ্রামখানি অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিয়া খ্যাত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই শাকনাড়া গ্রামই ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের জন্মস্থান।

কথিত আছে রাজা আদিশূর আপন রাজ্যের সপ্তশতি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া, কাণ্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনাইয়া পাঁচজনকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কশ্যপকুল-সম্ভূত দক্ষ তর্কবাগীশ বংশের আদি পুরুষ। দক্ষের ষোড়শ সন্তান, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করেন। দক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলোচন চট্টগ্রামে বাস করায় তাঁহার সন্ততিগণ "চট্টোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্ত হন।

দক্ষের অধঃস্তন ষষ্ঠ পুরুষ গাহী। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। তিনি বিদ্যা, ক্রিয়াকলাপ ও অতিশয় দানপরায়ণতার জন্য বঙ্গদেশের মধ্যে যশস্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সর্ব্বেশ্বর প্রথমে ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

কিন্তু সে অঞ্চলে মুসলমানদিগের সমাগম হইলে তিনি রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন। রাঢ়ে আসিয়া তিনি 'অবসথ' পালন পূর্ব্বক এরূপ বৃহৎ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন যে, সেরূপ বৃহৎ যজ্ঞ কেহ কখন করেন নাই। সেই হইতেই তাঁহাকে 'অবসথী' আখ্যা প্রদান করা হয়। সর্ব্বেশ্বর যে কোন্ গ্রামে এই মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা এখন নির্ণয় করা যায় না। সর্ব্বেশ্বরের অধঃস্তন বংশধরগণের মধ্যে অনেকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'রামবাটী' গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই রামবাটী গ্রাম উপরোক্ত শাকনাডা হইতে এক ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সর্ব্বেশ্বরের বংশীয়েরা রামবাটী হইতে আবার ক্রমে ক্রমে পাবঙা, শাকনাড়া শাকমজিটা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামে ছড়াইয়া পড়েন।

সর্ব্বেশ্বরের অধঃস্তন বংশীয়দের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে রামচরণ তর্কবাগীশ, মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ ও রামনাথ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় ১৬২৩ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। সাহিত্যদর্পনে টীকা রচনা করায় তাঁহার নাম আর কাহারও নিকটে অবিদিত নাই।

মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ ১৬৩২ শকে, সম্রাট আরংজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। ইনি দর্শনশাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং একসময়ে বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়াও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

মুনিরাম শাকনাড়ায় একটী চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার পাঠশালার বিলক্ষণ উন্নতি লাভ হওয়ায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের গৌরব সমধিকরূপে বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপের রাজা তাঁহাকে একবার আহ্বান করিয়া বহু পণ্ডিতগণের সম্মুখে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই সময় বর্দ্ধমানের সুবাদার মুনিরামের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে

দরবারে আসিতে আদেশ করেন। মুনিরাম কয়েকদিন দরবারে যাতায়াত করিলে, একদিন সুবাদার সাহেব, দরবার শেষ করিয়া মুনিরামকে দাঁড়াইতে বলিয়া ভোজন গৃহে প্রবেশ করেন, এবং ভোজন করিতে করিতেই একখানি লালরংঙের কাগজে সই করিয়া তাহা মুনিরামকে প্রদান করিতে আদেশ করেন। একজন ভৃত্য কাগজখানি লইয়া মুনিরামকে জানায় যে, সুবাদার সাহেব তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া এই কাগজে দানপত্র লিখিয়া তাঁহার বৃত্তির জন্য "শাকনাড়া" ও "নাসগঞ্জ" নামক গ্রাম দুইখানি প্রদান করিয়াছেন। উচ্ছিষ্ট হস্তে দানপত্রে সুবাদার সই করাতে, মুনিরাম তাহা গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই জন্য অনেকেই তাঁহাকে "পণ্ডিত মূর্খ" বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্যের পরীক্ষার জন্য অনেক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কৌশলই তাঁহার নিকট খাটে নাই।

মুনিরাম কতকগুলি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় একখানিও আমরা পাই নাই। সমস্তই দামোদরের বন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। যে পুষ্করিণীর পাড়ে তাঁহাদের দাহ করা হয় এখনও লোকে তাহাকে "সতীর পুকুর" বলিয়া থাকে। মৃত্যুর সময় তাঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। শম্ভুরাম জ্যেষ্ঠ, মধ্যম রামকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত কনিষ্ঠ। ইহারা কেহই পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। মধ্যম রামকান্তের দুই পুত্র—রামসুন্দর ও নৃসিংহ। রামসুন্দর নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে নৃসিংহ খ্যাতিলাভ করিয়া "তর্ক পঞ্চানন" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

নৃসিংহ প্রথমতঃ নিজ গ্রামেই বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, পরে ৺কাশীধামে গিয়া বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দর অল্প বয়সেই তিন পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তন্মধ্যে রামনারায়ণ জ্যেষ্ঠ—ইনিই প্রেমচন্দ্রের পিতা। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রামসদয় অতিশয় শক্তিশালী ছিলেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ রাঢ়দেশের মধ্যে ছিল না। কথিত আছে,—একবার ডাকাতেরা তাঁহাদের গ্রামে আসিলে তিনি তাহাদের লগুড় হস্তে উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়াছিলেন। সেই হইতে ডাকাতেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিত।

শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে রামনারায়ণ সেরূপ লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাদৃশ লেখাপড়া না শিখিলেও তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর, উদার, দানশীল ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতিথিসেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল। এমন দিন ছিল না যে, তাঁহার বাটী অতিথি শূন্য থাকিত। এমনও হইয়াছে যে, হঠাৎ মধ্যরাত্রিতে ৬০।৬৫ জন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। তিনি তখনই তাঁহাদের সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার অন্নপূর্ণা স্বরূপিণী সহধর্ম্মিণী নিজ হস্তে তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি কম গৌরবের কথা। বঙ্গদেশের এমন কোন গ্রাম ছিল না যে, যেখানে তাঁহাকে কেহ জানিত না। সত্যনিষ্ঠা ও অঙ্গীকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম, এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গই পাপ বলিয়া তিনি নিয়ত নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি প্রাণান্তেও স্বীয় অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করেন নাই। এই সব কারণে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকলের ছোট বড় লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন যে, তাহারা গভীর রাত্রিকালে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী গোপনে তাঁহার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া যাইত, লেখাপড়া বা সাক্ষীসাবুদ

থাকিত না। তাঁহার দুইবার বিবাহ হয়। প্রথমা পত্নীর প্রথম সন্তান প্রসবের সময় প্রাণবিয়োগ হইলে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীই প্রেমচন্দ্রের গর্ভধারিণী জননী। কোন কারণে রামনারায়ণের সহিত তাঁহার খুরতাত নৃসিংহের কলহ হয়, তাহার ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে বহুদিন বাক্যালাপ পর্য্যন্ত ছিল না। যেদিন প্রেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন সেই দিন নৃসিংহ নিজ বাটীতে বসিয়া শিশুটীর ভাগ্য গণনা করিয়া দেখিতেছিলেন। প্রেমচন্দ্রের অসাধারণ ভাগ্যফল দেখিয়া তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া তিনি রামনারায়ণের বাটী গমন করেন এবং বলেন—আমাদের বংশে একটী উজ্জ্বলরত্ন লাভ হইল, এই বালক 'কালিদাসের' ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া আমাদের বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

সেই দিন হইতে এই দুই পরিবারের মধ্যে পূর্ব্ব মিত্রতা ফিরিয়া আসিল। নৃসিংহ যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন আর উভয় পরিবারের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নয়নচন্দ্র অত্যন্ত অত্যাচারী হইলে উভয় পরিবারের মধ্যে সখ্যতা পুনর্ব্বার বিলুপ্ত হয়। ১৭২৭ অব্দের বৈশাখের দ্বিতীয় দিবসে শনিবার পূর্ণিমা রাত্রিতে প্রেমচন্দ্রের জন্ম হয়। নৃসিংহ তাঁহার জন্মফল গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। এই বালক বড় হইলে একজন বিদ্বান ও ভাগ্যবান বলিয়া খ্যাত হইবে। নৃসিংহের এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রেমচন্দ্রের মত প্রতিভামণ্ডিত পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নৃসিংহ এই বালককে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার শিক্ষাবিষয়ে প্রথমাবধি সাতিশয় যত্নবান ছিলেন। ইহাতে প্রেমচন্দ্রের অনেকটা মঙ্গল ঘটিয়াছিল। পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালীর অনুসারে বর্ণজ্ঞানাদি জন্মিলে

নৃসিংহ প্রেমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিখাইবার অভিপ্রায়ে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। উপনয়ন হইলে তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক গায়ত্রী শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। এই সময়ে এই বালকের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তিনি প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রেমচন্দ্রের ব্যাকরণ পাঠ শেষ হইতে না হইতেই নৃসিংহের মৃত্যু হয়।

নৃসিংহের মৃত্যুর পর প্রেমচন্দ্র রঘুবাটীতে তাঁহার মাতুলালয়ে থাকিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺সীতারাম ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু মাতুলালয়ে তাঁহাকে বেশী দিন থাকিতে হইল না, কোন কারণে মাতুলদিগের সহিত কলহ করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কাব্য ও অলঙ্কার পাঠ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তৎকালে রাঢ়দেশে এই দুই শাস্ত্রের কোন ভাল অধ্যাপক না থাকায় তিনি কিছুকাল বাটীতে বসিয়া থাকিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। এই ১৩ ১৪ বৎসরের সময়েই তাঁহার হৃদয়ের সহজভাবের মধুর গীতিময় উচ্ছ্বাস স্ফুরিত এবং কবিত্ব কুসুমের কোরক বিকসিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে বঙ্গদেশের প্রায় সকল গ্রামেই তর্জ্জা গাওনার দল ছিল—আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তর্জ্জার বড় সমাদর ছিল। দুই দলের কবিওয়ালারা আসরে বসিয়া গান করিত। প্রেমচন্দ্র গান বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে বাল্য বয়সেই প্রেমচন্দ্রের রচনাশক্তির বিকাশ হয়।

কিছুদিন পরে প্রেমচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে ডুয়া গ্রামের জয়গোপাল তর্কভূষণের টোলে পাঠাইয়া দিলেন। ডুয়া গ্রাম শাকনাড়া হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিম। তৎকালে জয়গোপাল তর্কভূষণ মহাশয় কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার আদি শাস্ত্রে রাঢ়দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

তাঁহার টোলে ছাত্রসংখ্যা এত অধিক ছিল যে, প্রেমচন্দ্রকে আর একটী ব্রাহ্মণের বাটীতে আহার করিয়া টোলে আসিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। ব্রাহ্মণের বাটীতে আহারের বিনিময়ে ব্রাহ্মণের দুইটী অল্পবয়স্ক পুত্রকে তিনি ব্যাকরণ পাঠ করাইতেন। প্রেমচন্দ্র অচিরেই তর্কভূষণ মহাশয়ের অতি প্রিয়ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা বলিয়া তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিতে বলিতেন। এই-রূপে গদ্যরচনায় প্রেমচন্দ্র কিঞ্চিৎ পরিপক্কতা লাভ করিলে, তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাকে মুখে মুখেই কবিতা রচনা করিতে শিখাইতেন। তিনি অধ্যাপকের অত্যন্ত প্রিয় হওয়ায় অন্যান্য ছাত্রেরা তাঁহার হিংসা করিত এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। সঙ্গীত-রচনার আমোদ প্রেমচন্দ্রের বাল্যাবসানেও বিরত হয় নাই। তিনি কলি-কাতায় যখন অধ্যাপনা করিতেন, তখনও ৺ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে কবিওয়া-লাদের লড়াই দেখিতে যাইতেন।

সঙ্গীত রচনা ব্যতীত ছিপে করিয়া মাছ ধরা প্রেমচন্দ্রের আর একটী বাল্যকালের আমোদ ছিল। তিনি ৭।৮ বৎসর জয়গোপাল তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের মূল ও টীকা বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছিলেন এবং কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া-ছিলেন।

এই সময় ১৮।১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রেমচন্দ্রের বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি ইংরাজী ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দর্শন আদি শাস্ত্র পাঠ করিবেন বলিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। সেখানে তাঁহার প্রতিভা ও রচনায় আসক্তি দেখিয়া উদারচরিত অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেব চমৎকৃত হইয়া-ছিলেন এবং তদবধি প্রেমচন্দ্রকে সস্নেহনয়নে দেখিতে লাগিলেন। তখন সংস্কৃতকলেজে নিমাইচাঁদ শিরোমণি, শম্ভুনাথ বাচস্পতি, নাথুরাম শাস্ত্রী,

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহাদের যত্নে ও স্বীয় অনন্যসাধারণ মেধা ও চেষ্টার বলে প্রেমচন্দ্র শীঘ্রই উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে লাগিলেন। প্রেমচন্দ্র ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে থাকিয়া সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র বিশেষভাবে পাঠ করেন। পরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নাথুরাম শাস্ত্রী মহাশয় কিছুদিনের জন্য কার্য্য হইতে অবকাশ লইলে উইলসন্ সাহেব তাঁহাকে অধ্যাপনার ভার দেন। পর বৎসর নাথুরামের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে অধ্যাপনাকার্য্যে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করেন।

কর্ম্মজীবন

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রেমচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারের অধ্যাপক-পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন তখন কয়েক ব্যক্তি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উইলসন্ সাহেবকে বলেন যে প্রেমচন্দ্র রাঢ়দেশীয় শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণ, তাঁহার নিকটে ভাল ভাল গঙ্গাতীরবাসী ব্রাহ্মণেরা পাঠ স্বীকার করিবেন না। ইহাতে সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি ত আর প্রেমচন্দ্রকে কন্যা দান করিতেছিনা, তাঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি, ঈর্ষাকুল কয়েক জন অধ্যয়ন না করিলেও বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হইবে না।

অলঙ্কারের অধ্যাপক হইবার পরেও প্রেমচন্দ্র অধ্যয়ন ত্যাগ করেন নাই। সে সময় তিনি ন্যায়শাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই জন্য কলেজের অধ্যাপকেরা প্রথমে তাঁহাকে "ন্যায়রত্ন" বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু পরে এডুকেশন কমিটী হইতে "তর্কবাগীশ" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই হইতেই তিনি "তর্কবাগীশ" নামে সকলের নিকট পরিচিত।

এই সময় "তর্কবাগীশ" মহাশয় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরাম ও তৃতীয় ভ্রাতা সীতারামকে অধ্যয়ন করাইবার জন্য কলিকাতায় আনিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীরামকে ইংরাজী শিক্ষা দেন এবং সীতারামকে

ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন করেন। তাঁহার পিতা রামনারায়ণ প্রথমে ইংরাজী শিক্ষায় আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু "তর্কবাগীশের" একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া অনুমতি দেন। প্রেমচন্দ্র শ্রীরামকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট করান। শ্রীরাম সেখানে পাঠ শেষ করিয়া পাইকপাড়া এষ্টেটের ভাবী উত্তরাধিকারী ৺প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ৺ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। এই সময় তিনি জমিদারীর কার্য্য সমূহেরও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার অসাধারণ যত্ন ও বুদ্ধিকৌশলে পাইকপাড়া এষ্টেটের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সীতারামও কলিকাতায় অধ্যয়ন সময়েই বিসূচিকা রোগে মারা যান।

অনুপম রূপগুণসম্পন্ন সহোদরের অকালমৃত্যুতে প্রেমচন্দ্র সাতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং অপর সহোদরদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এক-প্রকার বীতরাগ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা রামময় পল্লী-গ্রামেই থাকিয়া টোলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনিবেন কি না ভাবিয়া যখন প্রেমচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন তখন একদিন রামাক্ষয় নিজেই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজেই ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। রামাক্ষয়ও তাঁহার অপর ভ্রাতাদিগের মত বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান থাকায় শীঘ্রই তাঁহার শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রেমচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিতেন তখন হইতেই ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। পরে এই বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে যখন ঈশ্বর গুপ্ত "সংবাদ প্রভাকর" নামে সমাচারপত্র বাহির করেন, তখন প্রেমচন্দ্র তাহার শ্রীবর্দ্ধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। "প্রভাকর" কাগজ লইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে প্রেমচন্দ্রের বেশ প্রণয় জন্মে। তাঁহারা এক-

সঙ্গে কবিওয়ালাদের গান শুনিতে যাইতেন। কিন্তু এই সময়ে কলিকাতার বড় বড় লোকদের দলে পড়িয়া ঈশ্বর গুপ্ত নিজের অমূল্য চরিত্রটিকে কলুষিত করিলেন। সেই হইতে প্রেমচন্দ্র তাঁহার সহিত আর পূর্ব্বের মত মাখামাখি করিতেন না। কিন্তু ঈশ্বর চন্দ্রের প্রতি তাঁহার কখন অনুরাগ হ্রাস হয় নাই।

এই সময় হইতে তিনি বঙ্গভাষায় লেখা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার লিখিত নিম্নলিখিত রচনাসমূহের নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই।

১। তৎকালে কালিদাসের রঘুবংশের কোন টীকা না থাকায় উইলসন সাহেব নাথুরাম শাস্ত্রী মহাশয়কে টীকা করিতে বলেন। নাথুরাম কয়েক সর্গ টীকা করিয়াই মৃত হইলে অবশিষ্ট কয়েক সর্গ প্রেমচন্দ্র সমাপ্ত করেন। সংস্কৃত রচনায় ইহাই তাঁহার প্রথম লেখা।

২। তৎপরে তিনি নৈষধ ও রাঘব পাণ্ডবীর মহাকাব্যদ্বয়ের টীকা রচনা করেন। ১৮৫৪ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে তাঁহার টীকা মুদ্রিত হয়। তাঁহার টীকার অত্যন্ত সমাদর হয়।

৩। কালিদাসের কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত টীকা করিয়া মুদ্রিত করেন।

৪। এই সময়ে সংস্কৃত নাটকগুলি মুদ্রিত না হওয়ায় সাধারণের পাঠে বড় অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ১৭৬১ শকে কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটক বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করেন। পরে ১৭৮১ শকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব মহোদয়ের আদেশে গৌড় প্রচলিত এবং দেশান্তরে মুদ্রিত কয়েকখানি আদর্শ অবলম্বন করিয়া তর্কবাগীশ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত করেন।

৫। ১৭৮২ শকে মুরারি মিশ্র বিরচিত অনর্ঘরাঘব নাটকখানি ঐরূপ ব্যাখ্যার সহিত মুদ্রিত এবং প্রচারিত করেন।

৬। ১৭৮৩ শকে তর্কবাগীশ গৌড়দেশ-প্রচলিত ভবভূতির উত্তররাম-চরিত নাটকখানি বারাণসী ও অন্ধ্রদেশ হইতে সমানীত আদর্শ পুস্তকের সহিত মিলন ও সংশোধন করিয়া ব্যাখ্যার সহিত মুদ্রিত করেন।

৭। মহাকবি দণ্ডি প্রণীত কাব্যদর্শন নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থখানি এদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কাউএল সাহেবের সাহায্যে ১৭৮৫ সালে তিনি বহু পরিশ্রমে পুস্তকখানির জীর্ণোদ্ধার করেন এবং টীকা করিয়া মুদ্রিত করেন।

৮। ইহা ছাড়া তিনি পুরুযোত্তম-রাজাবলীর বর্ণনা উপলক্ষে বিক্রমাদিত্য ও শালাবাহনের চরিত ও নানার্থসংগ্রহ নামক একখানি অভিধান রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ শেষ করিতে পারেন নাই।

কলেজে অধ্যাপনা সময়ে সংস্কৃত মিশ্র পালি প্রভৃতি ভাষায় খোদিত তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক প্রভৃতির সুসঙ্গত পাঠ করা প্রেমচন্দ্রের একটী কার্য্য ছিল। এই জন্য তাৎকালীক এসিয়াটীক সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট জেমস্ প্রিন্সেপ্ সাহেব মহোদয়ের নিকটে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে প্রিন্সেপ্ সাহেব মগধ, পূর্ব্ববঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত তাম্রপট প্রস্তর ফলক সকল সম্যক্‌রূপে পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই অধ্যপনা কার্য্যের সময় ইংরাজী ১৮৫১ সালে প্রেমচন্দ্রের মাতার অত্যন্ত পীড়া হয়। প্রেমচন্দ্র তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা করাইবার জন্য মাতাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না; ঐ বৎসর ৫ পৌষ সন্ধ্যার সময় নিমতলায় গঙ্গাগর্ভে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সে সময়ে প্রেমচন্দ্রের পিতা রামনারায়ণ

শাকনাড়ায় ছিলেন। পত্নীর মৃত্যু সংবাদ তাঁহাকে দিবার দুই দিবস পূর্ব্বেই তিনি স্বপ্নে দেখিয়া সকলকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। পত্নীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ রামনারায়ণ মাত্র তিন বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৮৫২ সালে তিনি পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, এবং এক বৎসর রোগ ভোগ করিয়া ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর প্রায় দশ বৎসর পরে প্রেমচন্দ্র পেন্‌সনের জন্ত আবেদন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রথমে ছয় মাসের অবকাশ লইয়া গয়া, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং ১৮৬৪ সালে পেনসন প্রাপ্ত হইলেন। ইদানীং তিনি সংসারের উপর বিরাগ প্রকাশ করেন এবং শেষজীবনে ৺কাশীধামে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

শেষজীবন

শেষজীবনে তিনি সংসার হইতে নির্লিপ্তভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াই ৺কাশীধামে গমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি মাত্র চারি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি পথে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া দান করিয়া, তবে গৃহে ফিরিতেন।

কাশীতে অবস্থানকালে এক দিবস তিনি তথাকার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ গ্রিফিথ্‌ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার পরিধানে ধুতি, উড়ানী ও পায়ে মাত্র চটিজুতা ছিল। কলেজের কোন্‌ ঘরে সাহেব আছেন তাহা অনুসন্ধান করিতেছেন, এমন সময় অভয়নাথ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার সম্মুখে পড়েন। সাহেবের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী শুনিয়া এবং তাঁহার চটিজুতা দেখিয়া অভয়নাথ

ইতঃস্ততঃ করিতে থাকেন। তখন প্রেমচন্দ্র বলেন যে বোধ হয় কলিকাতা হইতে কাউয়েল সাহেব, তাঁহার আগমন সংবাদ গ্রিফিথ্‌কে লিখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া অভয়নাথ তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং গ্রিফিস্‌ সাহেবের নিকট লইয়া যান ও সাহেব অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন।

পর দিবস হইতে অভয়নাথ তাঁহার ছাত্র হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে প্রায় ৫০।৬০ জন ছাত্র জুটিয়া গেল। কোথায় শেষজীবনে শান্তিতে কাটাইবেন বলিয়া ৺কাশীবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার তাঁহাকে অধ্যাপনা করিতে হইল। এ জন্য তিনি অভয়নাথকে প্রায়ই বলিতেন, "অভয় তুমিই যত গোলমাল বাধাইলে।"

৺কাশীতে বাস সময়ে তাঁহাকে দেখিলে দেবতুল্য বলিয়া জ্ঞান হইত। সকল কার্য্যেই সরলতা, সাধুতা ও উদারতা দৃষ্ট হইত। ভয়, ক্রোধ বা বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখা যাইত না। সর্ব্বদাই তাঁহার মুখ হাস্যমণ্ডিত ছিল, কিন্তু তাহাতে একটা বিরাট গাম্ভীর্য্য ছিল।

তিনি প্রত্যহ রাত্রি ৩।৪ টার সময় উঠিতেন, পরে জপের ঘরে প্রবেশ করিতেন, এই সময় তাঁহার নিকট একজন সাধু আসিতেন; তাঁহারা উভয়েই যোগ অভ্যাস করিতেন। প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া দান করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল।

তিনি কখনও কাহারও খোসামোদ করেন নাই। সকল বিষয়েই তাঁহার মত তিনি নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতেন। যে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে যত্নবান হন, তখন তর্কবাগীশ মহাশয় বলিয়াছিলেন "ঈশ্বর! বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া প্রবল জনরব। কতদূর সত্য জানি না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বমতে আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছ

কি? যদি না হইয়া থাক, অপরিণামদর্শী নব্যদলের কয়েকজন মাত্র লোক লইয়াই এরূপ গুরুতর কার্য্যে তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিও না—বিবেচনা করিয়া দেখিবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

তিনি যে কেবল বাহিরে থাকিয়াই দানধ্যান করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি নিজ গ্রাম শাকনাড়ারও অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রামের লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য গ্রামে এক বৃহৎ পুষ্করিণী কাটাইয়া দিয়াছেন। এখনও সেই পুষ্করিণী বর্ত্তমান থাকিয়া শত শত পিপাসিত লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে।

ইংরাজী ১৮৬৭ খৃঃ অঃ ২৫শে এপ্রেল তারিখে বিসূচিকা রোগে ৺কাশীধামে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। সে সময় তাঁহার পত্নী ব্যতীত আর কেহই তাঁহার নিকটে ছিলেন না। সে সময় ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কাশীতে ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ তিনি কলিকাতায় তারে খবর দেন। ১০ই চৈত্র (১২৭৩ সাল) সন্ধ্যার সময়ে মণিকর্ণিকা" পুণ্যময় শ্মশানক্ষেত্রে তাঁহার পুণ্যদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়।

মৃত্যুর সময় তাঁহার চারি পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান ছিল। ৬১ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ—শুধু বঙ্গদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষ একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইল, ভারতবর্ষের যে কত ক্ষতি হইল, তাহা স্মরণ করিতে ভারতবর্ষের কত যুগ কাটিয়া যাইতেছে বলা যায় না।

প্রেমচন্দ্রের পুত্রগণ ও বংশধরেরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত হইয়া বংশের মর্য্যাদা পুরুষানুক্রমে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানকালে জ্ঞান বুদ্ধি, বিদ্যা, অর্থসমন্বিত এরূপ বৃহৎ নির্ম্মলচরিত্র ব্রাহ্মণবংশ বঙ্গদেশে বড়ই বিরল। তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে মধ্যম রামবাবু ইংরাজীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া পাইকপাড়া রাজ এষ্টেটের দেওয়ানের পদে

অধিষ্ঠিত হইয়া যশের সহিত উক্ত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতার গুণে উক্ত এষ্টেটের বিশেষ উন্নতি-লাভ হওয়ায় তিনি ঐ রাজবংশীয়গণের নিকট উপঢৌকনস্বরূপ কয়েক-খানি তালুক পাইয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্থ সহোদর রামময় তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় বংশগত পারদর্শিতালাভ করিয়া বহুকাল সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ রামাক্ষয়বাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া অবসর গ্রহণান্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রায় বাহাদুর" উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে তিন জন এখনও জীবিত আছেন। তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কেবল-মাত্র কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণবাবু উড়িষ্যায় ওকালতি করিতেছেন। প্রেমচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র হরেকৃষ্ণবাবু এম, এ, বি, এল ন্যায়রত্ন উপাধিতে মণ্ডিত হইয়া এসিষ্টাণ্ট সেসন জজের পদপ্রাপ্ত হইয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন পূর্ব্বক অকালে পক্ষঘাত রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ৺হরেকৃষ্ণবাবুর পুত্রগণ সকলেই কৃতী, শিক্ষিত ও দয়া দাক্ষিণ্যাদিগুণে মণ্ডিত হইয়া এক্ষণে ১০১ নং তালতলা লেনে "অক্ষয়-কুটীর" নামক ভবনে বাস করিতেছেন।

এই পবিত্র বংশের মধ্যে সকলেই চরিত্রবান ও সঙ্গতিপন্ন এবং অনে-কেই সবজজ, মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক প্রভৃতি পদে এখনও নিযুক্ত আছেন। প্রেমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র-গণের মধ্যে ভবদেববাবু একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও কণ্ট্রাক্টর। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর বঙ্গদেশে প্রায় দেখা যায় না। তিনি উক্ত ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন।

শ্রীপতিবাবু সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতালাভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুকাল যশের সহিত সব

জজের কার্য্য করিয়া এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া ভবানীপুরে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার সহোদর রমাপতিবাবু আইন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত আছেন। শ্রীপতিবাবুর পুত্রগণও প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নস্বরূপ।

বংশাবলী।

মুনিরাম
শম্ভুরাম
রামকান্ত
লক্ষ্মীকান্ত
রামসুন্দর
নৃসিংহ
নয়নচন্দ্র
রামনারায়ণ
রামসদয়
সুধারাম
প্রেমচন্দ্র
শ্রীরাম
সীতারাম
রামময়
রামাক্ষয়
(১)
(২)

প্রেমচন্দ্র
রামকৃষ্ণ
প্রাণকৃষ্ণ
৺হরেকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ
হেমচন্দ্র
বসন্তচন্দ্র
অতুলকৃষ্ণ
বিজ্ঞানেশ্বর
রত্নেশ্বর
বীরেশ্বর
ক্ষেত্রমোহন
৺চন্দ্রমোহন
ললিতমোহন
মদনমোহন
পরিতোষ
প্রফুল্লকুমার
সুশীলকুমার
বিমলকুমার
প্রমোদরঞ্জন
চিত্তরঞ্জন
সুবোধরঞ্জন
২ কন্যা

(১) শ্রীরাম
রঘুদেব
রামদেব
ভবদেব
ভূদেব
নরেন্দ্রনাথ
২ কন্যা
সত্যপ্রিয়
সত্যব্রত
সত্যরঞ্জন
সত্যকিঙ্কর
জগবন্ধু
দীনবন্ধু
জনবন্ধু
বিশ্ববন্ধু
(২) রামময়
শ্রীপতি
সুরপতি
পশুপতি
রমাপতি
বহুপতি
রঙ্গলাল
কিশোরিলাল
অমৃতলাল
২ কন্যা
কালিদাস
দুর্গাদাস
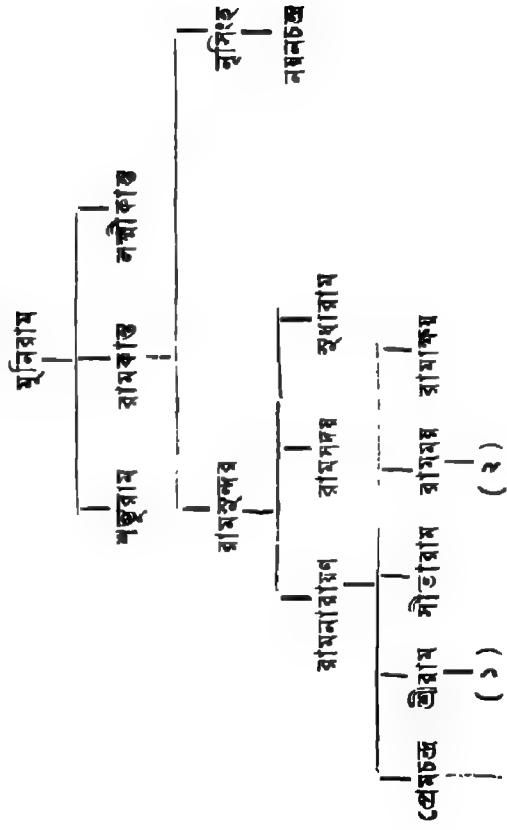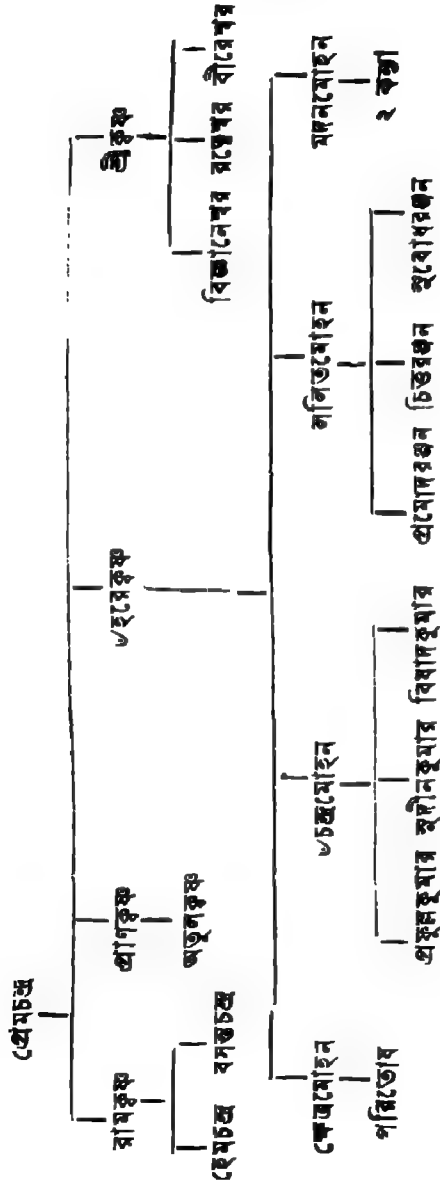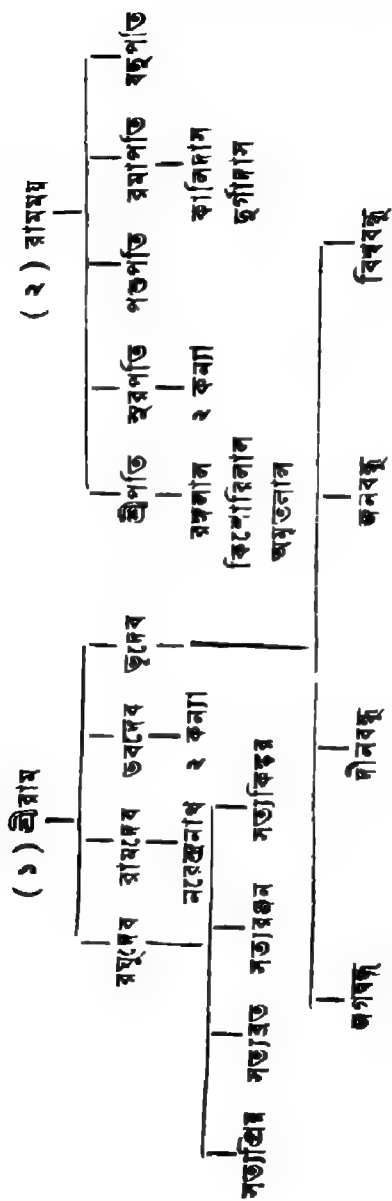
বাগাঁচড়ার বসু বংশ।

শান্তিপুর থানার এলাকাধীন বাগাঁচড়া গ্রাম পূর্ব্বকালে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। গ্রাম্যদেবতা ৶ বাগ্দেবী দেবী আশ্রিত বাগাশ্রয় গ্রাম (যাহার অপভ্রংশ কালে বাগ আশ্‌রা বা বাগাঁচড়ায় পরিণত হইয়াছে) তৎকালে বিদ্যাবিনয়াদি গুণযুক্ত বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাসস্থান ছিল। বাগ্দেবী নদী বা বাগ্দেবীর বিল গ্রামটীর উত্তর সীমায় প্রবাহিত হইয়া বাগ্দেবী দেবী মন্দিরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া কালনার সন্নিকটে জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকল জাতিরই লোক এই গ্রামে তখন বাস করিতেন। পল্লীগ্রামের সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন এই গ্রামটী নানা আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। এই গ্রামের বসুবংশ বিশেষ প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী এবং হিন্দুসমাজে বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহারা মাইনগরের বসুশ্রেণী ও মুখ্যকুলীন নারায়ণ বসুর সন্তান। ইঁহাদের ভাব মধ্যাংশ দ্বিতীয় পো (মধ্যমাংশ দ্বিতীয় পুত্র)। পূর্ব্বে ইঁহাদের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার পাঁচড়া গ্রামে।

কথিত আছে, বসুবংশের পূর্ব্বতম পুরুষ ৶ রাঘবেন্দ্র বসুর পুত্র ভৃগুরাম বসু বাগাঁচাড়ার দত্তপরিবারে বিবাহ করিয়াছিলেন। উক্ত দত্তবংশের কেহ এখন বাগাঁচাড়ায় বাস করেন না।

বিবাহের পর ভৃগুরাম বসু বাগাঁচড়ায় বাস করেন। ইনি নদীয়ার রাজ-সরকারে উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতার গুণে তিনি রাজসরকার হইতে এবং নিজের উপার্জ্জন হইতে অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ এখানে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে-

ছেন। পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বংশবৃদ্ধি হওয়ায় বর্ত্তমানে বসুবংশ বহুগোষ্ঠী-সমন্বিত। অনেকেই কৃতবিদ্য, প্রথিতযশা, ধনশালী ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি নানাগুণ-শোভিত। এই বহুল বসুপরিবার একান্নবর্ত্তী না হইলেও বিশেষ আত্মীয়ভাবাপন্ন ও সদাচারী। একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ৺ ভৃগুরাম বসুর সময় হইতে এই বসু-পরিবারের উপর ৺জগদম্বার বিশেষ কৃপা দেখা যায়। এই বংশে নবমপুরুষ ধরিয়া হিন্দুর ক্রিয়াকলাপগুলি অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে। ৺ দুর্গাপূজা কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, সরস্বতী পূজা, রক্ষাকালী পূজা, শীতলা পূজা, এবং তিন পুরুষ হইতে ৺ গঙ্গাপূজা অক্ষুন্নভাবে এই বংশে হইয়া আসিতেছে। এ সৌভাগ্য অতি অল্প বংশেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় তিন শত বৎসরকাল ইঁহাদের দেবীমণ্ডপে দেবীর আবাহন, অধিষ্ঠান ও পূজার্চ্চনা হইয়া আসিতেছে। ইহা একটী পবিত্র পীঠস্থান।

রামচন্দ্র বসুর পুত্র ৺ বিশ্বনাথ বসু কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন। কবিবর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনায় ইঁহার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"দেওয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ"—এই বিশ্বনাথ বসুর সময় হইতে বসু বংশের মর্য্যাদা সমধিক বর্দ্ধিত হয়।

ইনি পরম ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। কথিত আছে যে ইঁহার জীবদ্দশায় জ্ঞাতিবর্গ বা গ্রামস্থ কাহারও কোনও অভাব থাকিবার উপায় ছিল না। এমন মুক্তহস্ত হৃদয়বান কর্ম্মবীর জগতে অতীব বিরল।

ইঁহার কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাগাঁচড়ার বসু বংশে একটী বিশেষ সম্মানসূচক কুলমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। নদীয়া জিলা ব্রাহ্মণ প্রধান ও ব্রাহ্মণ শাসিত। মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রবর্ত্তিত কুলমর্য্যাদা আজিও এ বংশে অক্ষুন্ন রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের বা কায়স্থের কোনও বিবাহ অন্নপ্রাশনাদি শুভকার্য্যে মাল্যচন্দন দানের বিধান আছে। সামাজিক ও কৌলিক নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণের সভায় ব্রাহ্মণের এবং কায়স্থের সভায় কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের এবং কায়স্থের সামাজিক রীতি পরিমাণানুসারে বা বংশানুযায়ী মাল্যচন্দন দান হইয়া থাকে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাগাঁচড়ার বসুবংশের মর্য্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি মানসে বিধান করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণ বাটীতে এবং ব্রাহ্মণ সভায় বাগাঁচড়ার বসু বংশের কেহ উপস্থিত থাকিলে তিনি ব্রাহ্মণের হস্তে মাল্যচন্দন পাইবেন। সমস্ত নদীয়া জিলায় এ সম্মান বাগাঁচড়ার বসু বংশের সন্তানগণ পাইয়া আসিতেছেন।

কথিত আছে, পলাসী যুদ্ধের পর ক্লাইব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী কাশিমবাজারের রেশমের কুঠীর জন্য প্রার্থনা করিলে মহারাজ বিশ্বনাথ বসুকে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করেন। বিশ্বনাথ বসু অতি যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ বসুর বিমাতার সহমৃতা হইবার কথা শুনা যায়। যখন পতির মৃত্যুসংবাদ বাগাঁচড়ায় পৌছে তখন তিনি তুলসী ও গাঁদা ফুলের গাছে জলসিঞ্চন করিতেছিলেন। এ নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার সংকল্প করেন এবং বসু বংশে কেহ গাঁদা বা তুলসী বৃক্ষ রোপণ না করেন এমত অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া যান। এখনও পর্য্যন্ত বসু বাটীতে কেহ গাঁদা বা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করেন না।

বিশ্বনাথের বংশে ৺ নীলাম্বর বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন ও সাধুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং অনেক সাধুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ধর্ম্ম প্রসঙ্গ দ্বারা লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার তাঁহার যথেষ্ট শক্তি ছিল।

শম্ভুনাথের বংশে কমললোচন ইংরাজের আদি আমলে নিমক মহলের দেওয়ান ছিলেন এবং বিশেষ অর্থশালী হইয়াছিলেন। ইনি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। শম্ভুনাথের পৌত্র পুলিনবিহারী বহরমপুরে বাস করিয়াছিলেন।

উমাকান্তের দৌহিত্রী ত্রৈলোক্যমোহিনীর সন্তানগণ যথা চন্দ্রভূষণ বিভূতি ভূষণ ও প্রভাসচন্দ্র মিত্র আজিও বসু বংশের সহিত অভিন্নভাবে বগাঁচড়ায় বাস করিতেছেন।

জ্যেষ্ঠ শাখার গৌরহরির পুত্র অম্বিকাচরণের দৌহিত্র শ্রীযুক্তচন্দ্রভূষণ চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টের রিসিভার আফিসের অধ্যক্ষ। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ষ্টার থিয়েটারের অভিনেতাস্বরূপ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন ও জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। ঐ শাখার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা পুলিশ কোর্টের অন্যতম উকিল।

নীলকণ্ঠের বংশে জানকীনাথ বসু কলিকাতার মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান ছিলেন। ইনি বিশেষ মনীষাসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও তেজোশালী লোক ছিলেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র রামগোপাল বসু রাণাঘাটের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে বসুবংশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এই শাখার হরিদাস বসু এক্ষণে বাড়ীতে থাকিয়া বাৎসরিক পূজাদির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই শাখার রাধা নাথ বসুর নাম সুবিদিত। দরিদ্রসেবা তাঁহার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য

ছিল। অপুত্রক হইলেও তিনি ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের প্রতি পুত্র নির্ব্বিশেষ ব্যবহার করিতেন।

রাধানাথের দ্বিতীয় ভ্রাতা অভয় চরণ সাহসী ও বলবান্ ব্যক্তি ছিলেন। বিপন্নকে উদ্ধার করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না; এক সময়ে ব্যাঘ্রের মুখ হইতে একটী গোবৎস রক্ষা করেন। আজীবন গো-সেবা করিয়া সাধুর ন্যায় গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার এক-মাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু সুলেখক এবং বাগাঁচড়ার বসু বংশের নানা সদগুণে শোভিত। ইঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ এম এ, মহৎ প্রকৃতির লোক। উচ্চ আদর্শ ও স্বদেশী ভাব প্রচার করে ইঁনি নিজ আর্থিক স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ও কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এরূপ ত্যাগী পুরুষ বিরল।

রাধানাথের কনিষ্ঠ কেদারনাথ বসু ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এল, সি, ই, রেলওয়ে এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারীতে ইঁন বিশেষ পারদর্শী। শিলং হইতে গৌহাটি রেলওয়ে লাইন ইনি জরীপ করিয়াছেন। ইনি এখন ইন্দোর রাজের অধীনে উচ্চ পদবীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা হইতে স্বীয় অধ্যবসায় বলে ইনি এখন সর্ব্বপ্রকারে উন্নত অবস্থায় আরূঢ়। ইঁহার মধ্যম পুত্র বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছেন। ইঁহার মধ্যমভ্রাতা শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ বসু এল, এম, এস, অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের কার্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া শান্তিপুরে আছেন, জীবনে উন্নতির লোভ সংবরণ করিয়া বংশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ইনি শান্তিপুর ত্যাগ করেন নাই। অনেকেই বিদেশবাসী, ইনিই স্বদেশে থাকিয়া বংশের

ক্রিয়াকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই বংশের দিগম্বর বসু কাশীবাস করিয়াছিলেন।

রামপ্রাসাদের বংশ বাগাঁচড়ায় আর নাই। ইঁহারা এলাহাবাদে দারাগঞ্জ মহল্লায় বাস করিতেছেন।

রামকানাইয়ের বংশে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত গণিত-বিশারদ ৺ বৈদ্যনাথ বসুর জন্ম হয়। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে অনেকেই আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে ভবানন্দ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। সেকালে নদীয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী জিলাসমূহে তাঁহার তুল্য আরবী ও পারশী ভাষাবিশারদ মৌলবী মুসলমানের মধ্যেও কেহ ছিল না। লোকে তাঁহাকে মৌলানা ভবানন্দ বলিত। দর্শন-শাস্ত্রেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; অত্যধিক জটিল দর্শনশাস্ত্র পাঠের ফলে তাঁহার মতিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। শুনা যায়, তাঁহাকে তাঁহার মৌলবী আরবা ভাষায় কোনও দুরূহ দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি নিষেধ না মানিয়া বিশেষ যত্নের সহিত সে পুস্তক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কোনও জটিল সমস্যার সমাধান করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠেন "হিঁথা কাঁহা গিয়া" তদবধি তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। তিনি কোনও কাজই করিতে পারিতেন না, গম্ভীরভাবে বসিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেন "হিঁথা কাঁহা গিয়া।"

শিবানন্দের পুত্র নবীনচন্দ্র বাল্যকালেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন।

বৈদ্যনাথের পিতা গোবিন্দচন্দ্র পরম সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায় ও বিশেষ বলবান লোক ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বলের অনেক গল্প শুনা যায়। একবার তিনি পদব্রজে আসিবার কালীন

পাতুয়ার নিকট ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয়েন। তিনি একাকী ও নিরাশ্রয়। ডাকাতেরা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলে তিনি বিপদে মুহ্যমান না হইয়া তাঁহার আক্রমণকারী অগ্রবর্ত্তী ডাকাতের মুখে একটী ভীম পদাঘাত করেন। ডাকাতটী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়। তাঁহার অমিততেজ দেখিয়া অন্য ডাকাতগণ পলায়ন করে। তিনিও তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ করেন। বার বৎসর পরে তিনি ও বালক বৈদ্যনাথ কুমিল্লার পথে নদীতীরে একটী দোকানে জলযোগাদি করিতেছেন সেই সময় একটী ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য আসিলে তাহাকে তিনি চিনিতে পারেন। তাহার দুই পংক্তি দন্ত ও মুখের নিম্নের অংশ অনেকটা নাই। উহা গোবিন্দের পদাঘাতের ফল। বৈদ্যনাথের জন্মবৃত্তান্ত বড়ই রহস্যপূর্ণ। শেষবয়সে গোবিন্দচন্দ্র ভাগলপুর জিলায় কাহলগাঁও ষ্টেশনের নিকটে ৺বামনাথ ঘোষালের জমিদারীতে নায়েবের কার্য্য করিতেন। তৎকালে রেলপথ ছিল না। পশ্চিমাঞ্চলের ও নেপালের সাধু সন্ন্যাসীরা বৎসরান্তে পূর্ব্ববঙ্গ আসাম প্রভৃতি ও বিশেষতঃ চন্দ্রনাথ তীর্থ পর্য্যটনমুখে ঐ পথে গমন করিতেন। অনেকে সেবক ও ধার্ম্মিক গোবিন্দ চন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদিগকে সেবায় তুষ্ট করিতেন। একবার একটী বৃদ্ধ সাধু সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হইয়া গোবিন্দ চন্দ্রের সেবায় আরোগ্যলাভ করেন। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র সন্তান হয় নাই। সাধু সেবায় তুষ্ট হইয়া গোবিন্দ চন্দ্রকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ গোবিন্দ চন্দ্র বলেন তাঁহার কোনও অভাব নাই। সাধু তখন তাঁহার পারত্রিক উদ্ধারের জন্য পুত্রের কথা বলিলে তিনি নিরুত্তর হয়েন। কথিত আছে, সাধু দেওঘরে গিয়া শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞ করিয়া প্রসাদ দিয়া বলিয়া যান তাঁহার একমাত্র পুত্র হইবে, তাহার শিবতুল্য রূপ ও শিবতুল্য চরিত্র

হইবে এবং অনুজ্ঞা করেন যেন পুত্রের নাম বৈদ্যনাথ রাখা হয়। পর বৎসর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই আগষ্ট বৈদ্যনাথের জন্ম হয় এবং সাধুর আদেশানুযায়ী নামকরণ হয়। প্রকৃতই বৈদ্যনাথ বসুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন এবং জানিতেন তাঁহারা সাধুর উক্তির সত্য অনুভব করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি তখন কুমিল্লা জিলাস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন।

অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা উত্তর জীবনে যাহা তাঁহার উন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহার পরিচয় এই অল্প বয়সেই তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার মানসে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক বালক দেশে আসিতেছেন। কুমিল্লায় ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া দেখিলেন ষ্টীমার অনতি-পূর্ব্বে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তখনকার দিন সপ্তাহে একবার ষ্টীমার পাওয়া যাইত। ষ্টীমারের জন্য আবার এক সপ্তাহ বসিয়া না থাকিয়া বালক বৈদ্যনাথ পদব্রজে কুমিল্লা হইতে বার্গাচড়া (৩০০ মাইলের অধিক) আসিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন তাঁহার স্নেহময়ী মাতাও আর ইহ-জগতে নাই। কথিত আছে, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী তারা সুন্দরীও অপূর্ব্ব সুন্দরী, বিশেষ বলবতী এবং বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ বৈদ্যনাথ মাতার নিকট হইতে বিশেষভাবে পাইয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অনশনে দিবারাত্র স্বামীচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সাধ্বী একাদশ দিবসে প্রাণত্যাগ করেন। শ্রাদ্ধান্তে বৈদ্যনাথ দেখিলেন পৃথিবীতে তিনি নিতান্তই একাকী, তাঁহার জ্যেষ্ঠা দুই ভগিনী বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল বৈদ্যনাথ নিষ্কর্ম্ম হইয়া দেশে বাস করেন। পরে এই লক্ষ্যহীন জীবন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠে। একদিন শেষরাত্রে অপরের অজ্ঞাতসারে ষোড়শবর্ষীয় বালক গৃহত্যাগ করেন। নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি কুমিল্লায় গমন করেন।

সেখানে প্রথমে তিনি একটী পাঠশালা স্থাপিত করিয়া বালকবালিকা-দিগকে শিক্ষা দিতেন এবং তদর্জ্জিত সামান্য অর্থে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে তিনি কোর্টে নকলনবীশ ও অনুবাদক প্রভৃতি নানা পদে কার্য্য করেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ তিনি অস্থায়ীরূপে কুমিল্লার পোষ্ট মাষ্টারী করেন। সেই সময় কিছুদিন পোষ্ট আফিস সমূহের অস্থায়ী ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীরা, তাঁহাকে "চতুর বালক" আখ্যা প্রদান করেন। একদিন প্রত্যূষে কুমিল্লা পোষ্টাফিসে বৈদ্যনাথ ডাকের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবার সময় তাঁহার উচ্চ শিক্ষার কথা মনে হইল। তিনি তিন মাসের ছুটী লইয়া ঢাকায় গিয়া এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় পাশ হইয়া উচ্চস্থান অধিকার করেন ও বৃত্তিলাভ করেন। তখন উচ্চ শিক্ষার আশা তাঁহার বলবতী হয়।

কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কৃষ্ণনগরে আসিলে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। যে মহাপুরুষ এমনই অবস্থায় পড়িয়া নিজের অদম্যোৎসাহে ও বুদ্ধিমত্তার গুণে জীবনে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ প্রথম দর্শনেই বালক বৈদ্যনাথকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। পুত্রদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ভার দিয়া তিনি বৈদ্যনাথকে নিজ গৃহে রাখিলেন।

সম্মানের সহিত বৈদ্যনাথ এল-এ পাশ করিয়া পুনর্ব্বার বৃত্তিলাভ করিলেন। যখন তিনি বি, এ, ক্লাসে পড়িতেছেন তখন দীনবন্ধু বাবু কলিকাতায় বদলী হইলেন। কথিত আছে, বৈদ্যনাথ তাঁহার নিকট একটী চাকরীর প্রার্থনা করিলে দীনবন্ধু তাঁহাকে নিরস্ত করেন। যথাক্রমে তিনি ১৮৭১ সালে বি,এ, ও ১৮৭২ খ্রীঃ এম,এ, অনার সহ পাশ করেন। এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য বৈদ্যনাথ কলিকাতায় আসিয়া দীনবন্ধু

মিত্রের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বৈদ্যনাথের পরিচয় হয়। ১৮৭২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে নিজস্কুলে ইংরাজী ব্যাকরণের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। পর বৎসর বিদ্যাসাগর মহাশয় বৈদ্যনাথকে জিজ্ঞাসা করেন যে, নিছক দেশী শিক্ষক দ্বারা কলেজ পরিচালন সম্ভব কি না। সে কালে গভর্ণমেণ্ট ও মিসনারী কলেজ ব্যতীত ভারতবর্ষে অন্য কলেজ ছিল না। বৈদ্যনাথ পূর্ণ সাহস দেওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় affiliation এর জন্য দরখাস্ত করেন। বিলাতী শিক্ষক না রাখিলে affiliate করা হইবে না এইরূপ হুকুম হওয়ায় সে বৎসর আর কলেজ স্থাপিত হইল না। পর বৎসর ১৮৭৩ সালে তদানীন্তন লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যার এস্‌লি ইডেনের সহায়তায় বিদ্যাসাগর দুই বৎসরের জন্য বিদ্যাসাগর College affiliationএর হুকুম পান। ১৮৭৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসে ভারতের দেশীয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রথম কলেজ Metropolitan Institution স্থাপিত হয়। বৈদ্যনাথ ও নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন দুইজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ে বৈদ্যনাথ অধ্যাপনা করিতেন। ১৭জন ছাত্র লইয়া এই কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথম বৎসর ১৭ জনের মধ্যে ১৬ জন এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একজন গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া Duff Scholarship পান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। ইহা ব্যতীত আর তিনজন উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। বৈদ্যনাথ বসু ঐ সময়ে সেকালের টোলের অধ্যাপকের ন্যায় ছাত্রগণকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিজ বাটিতে শিক্ষা দিতেন। দ্বিগুণ উৎসাহে বৈদ্যনাথ অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বি, এ, এম্, এ, বি, এল্, ক্লাস খোলা হইল। বৈদ্যনাথের

অধ্যাপনার ফলে মেট্রোপলিটান হইতে কয়েক জন গণিত শাস্ত্রে এম, এ পাশ করেন। তন্মধ্যে প্রফেসার ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ বসুর বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আজ কাল দেশী কলেজ ও দেশী প্রফেসরে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ, তাহার পথপ্রদর্শক বৈদ্যনাথ বসু। মেট্রোপলিটান কলেজের সাফল্য দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের প্রধান কারণ।

১৮৯১ খৃঃ বিদ্যাসাগরের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপুত্র নারায়ণ বাবুর সহিত তাঁহার বনিবনাও হয় না। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার এখানে প্রয়োজন নাই। সরল উদার বৈদ্যনাথ নীচতার ও কপটতার সহিত যুঝিতে পারিলেন না। আত্মসম্মান জ্ঞান বৈদ্যনাথ বসুর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। ঐ সময়ে বৈদ্যনাথ মেট্রোপলিটানের Principal ও Senior Professor of Mathematics ছিলেন। ৩০শে অক্টোবর ১৮৯২ সালে বৈদ্যনাথ মেট্রোপলিটানের সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

Sir Charles Tawney C.I.E. ঐ সময়ে Director of Public Instruction ছিলেন। তিনি পর দিবস বৈদ্যনাথকে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দেন।

কৃষ্ণনগরে যাইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। Dr. Alex. Martin বৈদ্যনাথের অধ্যাপক ছিলেন। কলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়া তিনি প্রিয় ছাত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে অন্য স্থানে যাইবার জন্য বলেন। তাঁহাকে প্রথমে Ravenshaw College-এর Professor বা পাটনায় একটী মুসলমান বালকের গৃহ-শিক্ষক হইয়া যাইবার জন্য বলা হয়। কটকে গঙ্গা নাই বলিয়া ও পাটনায় বালকের মোসাহেবী করা

অভিপ্রেত না হওয়ায় তাঁহাকে মুঙ্গের জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার করিয়া পাঠান হয়।

তিনি মেট্রোপলিটান ছাড়িবার পর নারায়ণ বাবু তাঁহাকে ফিরিবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু বৈদ্যনাথের প্রকৃতি অন্যরূপ, তিনি আর আসিলেন না।

ঐ সময়ে Metropolitanএর পরিচালনায় বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটায় ২৪ জন লোক আজীবন Trustee হইয়া Matropolitan Institutionকে সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য কলিকাতা High Courtএ একটী মোকদ্দমা করেন। বৈদ্যনাথ একজন উহার Life trustee ছিলেন, তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে হয়, তাঁহারই সাক্ষ্যের বলে Metropolitan সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়। Justice Trevelyan সাহেবের অনুগ্রহে নরায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র বলিয়া মাসিক ১০০৲ বৃত্তি পান। কলেজের সহিত তাঁহার আর কোনও সংস্রব থাকে না। একটী কমিটীর হস্তে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয় এবং নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যাসাগর কলেজ নাম হয়। বৈদ্যনাথের সময় মেট্রোপলিটানের উন্নতি কতদূর হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে জানিতে পারা যায়।

Sir Roper Lethbridge M.P. বহুপূর্ব্বে কৃষ্ণনগর কলেজের professor হইয়া আসেন। বৈদ্যনাথ তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি বৈদ্যনাথকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ১৮৯২ খৃ: Sir Roper Lethbridge কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন বৈদ্যনাথ মেট্রোপলিটানের অধ্যক্ষ ও গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বৈদ্যনাথকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

32 Chowringhee
February 3rd, 1892.

My dear Baidyanath,

I have observed with much pleasure your successful career as an old pupil of Krishnagar and it will give me great pleasure both to see you here and visit the great institution over which you preside. Would it suit you to call here about 9 o'clock on Thursday morning I shall then be at home and glad to see you.

Yours Sincerely,
Sd. Roper Lethbridge.

কলেজ ও স্কুল পরিদর্শন করিয়া তিনি বিশেষ প্রীত হয়েন এবং সমবেত ছাত্র ও শিক্ষকগণের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সেই সময় তিনি পৃথিবীর অন্যান্য বিদ্যালয় সমূহের সহিত ছাত্র সংখ্যা তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে ঐ দিন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন ছাত্রসংখ্যা হিসাবে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৮৯৩ সালে আগষ্ট মাসে বৈদ্যনাথ মুঙ্গেরে আইসেন। জিলা স্কুলের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়, গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব ত্যাগ করায় স্কুলের ভার একটী অমেণ্ট কমিটীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই বৈদ্যনাথের বিচক্ষণতা ও অধ্যবসায় গুণে মুঙ্গের জিলা স্কুল বিহার প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকার করে।

মেট্রোপলিটানে থাকিতে বৈদ্যনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন। প্রধান শিক্ষক হইয়া আসিলে তাঁহার জন্য নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষক পদে বাহাল রাখা হয়। মাত্র সংস্কৃত ওআরব্য

প্রভৃতি ব্যতীত অন্ত বিষয়ে দেশীলোককে স্কুলপরীক্ষক নির্ব্বাচিত করা হইত না। বৈদ্যনাথ বাবু ও অন্ত কয়েকজন সর্ব্বপ্রথমে গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়া যোগ্যতার সহিত পরীক্ষা করেন। ক্রমশঃ অন্যান্য দেশীয় অধ্যাপককেও পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলি উপলক্ষে মুঙ্গেরের স্থানীয় তিনটী এণ্ট্রান্স স্কুল একত্রিত করিয়া বৈদ্যনাথ বাবুর উৎসাহে ডায়মণ্ড জুবিলি কলেজ স্থাপিত হয়।

১৮৯৮ সালে জুন মাসে মুঙ্গের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্চর্য্য এই যে মুঙ্গের কলেজও ১৭টী ছাত্র লইয়া খোলা হইয়াছিল। এই কলেজে বিশেষ যোগ্যতার সহিত বৈদ্যনাথ ১৮৯৭ হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত প্রিন্সিপাল ও অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত কলেজ ও স্কুল একত্রে ছিল এবং বৈদ্যনাথ বসু উভয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন; ঐ সালে স্কুল ও কলেজ পৃথক হইলে বৈদ্যনাথ পূর্ণভাবে কলেজেই রহিয়া যান।

তিনি ৩৫ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক ছিলেন এবং বিংশতি বৎসরাধিক কাল Hony. Magistrate ছিলেন। সদ্বিচারক বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইহা ব্যতীত সাধারণের সর্ব্বকার্য্যেই তাঁহার সহানুভূতি ও উদ্যোগ ছিল।

১৯১১ সালে তিনি আদম শুমারীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া অতি যোগ্যতার সহিত সে কার্য্য সমাধা করেন। কর্ম্মসূত্রে জন্মভূমি ত্যাগ করিলেও বৈদ্যনাথ কখনও দেশের কথা ভুলেন নাই। আজীবন তাঁহার পল্লীভূমির উপর বিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহার চেষ্টায় তাঁহার গ্রামে স্কুল ও ডাকঘর স্থাপিত হয় এবং অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। নিজগ্রামের উন্নতি তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

তিনি সাধ্বী পতিব্রতা রমণীর স্বামী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর ১ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তদবধি তিনি সংসারে বিশেষ অনাসক্ত হইয়া পড়েন।

তিনি ১৯২০ সালের ১৩ই আগষ্ট ৭৫ বৎসর ৬ দিন বয়ঃক্রমকালে একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু ও পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্রীর পুত্র রাখিয়া মারা যান।

বৈদ্যনাথ বসু অমায়িক সরল, উদার বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যাচর্চ্চা-পরায়ণ ছিলেন। সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় অকপট সদানন্দ ও নিরহঙ্কারী লোক ছিলেন। তিনি চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন।

শিক্ষক হিসাবে তিনি আদর্শ ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত অনেক গণ্যমান্য বাঙ্গালী এবং অনেক বিহারী ছাত্ররূপে তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বহু গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি দয়া দাক্ষিণ্যাদি নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন এবং তাঁহার গল্প করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার গল্প শুনিতে আরম্ভ করিলে আর উঠিবার উপায় ছিল না। তিনি অর্থ-সাহায্য দ্বারা কত প্রার্থীর যে অভাব মোচন করিতেন তাহার ইয়ত্তা ছিল না।

তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মৃত্যুর প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক মহা পুরুষের সাক্ষাৎ পান। তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। তাঁহার পন্থানুযায়ী সাধনমার্গে তিনি বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি প্রায়ই যোগ-ক্রিয়ায় রত থাকিতেন। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি নিজ মৃত্যুর সময় অবগত ছিলেন। মৃত্যুর দিন প্রাতে তিনি প্রকাশ করেন সেইদিন তিনি যাইবেন। ঐ দিনের

পূর্ব্বে একমাস মলমাস ছিল ও শেষে কৃষ্ণপক্ষ পাইয়াছিল। তাই ভীষ্মের ন্যায় তিনি শুক্ল প্রতিপদে মুখ্য চন্দ্রোদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যোগাসনে বসিয়া কর জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা "যোগেনান্তে তনুত্যজেৎ" কথাটার সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সরকার বাহাদুর তাঁহাকে খেতাব দিবার কথা তুলিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

বৈদ্যনাথ বসুর একমাত্র সন্তান শ্রীযুত হেমচন্দ্র বসু, এম্ এ, বি-এল, এম, আর, এ, এস (লণ্ডন) মুঙ্গেরে ওকালতী করেন।

হেমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল ছাত্র। তিনি B, A, ও M, A, পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সাংসারিক জীবনেও তিনি অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছেন। মুঙ্গেরের সুপ্রসিদ্ধ উকীলগণের মধ্যে তিনি অন্যতম খ্যাতনামা উকীল ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ইহা বলিলেই তাঁহার পরিচয় দেওয়া হয়। পিতার সমস্ত গুণরাশি তাঁহাতে বর্ত্তমান। ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও তিনি পিতার ন্যায় হিন্দু ধর্ম্মে সম্পূর্ণ আস্থাবান এবং হিন্দু আদর্শ অনুসারেই তাঁহার জীবন পরিচালিত। তাঁহার ন্যায় পিতৃমাতৃভক্ত সংসারে প্রকৃতই বিরল; তিনি পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন এবং তাঁহাদের পদধূলিই তাঁহার অক্ষয় কবচ ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। বসু বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তিনি সর্ব্বদাই যত্নশীল। সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আসীন হইলেও তিনি ধনী নির্ধন সকলেই পরম আত্মীয়। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মপটু লোকও সহসা পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ যে কোন কার্য্যে তাঁহার সমান যত্ন ও

অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমশক্তি অতুলনীয়। তাঁহার সংগঠন শক্তি প্রশংসনীয়। তাঁহার আদর্শচরিত্র প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। তিনি বর্ত্তমানে বাগাঁচড়ার বসু বংশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। কেবল বিখ্যাত উকিল ও ধনশালী বলিলেই হেমচন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হয় না—তিনি একজন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক। শিক্ষার ফল—বিনয় তাঁহাতে প্রকৃতরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রূপে-গুণে আদর্শ-স্থানীয়া, তাঁহারা উভয়েই কনখলের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষিত।

রামশঙ্করের তিন পুত্র হইয়াছিল। শিবনারায়ণের পুত্র কৃষ্ণকান্তের এক মাত্র বংশধর বর্ত্তমান।

দৌহিত্রসন্তান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত কালনার প্রসিদ্ধ উকিল। কালনার অন্তর্গত অকালপৌষ গ্রাম ইঁহার পিতৃভূমি।

শ্যামাচরণ পূজাদি উপলক্ষে অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন ও উৎসাহশীল লোক ছিলেন। তাঁহার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ এম, এ, বি, এল, হাওড়ার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার এবং স্বনামধন্য উকীল। ইনি হাবড়া মিউনিসিপালিটীর বে-সরকারী চেয়ারম্যান। ইনি হাবড়া রামকৃষ্ণপুরে বাস করেন। চারুবাবুর অন্তর্গত গৌড়পাড়ার সিংহবংশে ইঁহার জন্ম।

রাইচরণের পুত্র রসিকলাল সেকালের পুলিসের ইনস্পেক্টার ছিলেন। গোয়েন্দা ইন্স্পেক্টররূপে ইনি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।

রামনারায়ণের বংশে দেবীবরের জন্ম হয়। ইনি সেকালের মুন্সেফ ছিলেন। সুবিচারক বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ঐ বংশে গোবর্দ্ধন বসু শোভাবাজার রাজবাটীর গঙ্গামণ্ডল জমিদারীর নায়েব ছিলেন। ইনি দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন এবং অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। বসু বংশের উন্নতি ও বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ইনি অকাতরে ধনব্যয় করিতেন এবং সকলকেই

স্নেহেরচক্ষে দেখিতেন। বসু বংশের অনেক উন্নতি ইঁহার সময়ে হইয়াছিল। পদ্মা মেঘনা নদীর উপর দিয়া নৌকাযোগে ইঁহাকে কর্ম্মস্থানে যাইতে হইত। সেইজন্য ইঁহার সময়ে বাৎসরিক দশহরার দিবস ষোড়শোপচারে ৺গঙ্গাপূজার প্রবর্ত্তন করা হয়। তদবধি বসুবংশে গঙ্গাপূজা বাৎসরিক কৌলিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু এম এ, বি এল, মহাশয় বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের প্রধান উকিল। ইনিই বর্ত্তমানে বসু বংশের নেতা ও চরিত্রাদি গুণে শীর্ষস্থানীয়। ইঁহার মত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধর্ম্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজিজ্ঞাসু হিন্দু আজকাল অল্পই দেখা যায়। ইনি অমায়িক ও নিরহঙ্কারী, সংসারী হইয়াও নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে জীবন যাপন করেন। বার্গাচড়ার বসু বংশ শাক্তমতাবলম্বী। মাত্র হরিপ্রসাদ বসু বৈষ্ণব মত অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহার দুইটি পুত্র—প্রথমটী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ও পরে বিশেষ সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করিয়া ও দ্বিতীয়টী বি-এস্‌সি পাশ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশন ভুক্ত। বিশম্ভর বিশ্বরূপের পিতৃসৌভাগ্য সাধারণ লোকের ভাগ্যে ঘটে না। বসু বংশের পূর্ণ মর্য্যাদা ও বংশগরিমা ইঁহার দ্বারা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সাহিত্যের প্রতি ইঁহার অনুরাগ আছে এবং "গীতার আভাস" বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকেরও ইনি রচয়িতা। ইঁহারা স্বামী স্ত্রীতে হরিদ্বারের মহাত্মা স্বামী ভোলানন্দগিরির পদাশ্রিত শিষ্য।

রামশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ চাতরাতে বাস করিতেছেন।

জিলা নদীয়া শান্তিপুর অধীন
বাগাঁচড়া বসু বংশের বংশ তালিকা।

২৪ কমললোচন
২৪ উমাকান্ত
২৪ কালিদাস
২৪ মাধবচন্দ্র
২৫ শ্যামাচরণ
(কন্যা) রামেশ্বরী
২৫ ত্রিগুণাপ্রসন্ন
২৫ পুলিন বিহারী
২৬ মাখন
ক্ষীরোদ
প্রিয়সখি (কন্যা)
রহমণি (কন্যা)
২৬ ভুজঙ্গভূষণ (বহরমপুরে বাস)
২৭ দেবেন্দ্রনাথ সরকার
কন্যা ত্রৈলোক্যমোহিনী (স্বামী সর্ব্বেশ্বর মিত্র)
জগদ্বন্ধু সরকার
চন্দ্রভূষণ
বিভূতিভূষণ
প্রভাসচন্দ্র
২২ রামচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে
২৩ প্রাণহরি
২৩ গৌরহরি
২৩ কৃষ্ণমোহন
২৪ উদয়চন্দ্র
২৪ তারিণীচরণ
২৪ ঈশ্বরচন্দ্র
২৫ জানকীনাথ
২৫ ঈশান
শশিভূষণ
যাদু
বিধু
২৬ রামগোপাল
২৬ আনন্দ
হরিদাস
চণ্ডী
বিমান
বঙ্কিম
প্রফুল্ল
শৈল কন্যা
কালী নাথ
২৬ শৈলবালা (কন্যা)
২৪ শ্রীনাথ
২৪ অম্বিকাচরণ
২৪ সর্ব্বেশ্বর
২৪ সীতানাথ
২৫ ক্ষেত্রনাথ
২৫ জগবন্ধু
২৫ ছকড়ি (কন্যা)
তিনকড়ি (কন্যা)
কালিদাস (অন্ধ)
ঠাকুরদাস

২৬ চন্দ্রভূষণ চৌধুরী
২৭ অহীন্দ্র
পঙ্কু
২৬ সুরেন্দ্রনাথ
২৬ দাসী (কন্যা)
২৭ বসন্ত
২৭ শিশির
২৭ জয়ন্ত
২১ নীলকণ্ঠ (ক)
২২ পার্ব্বতীচরণ
২৩ কালীনাথ
২৩ রামতনু
২৩ সদাশিব
২৩ রামধন
২৩ বংশীবদন
২৪ গুরুদাস
২৪ দিগম্বর (Postmaster)
(কাশীবাস)
২৪ দ্বারকানাথ
২৫ বিপিন
২৪ ঈশ্বরচন্দ্র
২৪ নবকুমার
২৪ হলধর
২৫ দীননাথ
২৫ সুধাময়
২৫ প্যারিমোহন
২৫ রাধানাথ
২৫ অভয়াচরণ
২৫ কেদারনাথ
২৬ মানকুমারী
(কন্যা)
সুশীলা
২৬ ক্ষুদিরাম
কন্যা
১মা স্ত্রীরগর্ভে
২য়া স্ত্রীরগর্ভে
২৭ কাত্যায়নী
(কন্যা)
অরবিন্দ
প্রকাশ ঘোষ
২৬ সুরেন্দ্রনাথ
২৬ যতীন্দ্রনাথ
২৬ উপেন্দ্রনাথ
প্রফুল্ল
অরুণ
অনিল
অনন্ত
উমা (কন্যা)
অজিত
সুধীর
খোকা

১৮(খ)

২১ রামপ্রসাদ (অথবা রামসদয়) (খ)
২২ রামহরি
২৩ ভৈরব
২৩ স্বরূপ
২৩ অনুপ
২৩ তারাচাঁদ
২৪ হীরালাল
২৪ অঘোর
২৪ অক্ষয়
২৫ ত্রৈলক্য
২৪ মাখন
ননী
ছানা (যদুনাথ)
(এলাহাবাদে বাস
২১ রামকানাই (গ)
২২ রামকিশোর
২২ জয়গোপাল
কন্যা
২৩ শিবানন্দ
ভবানন্দ
হরানন্দ
সচ্চিদানন্দ
পীতাম্বর
২৪ নবীন (সন্ন্যাসী)
২৪ লোকনাথ
কন্যা
২৪ গোবিন্দ চন্দ্র
২৫ বৈদ্যনাথ
২৬ হেমচন্দ্র
২৭ বীণাপাণি (কন্যা)
উমারাণী (কন্যা)
মাধবীলতা (কন্যা)
শচীন্দ্রকুমার
সন্তোষকুমার
ডলি (কন্যা)
২৭ কানু
লিলি (কন্যা)
কানাই
২১ রামশঙ্কর (ঘ)
২২ শিবনারায়ণ
২২ রামনারায়ণ
২২ হরিনারায়ণ

(চাতুলিয়াতে বাস)
২৩ গঙ্গাধর
শ্রীধর
রতন
কৃষ্ণকান্ত
২৩ চাঁদ
সীতানাথ
অক্ষয়
২৪ রাজেশ্বরী (কন্যা)
নীলমণি
কুসুমমণি (কন্যা)
২৪ ভগবতী
২৫ সুরেশ্বরী কন্যা
২৩ দেবীবর
রাধাকান্ত
মদন গোপাল
যদুনাথ
মাণিক
চন্দ্রনাথ
রামকমল
২৪ গোবর্দ্ধন
২৫ হরিপ্রসাদ
২৬ নির্ম্মল
বিমল
সরযুবালা
সুনীতিবালা
২৪ কৈলাস
২৪ রাইচরণ
২৪ শ্যামাচরণ
২৫ রসিকলাল
২৫ শরৎকুমারী (কন্যা)
২৬ দুর্গেশনন্দিনী (কন্যা)
২৬ চারুচন্দ্র সিংহ
২৭ নরেন্দ্র
নলিনী সরকার
পান্নালাল
নন্দলাল
রবীন্দ্রনাথ
অচ্যুত
২৫ বিধু (কন্যা)
কালীবর
ললিত
বিপিন
২৬ পূর্ণচন্দ্র দত্ত
২৬ সুশীল
২৬ দেবেন্দ্র
২৬ নগেন্দ্র

স্থলের পাকড়াশী জমিদার বংশ

পাবনা জেলার অন্তঃপাতী যমুনা নদীর পশ্চিম উপকূলে "স্থল" একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র সন্তানের আবাস ভূমি এই স্থান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের একটী প্রধান কেন্দ্র। বারেন্দ্র পরিবেষ্টিত এই প্রদেশে রাঢ়ীয় সমাজের উপনিবেশ স্থাপনের ঐতিহাসিক তথ্যের মূলে কেবলমাত্র এক ব্যক্তির পারিবারিক কাহিনী নিহিত আছে। এই ব্যক্তির সন্তান সন্ততি হইতে কালক্রমে এ স্থানে এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে এবং তাঁহারই এক ভাগ্যবান বংশধরের ধারায় সুপ্রসিদ্ধ পাকড়াশী জমিদার বংশের অভ্যুদয় ঘটে। কালক্রমে পাকড়াশী বংশের উত্তর পুরুষগণের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা প্রভাবে স্থল-সমাজ সমগ্র বঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং স্থলগ্রাম বঙ্গের একটী আদর্শ পল্লীরূপে পরিণত হয়

প্রাচীনত্ব হিসাবে পাবনা জেলায় এই জমিদার বংশ অতি উচ্চাসন দাবী করিতে পারে। মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন তন্মধ্যে কাশ্যপগোত্র মহাত্মা দক্ষ অন্যতম। দক্ষের পুত্র বনমালী দেবশর্ম্মা রাঢ় দেশে পর্কটী বা পাকড় গ্রামে বাস স্থাপন হেতু পাকড়াশী গাঁই আখ্যা প্রাপ্ত হন। বনমালী দেবশর্ম্মা স্বীয় গাঁই অনুযায়ী পাকড়াশী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ পণ্ডিতগণ অনেকেই ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন। বিশেষতঃ এই বংশে অনেক পণ্ডিতের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া বনমালী পাকড়াশীর বংশধরগণ পাকড়াশী অপেক্ষা ভট্টাচার্য্য নামেই অধিক পরিচিত হইতে থাকেন। রাজা বল্লাল সেনের সময় ইঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রীয় রূপে গণ্য হইলেন।

কান্যকুব্জাগত মহাত্মা দক্ষ ও পাকড়াশী উপাধির উৎপত্তি।

বনমালী পাকড়াশীর বংশধরগণ দীর্ঘকালব্যাপী বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চল পর্য্যটন করিয়া বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত শোরগুনা গ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কোন্ সময় এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ শোরগুনা গ্রামে আগমন করেন তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শোরগুনা গ্রামে জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও সংস্কৃত চর্চ্চার একটী বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ ছিল। উত্তরকালে এই বংশের এক শাস্ত্রজ্ঞের ধারা হইতে স্থলের পাকড়াশী বংশ এবং এক সাধকের ধারা হইতে কুমিল্লা জেলার মেহারের সর্ব্ববিদ্যা বংশের উদ্ভব হইয়াছে। এই শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষের বংশধর পণ্ডিত গৌরীদাস তর্কালঙ্কার শোরগুনা গ্রামে বাস করিতেন এবং পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিলেন।

শোরগুনা বিদ্যাপীঠ।

গৌরীদাস তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত হরিদেব ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত ভাষায় এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ বৃত্তি বা বার্ষিক অর্জ্জন উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর দেশ পর্য্যটন করিতেন। একদা পণ্ডিত হরিদেব এইরূপ এক পর্য্যটন প্রসঙ্গে তদানীন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। এই সময় (১৭৩০ খৃষ্টাব্দে) নাটোরের মহারাজা রামজীবনের লোকান্তর প্রাপ্তির পর তৎপুত্র রাজা রামকান্ত কর্ম্মচারীর চক্রান্তে বিপদগ্রস্ত হইয়া নবাবের তুষ্টিসাধন জন্য মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের আলয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা অবগত হইয়া রাজা তাঁহাকে নিজ ভবিষ্যৎ ভাগ্যফল সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। গণনাদ্বারা অল্পকালমধ্যেই

রাজা রাজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন এই ফল ব্যক্ত করিলে কিছুদিন মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দৈবক্রিয়া অনুষ্ঠান জন্য মহারাজ পণ্ডিত মহাশয়কে অনুরোধ করেন এবং গণনা সত্য হইলে তাঁহাকে সবিশেষ পুরস্কৃত করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে নবাব দরবারে জগৎ শেঠের কৃতকার্য্যে নিরপরাধ রাজা রামকান্ত পূর্ব্ববৎ স্বীয় অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

পণ্ডিত হরিদেবের সম্পত্তি লাভ ও পাবনা জেলায় আগমন।

মহারাজ মুর্শিদাবাদ হইতে নাটোর পৌঁছিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে স্থল প্রভৃতি দ্বাদশটী মৌজা অতি সামান্য মাত্র বার্ষিক জমা ধার্য্য করিয়া মৌরসী তালুক স্বরূপ প্রদান করিলেন। নাটোর হইতে পদাতিক সহ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত যমুনা নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্বীয় তালুকে পৌঁছিয়া স্থলগ্রামে অবস্থান করেন। তথায় অল্পকাল মধ্যেই তিনি প্রজাদিগের এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন যে তাহারা স্বপ্রবৃত্ত হইয়া স্থল মৌজায় তাঁহার সুবৃহৎ ভদ্রাসন প্রস্তুত করিয়া গোবগুনা হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিবারবর্গকে স্থলগ্রামে আনয়ন করে। এইরূপে বারেন্দ্র পরিবেষ্টিত স্থানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বহুল এক ভাবী সমাজের মূল রোপিত হয়।

হরিদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় নিষ্ঠাবান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রাপ্ত তালুক হইতেই তাঁহার সাংসারিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার নিজ

গার্হস্থ্য জীবন।

বাটীতে ৺রাধাবল্লভ নামে দারুময় যুগলমূর্ত্তি এবং শিব, গণেশ ও নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণ এই বিগ্রহের নিয়মিত সেবা করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়

বার মাসে তের পার্ব্বণে, অন্নপ্রাশনে উপনয়নে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য উপলক্ষে নিয়ত নিজ ভবনে ভোজ দিতেন। আতিথ্যে ও সৌজন্যে তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। এইরূপ শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ভাগ্যবান হরিদেব পাঁচপুত্র রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

পিতৃবিয়োগের কয়েক বৎসর পরেই পঞ্চ ভ্রাতা পৃথকান্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভদ্রাসনে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক গ্রামে নানা শ্রেণীর অধিবাসী স্থাপন করিয়া স্থলগ্রামটীকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই পঞ্চভ্রাতার মধ্যে দ্বিতীয় রাজারামের পৌত্র রামরতন ও কনিষ্ঠ তারাচাঁদের পুত্র শোভারাম সমধিক বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশল ছিলেন। রামরতন ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাটোর রাজধানীতে কার্য্য করিতেন এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থে সম্পত্তি লাভ করিয়া তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত বিষয় ভোগ করিতে থাকেন। হরিদেবের দ্বিতীয় পুত্র রাজারামের এই বংশধরগণ বর্ত্তমান স্থল নওহাটার ভট্টাচার্য্য জমিদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ। উত্তরকালে হরিদেবের এই শাখায় রামরতনের পৌত্র তারক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিজ কার্য্যদক্ষতায় ও প্রবল প্রতাপে জমিদারীর বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

আদিম স্থলগ্রাম।

তারাচাঁদের পুত্র শোভারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের ভ্রাতা কলিকাতা নিবাসী কৃষ্ণমোহন শেঠের আশ্রয়ে কার্য্য করিয়া স্বীয় কর্ম্মনৈপুণ্যে শেঠ পরিবারের দেওয়ান হইয়াছিলেন। এই মহাত্মাই স্থলের পাকড়াশী জমিদার বংশের অভ্যুদয়ের কারণ। দীর্ঘ কার্য্যকাল অন্তে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রভূত পারিতোষিক পাইয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের উদ্যোগে তিনি বিপুল বিষয়

শোভারাম ভট্টাচার্য্য ও স্থলের পাকড়াশী বংশের অভ্যুদয়।

সম্পত্তির মালিক হইয়া পড়েন এবং দেশের মধ্যে একজন স্বনামধন্য জমিদার বলিয়া খ্যাত হন। এই সময় ভট্টাচার্য্য নামে বিষয় সম্পত্তি পরিচালন অসুবিধা বোধে শোভারামের পুত্রদ্বয় পিতার পরামর্শ মূলে স্বীয় গাঁই অনুযায়ী পাকড়াশী উপাধি পুনঃ প্রচলন করেন। তদবধি হরিদেব বংশের শোভারাম শাখা পাকড়াশী নামে পরিচিত হয় এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ ভট্টাচার্য্য নামেই পরিচিত থাকেন। শোভারাম এই সময়ে নিজ ভবনে ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। পাকড়াশী বংশধরগণ এই বিগ্রহের সেবাইত। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে এই বিগ্রহের রীতিমত সেবা করিয়া আসিতেছেন। এই বিগ্রহের ভোগাদি দ্বারা অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা আছে।

শোভারামের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ব্রজসুন্দর কনিষ্ঠ রামকমল অপেক্ষা প্রায় বিংশতি বৎসর অধিকবয়স্ক ছিলেন। এই জন্য পিতার নূতন সম্পত্তি

৺ব্রজসুন্দর পাকড়াশী।

দখল ও শাসন সংরক্ষণের কার্য্যভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত হয়। এই সকল কার্য্যে তিনি নিজ যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময় স্থানান্তরে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা কিছুমাত্র ছিল না। শোভারামের নূতন সম্পত্তি নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে পাবনা জেলার ডিহি সরাতৈল এবং বগুড়া জেলায় ডিহি আনগোলা এই দুইটী প্রধান সম্পত্তি নিজ বসত গ্রাম হইতে বহুদূর ব্যবধান। এই সম্পত্তিদ্বয় দখল করিতে ব্রজসুন্দরকে দুইটী শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল। পাবনা জেলার সলপের সান্যাল বংশ এবং বগুড়া জেলার লক্ষীকোলার কাঞ্জাবংশ ঐ সম্পত্তি দখলে বিশেষ বাধা জন্মাইয়াছিলেন। স্বীয় সাহস ও বুদ্ধি চাতুর্য্যে ব্রজসুন্দর অচিরে প্রতিকূলাচারী পরিবারদ্বয়কে স্ববশে আনয়ন করিয়া পাকড়াশী জমিদারের

অখণ্ড প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন এতদ্দেশে যথেষ্ট নীলের চাষ আবাদ হইত। ব্রজসুন্দর নিজ এলাকা মধ্যে চারিটী নীলকুঠী স্থাপন করিয়া জন্ ব্যাভিস্ নামক একজন শ্বেতাঙ্গকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কুঠীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

নয় আনা ও সাত আনী তরফের উৎপত্তি।

শোভারাম জীবিত থাকিতেই ব্রজসুন্দর ও রামকমল পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। বিষয় সম্পত্তি সমস্তই জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজসুন্দরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এইজন্য শোভারাম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দুই আনা অধিক সম্পত্তি প্রদান করেন। এবং কনিষ্ঠ রামকমল নিরাপত্তিতে অবশিষ্ট ।৵০ আনা অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই পাকড়াশী জমিদার বংশের প্রধান দুইটী তরফ নয় আনা ও সাত আনী নামে পরিচিত।

সম্পত্তি প্রদান।

অতঃপর ব্রজসুন্দর ও রামকমল উভয় ভ্রাতাই নিজ নিজ নামে সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া পারিবারিক অবস্থার সমধিক উন্নতিসাধন করেন। ব্রজসুন্দর ও রামকমল পিতার অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁহাদের পিতৃব্য শোভারামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সর্ব্বেশ্বর ও কনিষ্ঠভ্রাতা শোভারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়কে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের তালুকসম্পত্তি দান করেন। শোভারামের এই ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধরগণ বর্ত্তমান স্থল গ্রামের তালুকদারদিগের বড় ছয় আনী ও ছোট ছয় আনী তরফের মালিক।

পিতৃ বিয়োগ হইলে উভয় ভ্রাতা মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা প্রচীন রীতি অনুসারে বিলক্ষণা বিলক্ষণী

(সালঙ্কার দম্পতি) প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রজসুন্দর ও রামকমল উভয় ভ্রাতা পৃথক হইলেও পরস্পর বিশেষ সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন।

ব্রজসুন্দরের পত্নী ৺দয়াময়ীদেবী প্রকৃতই দয়াময়ী ছিলেন। সলপের সান্যালদিগের বিরুদ্ধে ব্রজসুন্দর ও রামকমল প্রায় দুইলক্ষ টাকার দাবীতে ডিক্রী পাইয়াছিলেন। এই গুরুতর দায় হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত উক্ত সান্যাল বংশের তৎকালীন নায়ক ৺গোপীনাথ সান্যাল মহাশয় স্থল গ্রামে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মশীলা দয়ার প্রস্রবণ-স্বরূপিণী দয়াময়ীদেবীর শরণাপন্ন হন। দয়ার্দ্রহৃদয়া দয়াময়ীদেবীর অনুরোধে ব্রজসুন্দর ও রামকমল সান্যাল-দিগের পূর্ব্ব প্রতিকূলাচরণ বিস্মৃতিগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া অম্লানবদনে লক্ষাধিক টাকার দাবী পরিত্যাগ করেন এবং কুলোচিত উদারতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেন।

ব্রজসুন্দরের পত্নী দয়াময়ীদেবী।

ব্রজসুন্দরের অভাবের পর রামকমলের শেষ জীবনে অনুমান ১২৪০।৪২ সনে ব্রহ্মপুত্র নদীর গতি-পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহার ফলে প্রাচীন যমুনা নদী প্রবল মূর্ত্তিতে পাবনা জেলার অনেক সমৃদ্ধিশালী জনপদ ধ্বংস করিয়া পদ্মা নদীর সহিত মিলিত হইয়া পড়ে। যমুনা নদী পশ্চিম উপকূলে যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লীতে হরিদেবের বংশধরগণ অধিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও এই সময় যমুনা গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। অতঃপর পাকড়াশী বংশধরগণ আরও পশ্চিমে ৪ মাইল অভ্যন্তরে বর্ত্তমান স্থলগ্রামে আগমন করেন। এইসময় হরিদেব-বংশের অন্যান্য সন্তানগণও এই স্থলগ্রামে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামান্তরে বসতি স্থাপন করিয়া সমাজবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মূল বাসস্থানের

আদিম স্থল গ্রামের বিলোপ ও বর্ত্তমান স্থল গ্রামের উদ্ভব।

স্মৃতি ও পরিচয়রক্ষার্থে তাঁহারা এই নূতন বাসস্থানটীও স্থলনামে পরিচিত করেন। যাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন উক্ত পল্লীর নামে 'স্থল' শব্দ সংযোগ করিয়া তাঁহারা ঐ গ্রামের স্থলনওকাটা নামকরণ করিলেন।

নয় আনী তরফ।

শোভারামের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজসুন্দর হইতেই পাকড়াশী বংশের নয় আনী শাখার উৎপত্তি। ব্রজসুন্দরের দুইপুত্র, জ্যেষ্ঠ ঈশানচন্দ্র অত্যধিক বলবান ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শারীরিক শক্তির কৌতুকপূর্ণ কাহিনী অনেক শুনা যায়। তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং প্রতি বৎসর তর্পণের সময় নিজ জমিদারী বগুড়া জেলার করতোয়া নদীতটে দৈনিক পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতেন। ১২৬১ সনে মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

৺ঈশান চন্দ্র পাকড়াশী।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরচন্দ্র বৈষয়িক কাজকর্ম্মে অদ্ভুত নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়া পাবনা জেলায় বিশেষ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইসময় নীলকরগণের অত্যাচার আরম্ভ হওয়ায় তিনি নিজেদের নীলকুঠীগুলি বন্ধ করিয়া উৎপীড়ণকারী নীলকরদিগের বিরুদ্ধে নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

৺হরচন্দ্র পাকড়াশী।

শিক্ষা বিষয়ে হরচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি পারসী ভাষায় এরূপ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে মুসলমানগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট শাস্ত্র ও সামাজিক বিষয় মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইত। তিনি এই সময় সরিক ভ্রাতৃগণের সহায়তায় স্থলগ্রামে একটী মোক্তাব স্থাপন

করিয়াছিলেন। তখন গ্রামে পণ্ডিতগণের দুইটী টোলও ছিল। হরচন্দ্র পণ্ডিতবর্গের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ শেষ জীবনে তিনি জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার সহযোগিতায় ।/০ আনী তরফের ভদ্রাসনে নিজ জননী দয়াময়ী দেবীর নামে প্রস্তর ময়ী কালীমূর্ত্তি স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সহ বৃহৎ অট্টালিকা-মন্দির নির্ম্মিত হইলে তিনি দাঁইহাট হইতে মহামায়ার মূর্ত্তি আনয়নের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কালীমূর্ত্তি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি সহসা রোগাক্রান্ত হইয়া ১২৬৩ সালে গঙ্গাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন। পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে হরচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র ও নাবালক পুত্র কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ।/০ আনী তরফের বংশধরগণ ৺দয়াময়ী কালীমাতার ভোগ-রাগাদি নিত্যসেবা চালাইয়া আসিতেছেন।

৺দয়ামরী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

ঈশান চন্দ্র ও হরচন্দ্র উভয় ভ্রাতা স্থল গ্রামের জনবল বৃদ্ধি ও সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সদ্বংশীয় কুলীন ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সন্তানদিগকে বাসস্থান ও ভূসম্পত্তি সহ নিজগ্রামে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দুই ভগ্নি, গোলকমণি দেবী ও জগদম্বা দেবী। প্রথমা ভগ্নীর ফুলিয়া মেলের বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান ৺গৌরী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত এবং দ্বিতীয়া ভগ্নির ফুলিয়া মেলের রামশরণের সন্তান ৺ শ্রীনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। তদবধি এই সদ্বংশীয় কুলীন পরিবারদ্বয় স্থল গ্রামেই বসবাস করিতেছেন। গৌরী প্রসাদ ও শ্রীনাথ উভয়েই তাপস শ্রেণীর লোক ছিলেন। ঈশান চন্দ্র ও হরচন্দ্র নিজ মাতুলদিগকেও স্থলগ্রামে অধিষ্ঠিত করেন।

কুলক্রিয়া ও আত্মীয় পালন।

ঈশান চন্দ্র ও হরচন্দ্র পৃথকান্ন হওয়ার সময় ।/০ আনী সম্পত্তির ষোল আনা অংশের এক আনা জ্যেষ্ঠোত্তর সহ ঈশানচন্দ্র ৷৷১০ আনা ও কনিষ্ঠ হরচন্দ্র ।৶১০ আনা অংশ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে নয়আনী তরফ হইতে ৷৷১০ আনি ও ।৶১০ আনী দুইটী পৃথক বাড়ী সৃষ্টি হইল।

নয় আনী তরফের দুইটী প্রশাখা

তরফ সাড়ে আট আনী

ঈশান চন্দ্র হইতেই ৷৷১০ আনী তরফের উৎপত্তি। তাঁহার তিনপুত্র কেদার নাথ, দুর্গানাথ ও রাজকুমার। কেদার নাথের অসীম শারীরিক শক্তি ও সাহস ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীসমূহে অধিকাংশই হিংস্রজন্তু বহুল, বাসের অনুপযোগী ছিল। কেদার নাথ শিকারপ্রিয় ছিলেন এবং তিনি ঐরূপ অনেক গ্রামে শিকার করিতে যাইতেন। তিনি নিজ জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও হিংস্রজন্তুর সহিত লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি অতি সৌখিন লোক ছিলেন; নৌকা বাইচ, লাঠিখেলা, মৃতের সৎকার প্রভৃতি সখ ও সৎসাহসের কাজে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী স্বামীর সমাধি স্থানে "শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর" নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া দেবোত্তর সম্পত্তিদ্বারা সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

কেদার নাথ পাকড়াশী।

এই তিন ভ্রাতার মধ্যে মধ্যম দুর্গানাথ সর্ব্বোপেক্ষা কৃতী ছিলেন। ১২৫২ সনে ভাদ্রমাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জ্ঞান পিপাসার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বোয়ালীয়া (রাজসাহী) হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া

৺দুর্গানাথ পাকড়াশী।

স্বর্গীয় দুর্গানাথ পাকড়াশী

পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণানুরোধে দুর্গানাথ নিজগ্রামেই থাকিতে বাধ্য হন। স্বীয় কর্ম্মনৈপুণ্য ও যথাযথপ্রভাবে তিনি বিষয় সম্পত্তি ও পারিবারিক অবস্থার সম্যক উন্নতি সাধন করিয়া সমাজ সেবায় মনোনিবেশ করেন।

স্থল সমাজের গৌরব ও যশঃ প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত এই মহাত্মা ১২৮৩ সনে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশের ঘটক কুলীন বৃন্দ নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই সময় হইতেই স্থলের পাকড়াশী বংশের সামাজিক সৌজন্য ও আতিথ্যের যশঃ সৌরভ দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নিজ জননীর অভাবের পর ১২৯৮ সনে বার্ষিক শ্রাদ্ধ তিথিতে দুর্গানাথ অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগিতায় ১৬টী রৌপ্য ষোড়শ ও স্বর্ণাসন প্রভৃতি দ্বারা বিরাট দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ক্রিয়াকালাপ।

এই উপলক্ষে গয়া, কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ ভট্টপল্লী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথোপযুক্ত বিদায় দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল। অন্যান্য দানের মধ্যে এই সময় একটী হস্তীও দান করা হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট মৌলিকতা ও উচ্চান্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরিক ভ্রাতৃবর্গের সহযোগিতায় গ্রামে স্থলপাকড়াশী ইনষ্টিটিউশন নামে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্রস্থাপন করেন। এই

স্বদেশ হিতৈষিতা।

পরীক্ষার্থীদিগের বাসস্থান ও আহারের সমস্ত ব্যবস্থা ॥/০ আনার তুই তরফ হইতে পর্য্যায়ক্রমে বহন করিবার প্রথা তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ বয়সে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্থলগ্রামে (Young Men's Association) নামে একটী সমিতি গঠিত

হইয়াছিল। যুবকদিগের সদুদ্দেশ্যে উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য তিনি এই সমিতির একটী বৃহৎ সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই মহানুভবতার অনুপ্রেরণায় জনহিতকর সৎসাহসিক কার্য্যের উৎসাহ প্রদান জন্য এই সমিতি হইতে নিয়মিতভাবে সুবর্ণ পদক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে ঐ পদক প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার অনুপ্রেরণায় ও অর্থ সাহায্যে "হরিদেব" নামক স্থলের পাকড়াশী পরিবার ও তৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় কুলীন সন্তানদিগের একখানি বংশ পরিচয় পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে।

তীর্থপর্য্যটন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার অতীব আনন্দ ছিল। তিনি শ্রাবণ বৃষোৎসর্গ, দশমহাবিদ্যাপূজা, নবরাত্রি প্রভৃতি কঠোর ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তিনি নিরতিশয় বিবেকবুদ্ধি পরিচালিত ব্যক্তি ছিলেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে কতকগুলি জনশ্রুত সংস্কার প্রবেশ করিয়া বদ্ধমূল হইয়াছিল। অথচ ঐ সমস্ত সংস্কারের কোন ধর্ম্মমূলক ভিত্তি নাই। এইরূপ কোন প্রশ্ন বা সমস্যা উপস্থিত হইলে তিনি অবিচলিত চিত্তে শাস্ত্রালোচনা এবং প্রয়োজন বোধে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিচার ও মীমাংসাদ্বারা ন্যায্য মত গ্রহণ করিতেন। পূর্ব্বকালে যখন অন্ধবিশ্বাসের ন্যায় সংস্কারগুলি ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল সেই সময়ে দুর্গানাথের ঈদৃশ বিবেকবুদ্ধি-প্রণোদিত সৎসাহসের পরিচয় বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মানুষ্ঠান।

অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগিতায় তিনি নিজেদের ছয় ভগ্নিকে বসত বাটী এবং তালুক সম্পত্তিসহ স্বগ্রামে স্থাপন করিয়া গ্রামের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

আত্মীয় পালন ও পল্লীশ্রী বর্দ্ধন।

তিনি কিছুদিন মুর্শিদাবাদে ধনপৎ ও লছমীপৎ সিংহদিগের ম্যানেজার ছিলেন এবং পরে তাহিরপুর রাজ এষ্টেটে ও নাটোরের ছোট তরফের দেওয়ান ছিলেন। তৎপর স্বেচ্ছায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীন-চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদীতার ভয়ে সকলেই সশঙ্কিত চিত্তে তাঁহার সম্মুখীন হইত। তিনি যেমন গুণী ছিলেন তেমনি গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার স্বার্থ-বিরুদ্ধেও কেহ ন্যায্য ব্যবহার করিলে তিনি সে ব্যক্তির সমাদর করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার কমনীয় কান্তি ও বিশাল দেহ দর্শনে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হইত। শেষ জীবনে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন। তথায় ১৩২৩ সনের শ্রাবণ মাসে তিনি গঙ্গা লাভ করেন।

তেজস্বীতা।

তদীয় কনিষ্ঠ রাজকুমার অতীব সুপুরুষ ছিলেন। তিনি কলিকাতায় বাসেরজন্য প্রাঙ্গন সহ একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

৺রাজকুমার পাকড়াশী।

কেদার নাথের মধ্যম পুত্র দেবেন্দ্র নাথ বিশেষ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজগৃহে পিতার স্মৃতিতে "কেদারনাথ লাইব্রেরী" নামে একটী সুন্দর গ্রন্থশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং "পদ্য গাঁথা" নামে একটী কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অকালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

দুর্গানাথের পুত্রগণ শিক্ষিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ধীর, সত্যনিষ্ঠ এবং শান্তিপ্রিয়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া এই বংশে ইনিই সর্ব্বপ্রথম গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রবেশ করেন

এবং এক্ষণে পূর্ত্তবিভাগে উচ্চপদে কার্য্য করিতেছেন। সমাজের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যে বিশেষতঃ যুবকবৃন্দের নৈতিক উন্নতি কল্পে ইনি প্রচেষ্টাবান। ইঁহার ন্যায়নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই বংশের অনেক বৈষয়িক বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়াছে। মধ্যম শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার "জমিদারী" নামক একখানি সমাজিক নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ স্থল-আদি-নাট্য রঙ্গমঞ্চে সুচারুরূপে অভিনীত হইয়াছে। তৎকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সুকণ্ঠগায়ক এবং গীতবাদ্যানুরাগী

রাজকুমারের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিজা কুমার গীতবাদ্যে পারদর্শী। মধ্যম শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নাট্যকলাকুশল। তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুকুমার নিজ ব্যবসায়ে কলিকাতায় একটী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার খানা পরিচালন করিতেছেন এবং চিকিৎসায় সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সাড়ে আটআনী তরফে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের অপরাপর ভ্রাতৃবৃন্দও গীতবাদ্যে এবং নাট্যকলায় পারদর্শী।

তরফ সাড়েসাত আনী

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে হরচন্দ্র হইতেই ।৶১০ আনী তরফের উৎপত্তি। হরচন্দ্রের পুত্র সারদা প্রসাদ এই বংশের অন্যতম কীর্ত্তিমান মহাপুরুষ। তাঁহার মাতা হরচন্দ্রজায়া ৺গঙ্গামণি

হরচন্দ্র জায়া গঙ্গামণিদেবী।

দেবী বিক্রমপুরের বিখ্যাত শ্রোত্রীয় চাঁদসীর কুশারী বংশের কন্যা। ইনি শান্তিশয় বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মকুশলা রমণী ছিলেন। স্বামীর অভাব হইলে নাবালক পুত্রের বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণ কার্য্যে তিনি নিজ প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন।

১২৫২ সনে ২৬ শে পৌষ শনিবার সরদাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।

স্বর্গীয় সারদা প্রসাদ পাকড়াশী।

মাত্র একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার বিস্তৃত বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন এইজন্য তিনি বৈষয়িক কার্য্য নিবন্ধন উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু সদাচারিণী কর্ম্মনিপুণা জননীর শাসনাধীনে থাকিয়া তিনি এই সময় হইতে যে সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ও বৈষয়িক কর্ম্মনৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাই তদীয় উত্তরজীবনে প্রতিষ্ঠালাভের মূলীভূত কারণ হইয়াছিল।

৺সারদাপ্রসাদ পাকড়াশী।

তাঁহার বাল্যকাল ও যৌবনের প্রারম্ভ নানারূপ শত্রুদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতৃহীন বালক সারদাপ্রসাদ এই সকল গুরু বিপদের মধ্যে পতিত হইয়াও স্বীয় সাহস ও বুদ্ধি কৌশলে নিজ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উপর প্রচুর ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রজানুরঞ্জনে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বৈষয়িক কৃতকার্য্যতা।

কর্ম্মপ্রবণতা, সময়ানুবর্ত্তিতা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুসরণ তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। নিজ পৈতৃক ভদ্রাসনের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তিনি যে মনোরম উদ্যান ও তোরণদ্বার সহ প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন তাহা অনেক সহরেও দেখা যায় না। তিনি প্রকৃত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং আজীবন দেবসেবা, নিত্যপূজা, স্তোত্রপাঠ ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। বাড়ীর উপরেই ৺দয়াময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই কালীমাতার

গার্হস্থ্য জীবন।

সেবার যাহাতে ত্রুটী না ঘটে তৎপ্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিত। পশু-সেবা তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের একটী বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার আলয়ে তিনটী হস্তী এবং অনেকগুলি গো অশ্ব ও গৃহপালিত পক্ষী ছিল। তিনি কর্ত্তব্যকার্য্যবোধে প্রত্যহ দুইবেলা এই সকল প্রাণীর তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং তাঁহার জলদগম্ভীর স্বর শ্রবণ মাত্রেই মনে ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইত।

দয়াদাক্ষিণ্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার বদান্যতার এবং অকৃত্রিম মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আশৈশব কেবলমাত্র মাতৃস্নেহে পরিপুষ্ট সারদাপ্রসাদ মাতৃকৃত্য উপলক্ষে শাস্ত্রানুমোদিত শ্রেষ্ঠ আয়োজন করিবার বাসনা পূর্ব্ব হইতেই পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী গঙ্গালাভ করিলে ১৩০২ সনে বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি স্বর্ণসুখাসন সম্বলিত দানসাগর-কৃত্য অনুষ্ঠান করেন। তদুপলক্ষে মিথিলা, কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও বঙ্গের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া স্বল গ্রামে সমবেত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যে সুবর্ণ তৈজসাদি সহ নারায়ণ দান, অষ্টাদশ ষোড়শ, হস্তী, যানসহঅশ্ব, পাল্কী নৌকা প্রভৃতি বিস্তর দান ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন ও দরিদ্র বিদায় হইয়াছিল। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত পণ্ডিতকে যথোচিত দক্ষিণাসহ গরদের জোড় প্রদান করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সমাগত পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, বিশ্বনাথ ঝাঁ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগন্তুক ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান ও আহারাদির এরূপ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল যে এইরূপ

মাতৃভক্তি ও সুবর্ণ দানসাগর অনুষ্ঠান।
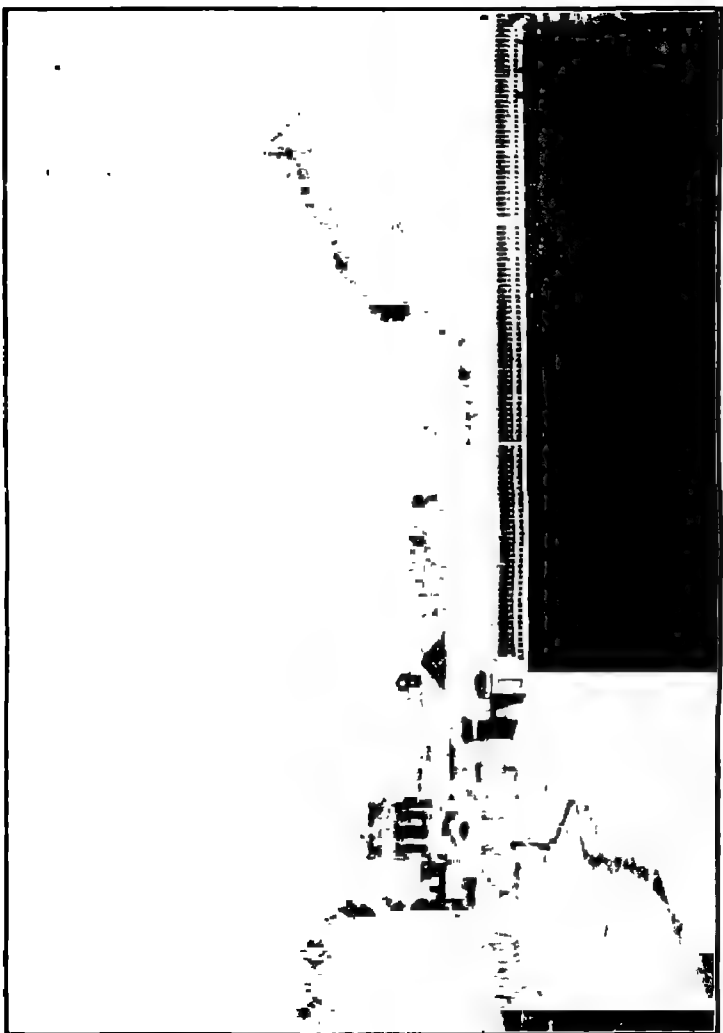
বিরাট ব্যাপার এত সুশৃঙ্খলার সহিত বঙ্গের আর কোথাও সম্পন্ন হইয়াছে কিনা শুনা যায় না।

সারদা প্রসাদের বদান্যতার আরও অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থল গ্রামে প্রাচীনকাল হইতে গৌর নিতাই বিগ্রহ দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী সারদাপ্রসাদ নিজব্যয়ে এই বিগ্রহের নিমিত্ত একটী বৃহৎ মনোরম অট্টালিকা-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। নিজ গ্রামের উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি পিতার স্মৃতিতে "হরচন্দ্রহল" নামে একটী পাকা ভিত্তির বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। প্রজা সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য পাবনা জেলার মধ্যে অনেক জলাশয় খনন করাইয়াছেন।

দানশীলতা।

পরোপকার তাঁহার জীবনের একটী ব্রত ছিল। অর্থসাহায্য ব্যতীতও নিজ মধ্যস্থতায় কাহারও কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তিনি সর্ব্বদাই অকাতরে সেরূপ সাহায্য করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী শিবনাথপুরের পরলোকগত জমিদার কুমুদনাথ পাঠক মহাশয় প্রথম জীবনে ঋণদায়ে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। পাঠক মহাশয় মহাজনের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় উদারচরিত সারদাপ্রসাদের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকিলেও পাঠকমহাশয়ের অনুরোধে তিনি মহাজন সমীপে উপস্থিত হইয়া ১৮।১৯ হাজার টাকা রেহাই করাইয়া পাঠক মহাশয়কে স্বীয় জমিদারীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এরূপ আরও অনেক ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল। নিজ জন্মভূমিতে উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, নাট্যসমিতি

পরোপকারিতা।

প্রভৃতি শিক্ষা বিস্তারের প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপনে তিনি সানন্দে সহযোগিতা করিয়াছেন। তিনি বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বহু অর্থ ব্যয়ে নিজ পুত্রপৌত্রদিগকে এবং জামাতাদিগকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন। দেশস্থ সকল উন্নতিকর অনুষ্ঠানে তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি সর্বদাই দৃষ্ট হইত।

তাঁহার সদনুষ্ঠান ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের গৌরবময় সুষমা সমগ্র বঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পাঁচপুত্র ও পাঁচকন্যা। তিনি এই পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া পুত্রদিগকে প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয় বংশে ও কন্যাদিগকে শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশে বিবাহ দিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় ও কন্যাদ্বয়ের বিবাহে ১২৯২ সনে তিনি রাঢ়ীয় সমাজের সমস্ত ঘটককুলীন নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শেষ জীবন পর্য্যন্তও তিনি পৌত্রীগণের বিবাহে বহুশিক্ষিত এবং উচ্চবংশ সম্ভূত কুলীন সন্তানদিগের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভগ্নির পুত্রকন্যাদিগকে এবং নিজ জ্যেষ্ঠাকন্যাকে ভূসম্পত্তি ও বসতবাটী সহ স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং প্রত্যেক কন্যাকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার মাতুলকেও ভূসম্পত্তি দিয়া স্বগ্রামে স্থাপন করিয়াছেন।

কুলক্রিয়া ও কুলীন প্রতিপালন।

উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সুবিশাল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণানুরোধে সর্বদা প্রজাদের বাধ্য হইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষাত্রধর্মাচারী হইতে হইবে জানিতে পারিয়াই যেন প্রকৃতি মাতা তাঁহার দেহ তদনুযায়ী ক্ষত্রোচিত করিয়া গঠন করিয়াছিলেন তিনি প্রকৃতই "ব্যূঢ়োরস্কঃ বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজ" ছিলেন। ১৩৩১ সনের ৯ই ভাদ্র তিনি চুঁচুড়া নগরীতে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাকড়াশী

হরচন্দ্রদুহিতা সারদাপ্রসাদের ভগ্নি শ্রীযুক্তা ভবতারিণী পরম ধর্ম্ম-পরায়ণা নারী। আবাল্য বিধবা এই মহিলা দানধ্যান তপশ্চর্য্যাদি হিন্দু শাস্ত্র বিহিত প্রায় সমস্ত ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া বিধবার আদর্শ জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি দুঃসাধ্য সর্ব্বজয়াব্রত পালন করিয়া তদুপলক্ষে বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রণপূর্ব্বক দানসাগর সহ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। তিনি পাবনা জেলায় চাপরী গ্রামে ১টী জলাশয় উৎসর্গ ও স্থলগ্রামে শিবস্থাপনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা ভবতারিণীদেবী।

সারদাপ্রসাদের পত্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী দেবী বিক্রমপুরের বিখ্যাত বটেশ্বরের ভিন্নসাহী শ্রোত্রীয় বংশের ইছাপুরা নিবাসী ৺ গোবিন্দচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এই মহিলা প্রকৃতই সাক্ষাৎ ভগবতী স্বরূপা। তাঁহার লজ্জাশীলতা এবং আতিথ্যসৌজন্য এতদ্দেশে প্রবাদবাক্যের ন্যায় রাষ্ট্র। বিনয়ের আদর্শপ্রতিমা ইনি বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী হইয়া এই অধিক বয়সেও কুলবধূ সদৃশ জীবন যাপন করেন।

সারদাপ্রসাদের পত্নী স্বর্ণময়ী।

সারদাপ্রসাদের পুত্রগণ সকলেই শিক্ষিত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমধিক কৃতী। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ইনি পিতার বিস্তৃত সম্পত্তির শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় পিতার সুযোগ্য পুত্র-রূপে দেশে খ্যাতি লাভ করেন। ইনি কিছুদিন সাহাজাদপুরে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর পাবনাজেলাবোর্ডে

শ্রীসুরেশচন্দ্র পাকড়াশী।

সদস্য থাকিয়া দেশের রাস্তাঘাটসংস্কার প্রভৃতি বিবিধ হিতসাধনে যত্নশীল ছিলেন।

তিনি জেলবোর্ডের সদস্য থাকার সময়ে তাঁহার উদ্যোগে স্বলগ্রামে একটী বৃহৎ ইষ্টকমণ্ডিত সেতু নির্ম্মিত হয় এবং স্বলগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্বল চরষ্টীমার ঘাট উঠিয়া যাওয়ায় সর্ব্বসাধারণের স্থানান্তরে যাতায়াতের গুরুতর অসুবিধা হইতেছিল। তিনি কোম্পানির সহিত লেখালেখি করিয়া স্বলষ্টীমার ঘাটটী পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট স্বরূপে তাঁহার চেষ্টা তদ্বিরের ফলে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামের পোষ্ট অফিসটী সবঅফিসে পরিণত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পাকড়াশ ইনষ্টিটিউশনটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে তাঁহার যত্ন ও উদ্যম বিশেষ ফলবতী হইয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "স্বল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক" নামক একটী যৌথধনভাণ্ডার গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই ব্যাঙ্ক উত্তম কার্য্য করিতেছে। দেশস্থ জমিদার ও তালুকদারদিগের উন্নতিকল্পে তিনি ঢাকা নগরীতে "বেঙ্গল জমিদারী ও ব্যাঙ্কিং কোম্পানী লিমিটেড" নামে একটী অভিনব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন।

জন্মভূমির উন্নতিসাধন

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও চাঁদপুর এই চারিটি শাখার ধনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মনৈপুণ্যে তিনি যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা স্বদেশবাসী বহু লোকের জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ সুবিধা ঘটিয়াছে। ভাওয়ালের পরলোকগত রাজা কালী নারায়ণ রায়ের ভগ্নি স্বনামধন্যা স্বর্ণময়ী দেবীর দৌহিত্র ফুলিয়া মেলের কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বহুমুখী কর্ম্মনৈপুণ্য

সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। জমিদারী কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া স্বর্ণময়ীদেবী মৃত্যুকালে তাঁহার বিস্তৃত ভূসম্পত্তির একজিকিউটারের ভার সুরেশচন্দ্রের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও এই এষ্টেটের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে যশোহর লক্ষীপাশা নিবাসী কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বন্দোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ বি, এল্ মহাশয়ের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। তিনি ঢাকা এসোসিয়েটেড্ প্রিন্টিং ও পাবলিসিং কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর এবং কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সোসাইটীর ও পূর্ব্ববঙ্গ জমিদার সভার একজন প্রবীণ সদস্য। বিগত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার জন্য যে স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল তৎসন্নিকটে উক্ত জমিদার সভার পক্ষ হইতে অভিমত জ্ঞাপন করিবার জন্য দুইজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র এই দুইজনের অন্যতর ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সমগ্র বাঙ্গালার জমিদারবর্গের প্রথম সম্মিলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির একজন সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গন্ধী বঙ্গের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন উপলক্ষে সিরাজগঞ্জে আগমন করিলে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে মহাত্মাকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন।

সুরেশচন্দ্র নিরতিশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও কর্ম্মনৈপুণ্যে তিনি উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠাবান। তিনি অতীব

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠপুরুষ। তদুপরি তাঁহার গৌরকান্তি প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক। কার্য্যনিবন্ধন তিনি অধিকাংশ সময় ঢাকা নগরীতে অবস্থান করেন।

সারদাপ্রসাদের অন্য চারি পুত্রও প্রত্যেকেই এক এক বিষয়ে কৃতী। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারিং, দারুশিল্পে এবং কারকারবারে প্রতিভাসম্পন্ন। গীতবাদ্যানুশীলনেও তিনি পারদর্শী। তৃতীয় শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র সাহিত্যসেবী এবং সুবক্তা। পল্লীর হিতানুষ্ঠানে উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া তিনি যে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন তাহারই ফলে স্থলগ্রামে নব নব প্রতিষ্ঠান ও শৃঙ্খলামূলক কর্ম্মপদ্ধতির অবতারণা হইয়াছে। তাঁহার অনুপ্রেরণায় স্থল শোভারাম চতুষ্পাঠী স্থাপিত। সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ড ও পাবনা জেলাবোর্ডের সদস্য-স্বরূপে তিনি দেশের অনেক হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার তিনি একজন প্রধান সদস্য। নিজ আলয়ে গ্রন্থশালা স্থাপন করিয়া তিনি নিয়ত জ্ঞানানুশীলনে যত্নবান আছেন। চতুর্থ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেশচন্দ্র গীতবাদ্যে নিপুণ। সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চিত্রশিল্পে (Art) আলোকচিত্র বিদ্যায়(Photography) এবং কলকব্জার কাজে পারদর্শী। উদ্যানশিল্পেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কৃতবিদ্য হইয়া তিনি নিজ আলয়ে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। পিতার আদর্শে তাঁহারা সকলেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সদাচারপরায়ণ।

অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়।

সুরেশচন্দ্রের দুইপুত্র। উচ্চশিক্ষায়, সৌজন্যে এবং স্বদেশ সেবায় তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই সুপরিচিত। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র ১৯১৫ খৃঃ

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইতিহাসে সম্মানে (Honours) প্রথমস্থান অধিকার করিয়া জুবিলী স্কলারশিপ পাইয়াছিলেন। এম্, এ,বি, এল পাশ করিয়া তিনি জন্মভূমির উন্নতিকর বিবিধকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার উদ্যমে গ্রামে স্থল-সমাজ-পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হয়। স্থল উইভিং কোম্পানী তাঁহার উদ্যোগে গঠিত। ১৯২৪খৃঃ তিনি সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি পাবনা জেলার অন্যতম জননায়করূপে গণ্য হইয়াছেন।

সুরেশচন্দ্রের পুত্রদ্বয়।

তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া এম্, এ, বি, এল্ হইয়াছেন। স্থলগ্রামের শোভারাম চতুষ্পাঠী, বাণীমন্দির, শারদীয় সম্মিলন প্রভৃতি তাঁহারই ঐকান্তিক যত্নের পরিণতি ফল। তিনি বিশেষ গীতবাদ্যানুরাগী। নিজবংশের গ্রামের বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে তিনি সাগ্রহে কার্য্য করিতেছেন।

পাকড়াশী বংশের নয়আনী শাখার বংশতরু

মহারাজ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম মহাত্মা দক্ষ হইতে ২৫ পর্য্যায় ভুক্ত শোভারাম। শোভারামের উর্দ্ধতনপুরুষগণের বংশক্রম পরিশেষে সন্নিবিষ্ট হইল।

এপর্য্যন্ত পাকড়াশী বংশের একটী প্রধান শাখার কাহিনী বলা হইল।

অতঃপর অপর একটী প্রধান শাখা সাত আনী তরফের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম।

সাত আনী তরফ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শোভারামের কনিষ্ঠ পুত্র রামকমল হইতেই সাত আনী তরফের সৃষ্টি। তাঁহার তিন পুত্র ও একমাত্র কন্যা ছিল। এই তিন পুত্র তারিণীচরণ, কৃষ্ণলাল ও রামলাল হইতে যথাক্রমে সাত আনী তরফের বড়, মধ্যম ও ছোট তরফের সৃষ্টি হইয়াছে।

সাত আনী তরফের তিনটী প্রশাখা।

ফুলিয়া মেলের রামশরণের সন্তান নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রামকমলসূতা গোবিন্দমণী দেবীর বিবাহ হয়। রামকমলের পুত্রগণ অট্টালিকাসমন্বিত বসতবাটী ও ভূসম্পত্তি দ্বারা এই ভগ্নিকে স্থলগ্রামে অধিষ্ঠিত করেন। তদবধি এই সদ্বংশীয় কুলীন পরিবার স্থলগ্রামেই বসবাস করিতেছেন।

কুলক্রিয়া ও আত্মীয় পালন।

বড় তরফ

রামকমলের জ্যেষ্ঠপুত্র তারিণীচরণ পাকড়াশী মহাশয় অতি সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া গৃহী কিরূপে কর্ত্তব্য-পালন করিয়া উন্নতি ও যশ লাভ করিতে পারে তাহা এই মহাপুরুষের জীবনে পরিদৃষ্ট হইত। ইনি পার্সীভাষায় বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় ও দয়া সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তিনি নবাবী চালচলনে থাকিতেন এবং বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধনে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

৺তারিণীচরণ পাকড়াশী।

তারিণী চরণের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্তলাল ১৮৭১ খৃঃ বোয়ালিয়া (রাজসাহী) হইতে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অত্যল্পকাল পরেই পাশ্চাত্য বিদ্যায় এরূপ অধিকার লাভ এই বংশের বিদ্যানুরাগের ও সময়োপযোগী জ্ঞানানুশীলনের আরও একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শ্রীমন্তলাল কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পরেই অকালে পরলোকগমন করেন।

শ্রীমন্তলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের মধ্যে ৺প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় সমধিক কৃতী ছিলেন। ১২৫২ সনে অগ্রহায়ণ মাসে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া নিজভবনে একটী গ্রন্থশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় বিবিধ সংবাদপত্র রাখিতেন এবং দেশবিদেশের খবরাখবর অবগত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতা অভ্যাস করিতেন এবং তাহার ফলে সে সময় তিনি মহাপণ্ডিত ও সুবক্তা বলিয়া দেশময় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

৺প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী।

অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় বিষয় সম্পত্তির শাসনভার তাঁহার উপর পড়ে। তথাপি তিনি জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে নিজ গ্রন্থশালাটী পরিপুষ্ট করেন। দেশের কাজ করা এবং জনসমাজে বরেণ্য হইতে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালীন ইতিবৃত্ত ও গভর্ণমেণ্টের আইন কানুন সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা জানিয়া তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যদেশ সমূহের ইতিহাস ও

জ্ঞানানুশীলন।

গভর্ণমেণ্টের আইন অতি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য বিদ্যার গুণগরিমা সমসাময়িক রাজকর্মচারী মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের বিষয় অবগত হইয়া অনেক শ্বেতাঙ্গ রাজ-কর্মচারী তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিতে ব্যগ্র হইতেন এবং জেলার শাসন কার্য্যেও তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন।

তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য যে তৎকালে সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিল তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৭ খৃঃ নাটোরে ছোট লাট সাহেবের এক দরবারে রাজসাহী বিভাগের সমুদয় নৃপতি ও ভূস্বামীগণ যোগদান করেন। এই সময় বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তাকে যে ইংরাজী অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা পাঠ করিবার সুযোগ্য ব্যক্তি একমাত্র প্রাণচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাকেই এই সম্মানের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল।

১৮৭৬ খৃঃ বঙ্গদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালীর সূচনা স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট অনেক জেলায় রোড্ সেস্ কমিটী প্রবর্ত্তন করেন। এই সময় রাজনীতিবিদ প্রাণচন্দ্র পাবনাজেলার রোডসেস্কমিটীরএকজন সদস্য মনোনীত হন এবং স্বীয় কার্য্যদক্ষতায় স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে একজন সুবিজ্ঞ উদযোক্তা হইয়া পড়েন। ১৮৮৫ খৃঃ বঙ্গদেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য পদে নিযুক্ত হন এবং আমরণ কাল প্রায় বিংশতি বর্ষ একজন সুযোগ্য সদস্যরূপে জেলার বহু রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। এক কথায় তাঁহাকে পাবনা জেলার স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলনের জনক

ব্যক্তিগত যোগ্যতা।

স্বর্গীয় বিনোদলাল পাকড়াশী

বলা যাইতে পারে। তিনি সিরাজগঞ্জের অন্যতম অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট-পদে দীর্ঘকাল বিচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকা সময় তাঁহার চেষ্টায় সিরাজগঞ্জ হইতে সাহাজাদপুর পর্য্যন্ত প্রশস্ত সড়ক নির্ম্মিত হয়। তিনি নিম্ন-গ্রামের মধ্যে উচ্চ সড়ক ও পথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং উচ্চ সড়কের পার্শে বৃহৎ একটী কাষ্ঠ সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে স্থলগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ষ্টীমার ষ্টেশন ছিল না, তজ্জন্য দেশ বিদেশে গমনাগমন অতীব কষ্টকর ব্যাপার ছিল। এই অভাব মোচন জন্য তিনি আর এস এন্ কোম্পানীর চিফ্ এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নিজেদের জমিতে ষ্টেশনের স্থান দিয়া কিছুকালের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আয় দেখাইতে প্রতিশ্রুত হন। এইরূপে তিনি সাধারণের একটী গুরুতর অভাব মোচন করেন। ষ্টীমার কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ এজন্য তাঁহাকে আজীবন প্রথম শ্রেণীর পাশ ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বদেশ সেবা।

স্থলগ্রামের পোষ্ট আফিসটী কোন কারণে উঠিয়া যাওয়ায় সাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়ে। তিনি ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পোষ্টআফিসটী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৬৪ খৃঃ যে সকল ব্যক্তিগণের উদ্যোগে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তন্মধ্যে তিনি অন্যতম নায়ক ছিলেন। এই বিদ্যালয়টীকে পরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার মূলে তাঁহার অনুপ্রেরণা ছিল। প্রজা-সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি চৌহালীগ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।

তিনি সদাচারী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুলক্রিয়া ও সামাজিক

সৌজন্যে তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তিনি যেমন গুণবান তেমনি রূপবান ছিলেন। তাঁহার সমুন্নত দেহ, আজানুলম্বিত বাহু ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কান্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ১৯০৩ খৃঃ বৈশাখ মাসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

প্রাণচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালমোহন পাকড়াশী মহাশয় অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আইন কানুনের বিশেষ অনুসন্ধান রাখিতেন। তদনুজ শ্রীযুক্ত মোহিনীলাল পাকড়াশী ও শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন পাকড়াশী পাবনা জেলাবোর্ডে দীর্ঘকাল সভ্য থাকিয়া দেশের অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই সদাচারী এবং ক্রিয়াশীল। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি কৌশলে রংপুর জেলায় নূতন ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। স্থল পাকড়াশী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে তিনি অন্যতম উদ্‌যোক্তা ছিলেন। সাধারণের হিতানুষ্ঠানে তাঁহার সৎসাহস এবং আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ভূসম্পত্তি পরিদর্শন করিতেছেন। আধুনিক উন্নত প্রণালীর কৃষি-পদ্ধতি দ্বারা নিজ জমীদারীতে কৃষি শিল্পের উন্নতি সাধনজন্য ইনি বিশেষ যত্ন করিতেছেন। শিকার, ফুটবলখেলা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি সৎসাহসিক কার্য্যে ইনি বিশেষ পারদর্শী। প্রাণচন্দ্রের পুত্রগণ বিষয় সম্পত্তি পরিদর্শন করেন তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র পাকড়াশীর পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ১৯১৮ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পাশ করিয়া তিনি এম্, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার সৎস্বভাব ও সাহিত্যানুরাগ প্রশংসনীয়।

প্রাণচন্দ্রের ভ্রাতৃবৃন্দ।

মধ্যম তরফ

রামকমলের মধ্যমপুত্র কৃষ্ণলাল জমিদারী কার্য্যে যশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিনোদলাল ১২০২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগান্তে যৌবনের প্রথম সময় হইতেই তাঁহাকে জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতে হইয়াছিল। জমিদারী সংক্রান্ত গুরুভার গ্রহণ করিয়াও বিনোদলাল বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য যে অনুরাগ ও একাগ্রতা প্রদর্শন করেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়।

৺বিনোদলাল পাকড়াশী।

বিনোদলাল সংস্কৃত বাঙ্গালা ও উর্দ্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সমাজেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল এবং তিনি অনেক সুধীসমাজে বেদান্তের বিচারে নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী বেদান্তের বিচারে অন্য কোথাও সন্তোষজনক মীমাংসা না পাইয়া কাশীধামে উপস্থিত হন। এই সময় বিনোদলালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তখন দয়ানন্দের সহিত সপ্তাহকালব্যাপী সংস্কৃত ভাষায় বিনোদলালের বেদান্তের বিচার হয়। দয়ানন্দের পদতলে শিষ্যের ন্যায় উপবেশন করিয়া তিনি দয়ানন্দের প্রশ্নের উত্তরে ধীর ও স্থিরভাবে যে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে দয়ানন্দ প্রীত হইয়া বিনোদলালকে "বেদান্তরত্ন" উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

পাণ্ডিত্য ও দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত বেদান্তের বিচার।

শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা তিনি শুধু নিজের তৃপ্তির জন্য না রাখিয়া লোকের হিতের জন্য

উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "বেদান্তসার" পণ্ডিত মাত্রেরই আদরের জিনিষ। দূরদেশাগত ছাত্রদের শিক্ষার জন্য তিনি কাশীধামে নিজ বাটীতে একটী টোলস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে স্বলগ্রামে "জ্ঞানসঞ্চারিণী সভা" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি নিজ আলয়ে একটী সংস্কৃত গ্রন্থশালাও স্থাপন করিয়াছেন। নিজপুত্রদিগকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়াও তিনি বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

শিক্ষাবিস্তার প্রয়াস।

বিনোদলাল মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে "মদাবেল মহাম" পদে কার্য্য করিতেন। ঐ সময় মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি গোলযোগ উপস্থিত হয়। বিনোদ লাল নিজ কার্য্য দক্ষতায় ঐ সকল বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করিয়া উভয় পক্ষের চিত্তাকর্ষণ করেন। এই সময় গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে সুবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় ইচ্ছানুরূপ বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করেন। নিজ জমীদারী শাসনকার্য্যেও তিনি কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রজাদিগের জলকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি নিজ এলাকায় জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন।

কর্ম্মজীবনের কৃতকার্য্যতা।

তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যাকে উচ্চকুলীন বংশে বিবাহ দিয়া বসত বাটী ও ভূসম্পত্তি সহ স্বল গ্রামে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি নিজ ভাগিনেয়কেও শিক্ষাদান করিয়া স্বলগ্রামে স্থাপন করিয়াছেন।

কুলক্রিয়া ও আত্মীয় পালন।

তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতৃ-সেবা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। মায়ের তীর্থবাসের জন্য তিনি

কাশীধামে বাড়ী নির্ম্মাণ করেন এবং তৎসংলগ্ন একটী মন্দিরে নিজ জননী উমাসুন্দরীর নামে একটী প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালীমাতার ভোগ-রাগাদি বিনোদ লালের পুত্রগণ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। শেষ জীবনে তিনি তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া কাশীতেই বাস করিতেন এবং অন্তিমে বিশ্বনাথের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিনোদ লালের পুত্রগণ সকলেই সুকৃতি-সম্পন্ন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অনন্ত লাল পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি পরিচালনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

মাতৃভক্তি ও কাশীধামে কালী প্রতিষ্ঠা।

তদনুজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল গভর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগে উত্তম কার্য্য করিয়া "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সিরাজগঞ্জ মহকুমার জন সাধারণের হিতার্থে তিনি সমবায় সমিতির বহুল প্রচার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহারই চেষ্টায় কাজীপুর প্রভৃতি গ্রাম নগন্য পল্লী হইতে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি একাধিক বার সরকার পক্ষ হইতে লোকাল বোর্ড ও জেলাবোর্ডে সভ্য মনোনীত হইয়া জেলার হিতকল্পে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি সদাচারী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ লাল ও শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রলাল গভর্ণ-মেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল ক। তিনি জমিদারী বিভাগে দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছেন।

বিনোদ লালের পুত্রগণ।

পিতার পবিত্র স্মৃতি রক্ষার্থে পুত্রগণ নিজগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বহু অর্থ প্রদান করিয়া "বিনোদলাল হল" নামে চিকিৎ-

সালয় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইঁহাদের অন্যতম ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রলাল অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ভ্রাতৃগণ "ব্রজেন্দ্রলাল বালিকা বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করেন।

ছোট তরফ।

রামকমলের তৃতীয় পুত্র রামলাল অপরিণত বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপুত্র দেবলালও পিতার ন্যায় অল্পায়ুঃ ছিলেন।

রামলাল-দুহিতা গিরিবালা পরম ধার্ম্মিকা বিদুষী রমণী ছিলেন। তিনি জীবনব্যাপী বিবিধ ব্রত-নিয়ম পালন করিয়া নিজ জননীর নামে ৺ জয়সুন্দরী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

৺গিরিবালা দেবী

বৃহৎ অট্টালিকা মন্দিরে এই কালীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে এবং দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে নিত্য নিয়মিত সেবা চলিতেছে।

দেবলাল অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী দেবলালের জ্যেষ্ঠভ্রাতার এক পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পাকড়াশী মৃদঙ্গ-

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পাকড়াশী।

শাস্ত্রী। গীতবাদ্যাদি কলানুশীলনে দীর্ঘ সাধনার ফলে তিনি পাখোয়াজ বাজনায় বঙ্গ বিশ্রুত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ বিশারদ পরলোকগত মুরারী বাবুর ইনি অন্যতম কৃতবিদ্য ছাত্র। মূল-আদি-আর্য্য রঙ্গভূমি নাট্যসমিতির তিনি প্রধান উদ্যোক্তা এবং আবাল্য নাট্যকলা-

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পাকড়াশী

কৌশলে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা এবং অমায়িকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি পরম বৈষ্ণব এবং আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ। স্থল হরিসভার তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণস্বরূপ। নিজ বিষয় সম্পত্তির উন্নতি সাধন এবং বসতবাটীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

অখিলচন্দ্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে স্থল সমাজের সংশ্লিষ্ট কুলীন কুলাচার্য্যবৃন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া স্থলগ্রামে সমবেত হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে দুইবার এই বংশের নায়কগণ ঘটককুলীন সভার অধিবেশন করাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্থলগ্রামে তৃতীয়বার কুলীন সন্তানগণের সম্মিলন হইয়াছিল।

অখিলচন্দ্রের একমাত্রপুত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে বি,এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পৈতৃক বিষয় পরিচালন করিতেছেন। দেশের জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার বিশেষ যত্ন আছে। শোভারাম চতুষ্পাঠী ও স্থল হরিসভার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা এবং একনিষ্ঠ কর্ম্মী। সিরাজগঞ্জ লোকালবোর্ড ও পাবনা জেলাবোর্ডের সদস্যরূপে তিনি দেশের কাজে ব্রতী আছেন।

বংশের তরুণ দলের অনেকেই উত্তম রচনা পদ্ধতি ও বক্তৃতা কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। অনেক তরুণ যুবক বাঙ্গালার বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। ইতোমধ্যেই তাঁহারা অনেকে চিত্রশিল্প ও নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহাদের কুলোচিত উদারতা ও সৎসাহসের পরিচয় প্রদানে তাঁহাদিগকে এই অল্প বয়সেই বিশেষ আগ্রহশীল দেখা যায়।

পাকড়াশী বংশের সাতআনী শাখার বংশতরু

মহারাজ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের অন্যতম মহাত্মা দক্ষ হইতে ২৫ পর্য্যায় ভুক্ত শোভারাম।

২৫। শোভারাম

- ব্রজসুন্দর (৷৵০ আনী তরফ)
  - তারিণীচরণ
    - শ্রীধর
    - প্রাণচন্দ্র
      - প্রবোধ
        - প্রকাশ চন্দ্র
    - লালমোহন
      - লক্ষ্মণ
    - মোহিনী
      - নারায়ণ
    - দুর্গামোহন
      - শিবপ্রসাদ
  - গোবিন্দমণি (কন্যা)
- রামকমল (।৵০ আনী তরফ)
  - কৃষ্ণলাল
    - বিনোদলাল
      - অনন্ত
        - অচিন্ত্য
      - উপেন্দ্র
        - ভূপেন্দ্র
      - নিকুঞ্জপ্রভৃতি
  - রামলাল
    - দেবলাল
      - অখিলচন্দ্র
        - চারুচন্দ্র
          - বঙ্কিমচন্দ্র
    - গিরিবালা (কন্যা)
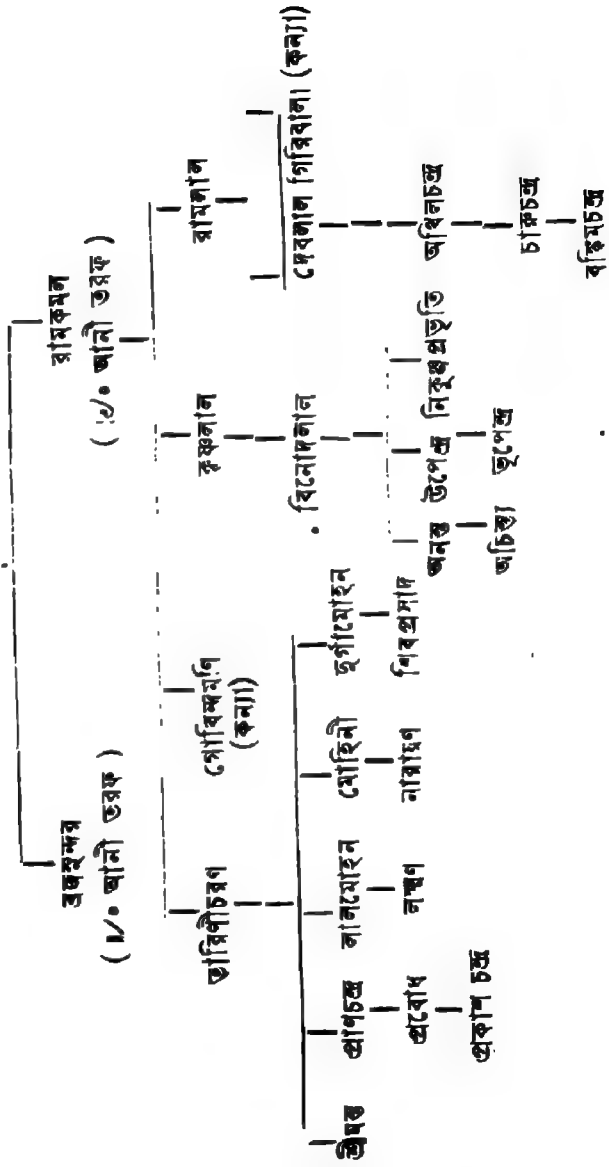
পরিশিষ্ট।

স্বদেশ সেবায়, সামাজিক প্রতিপত্তি ও গুণ গরিমায় এই প্রাচীন জমিদার বংশ পাবনা জেলায় সর্ব্বাগ্রগণ্য। সমাজের এবং দেশের হিত-সাধন জন্য ইঁহারা পূর্ব্বাপর যত্নবান আছেন। শিক্ষা বিস্তারকল্পে এই পাকড়াশী জমিদার বংশ ১৮৬৪ খৃঃ হইতে স্থলপাকড়াশী ইনষ্টিটিউশন বিদ্যালয়টী পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। এ যাবৎ এই বিদ্যালয়ের জন্য অন্যূন পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা এই পরিবার হইতে ব্যয়িত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহারা স্বেচ্ছায় বহু ছাত্রের আহার ও বাসস্থান প্রদান করিয়া ছাত্রাবাসের অভাব মোচন করিয়া দিয়াছেন। স্কুল চতুষ্পাঠী, "আদি আর্য্য রঙ্গভূমি" নাট্যসমিতি প্রভৃতি গ্রামের সার্ব্বজনীন অনুষ্ঠানগুলি তাঁহাদের নিয়মিত অর্থ সাহায্যে অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে। বগুড়া জেলায় তাঁহাদের ভবানীগঞ্জ কাছারীতে একটী কালীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কাছারীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রজাসাধারণের বিদ্যাচর্চ্চার জন্য একটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। পাবনা জেলায় কয়েড়া কাছারীতেও একটী উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয় আছে।

শিক্ষাবিস্তার প্রয়াস।

সিরাজগঞ্জ ইনিয়ট্ ব্রীজ ও সিরাজগঞ্জ হইতে সাহাজাদপুরের সড়ক নির্ম্মাণে, পাবনা লাইব্রেরী, ধর্ম্মসভা এবং জেলার অনেক হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এই বংশের বদান্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিপন্নের সাহায্য, দরিদ্রের অভাব মোচন, আশ্রিত পালন ও অতিথি সৎকার এই বংশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রোড্‌সেস্ কমিটীর সময় হইতে এই বংশের ব্যক্তিগণ পাবনা জেলাবোর্ডে সদস্য থাকিয়া দেশের কাজ করিয়া আসিতেছেন।

স্বদেশ সেবা ও সদনুষ্ঠান।

এই পাকড়াশী পরিবারের সদচার, সামাজিকতা ও ব্রাহ্মণ্য সুপ্রসিদ্ধ। দোল দুর্গোৎসব শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে প্রত্যেক বাড়ীতেই যথোচিত সমারোহ হয়। কৌলিন্যের সমাদর এই বংশের আরও একটী গৌরবের কারণ। বাঙ্গলার সমুদয় শ্রেষ্ঠকুলীন সন্তানই এই পাকড়াশী বংশের সহিত আত্মীয়তায় আবদ্ধ।

সদাচার ও কৌলিন্যের সমাদর।

এই জমিদার বংশের অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ হইলেও এই প্রজাবৎসল জমিদারগণ মুসলমানদিগের মিলাদসরিফ প্রভৃতি ধর্ম্মসভায় সাগ্রহে নেতৃত্ব করেন এবং প্রজাবৃন্দও প্রকৃত আন্তরিকতার সহিত ইঁহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। প্রজাদিগের অভাব অভিযোগ অবগত হইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে ইঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাঁহাদিগের উদার ব্যবহারে হিন্দু মুসলমান বিরোধ নামে কোন জিনিষ এতদঞ্চলে নাই বলিলেই চলে।

প্রজাবাৎসল্য ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য।

অবস্থার সঙ্গতি থাকিতেও এই জমিদার বংশ পল্লীজননীর অঙ্কেই বাস করিয়া সমাজপতির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এই পাকড়াশী বংশের সৌজন্য, আতিথ্য, ক্রিয়াকলাপ ও সদনুষ্ঠানের সুস্পষ্ট আদর্শে হরিদেব পরিবারের অন্যান্য শাখা প্রশাখা ও গ্রামবাসী আশ্রিত কুলীন সন্তানগণও সামাজিকতা, সদনুষ্ঠান ও পরস্পর সহানুভূতি বিনিময় দ্বারা আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছেন। মূল গ্রামের পরস্পর নির্ভরশীলতা বিশেষ গৌরবের বিষয়। সুশিক্ষিত সমাজে যে সমস্ত সদনুষ্ঠানের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, পাকড়াশী বংশের বহুমুখী অনুপ্রেরণায়

পল্লীসমাজ সংরক্ষণ।

স্থলগ্রামে তাহার কোনটীর অভাব নাই ; বরং সহরের ন্যায় জীবনী শক্তির নব নব পরিস্ফূরণ প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পল্লীগঠন বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে "আদর্শ পল্লী" নামের যোগ্য বঙ্গের কোন শ্রীসম্পন্ন পল্লীর বিবরণ পাইলে তাঁহার পত্রিকায় চিত্রসহ ঐ বিবরণ প্রকাশ করিবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার ফলে ১৩৩০ সনের পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় "আদর্শ-গ্রাম" শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধে স্থলগ্রামের হিতকর অনুষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ছবি প্রকাশ হইয়াছিল।

কিরূপে বাঙ্গালার জমিদারগণ দেশের ও দশের হিতসাধন করিয়া পল্লীসমূহ রক্ষা করিতে পারেন এবং পল্লীজীবন গৌরবমণ্ডিত করিতে পারেন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমাজ-সেবাব্রত স্থলের এই পাকড়াশী বংশের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্থলের পাকড়াশী জমিদার বংশের

ঊর্দ্ধপুরুষগণের বংশক্রম।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের

অন্যতম মহাত্মা দক্ষ

|

২। বনমালী পাকড়াশী

|

৩। বিষ্ণু

|

৪। ত্রিপুরারী
|
৫। দীনঙ্কর
|
৬। অনন্ত
|
৭। হরিদেব
|
৮। কালীদাস
|
৯। জগন্মোহন
|
১০। নৃসিংহ সার্ব্বভৌম
|
১১। উমেশ
|
১২। শ্রীপতি
|
১৩। জগদানন্দ
|
১৪। কালীকিঙ্কর
|
১৫। বিশেশ্বর
|
১৬। তারণচন্দ্র
|
১৭। কীর্ত্তিচন্দ্র
|
১৮। রামনারায়ণ
|

স্বর্গীয় পার্ব্বতী চরণ রায়

১৯। গোবিন্দদেব
|
২০। কমলাকান্ত বাচস্পতি
|
২১। অনন্ত
|
২২। গৌরীদাস তর্কালঙ্কার
|
২৩। হরিদেব (ইনি পাবনা জেলায় আগমন করেন)
|
২৪। রামচন্দ্র, রাজারাম, বীরভদ্র, মণিভদ্র, তারাচাঁদ

২৫। সর্ব্বেশ্বর (রাজারামের পুত্র), শোভারাম (মণিভদ্রের পুত্র), শোনারাম (তারাচাঁদের পুত্র)

শোভারামের পুত্র: ব্রজসুন্দর পাকড়াশী (৷৵০ আনী), রামকমল পাকড়াশী (।৵০ আনী)
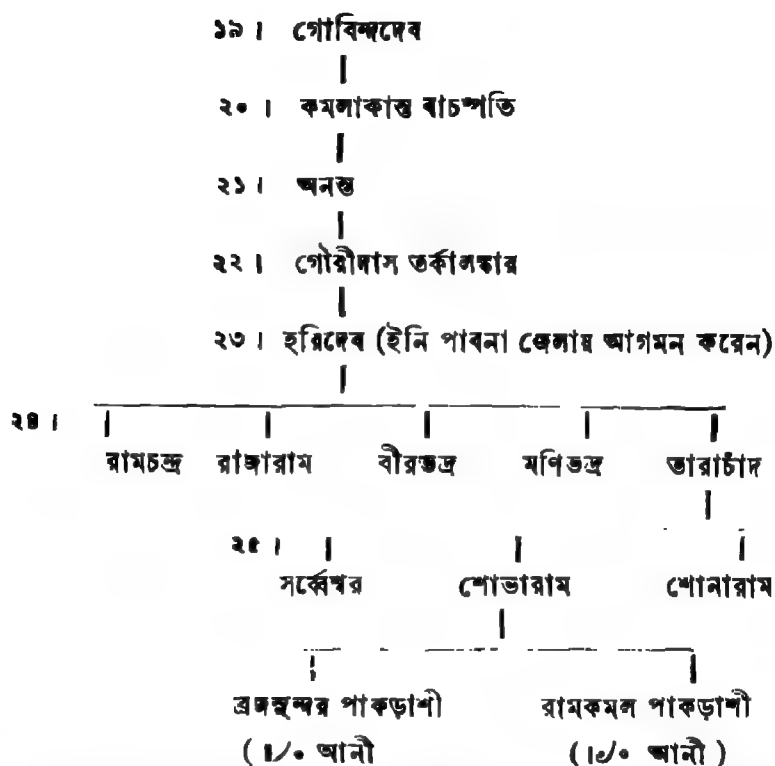
শোভারামের দুই পুত্র হইতেই পাকড়াশী বংশের নয়আনী ও সাত আনী নামক প্রধান দুইটী শাখার উৎপত্তি। তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী বংশক্রম মূল প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে।

২৫। শোভারাম

শোভারাম
ব্রজসুন্দর
(।/০ আন তরফ)
রামকমল
(।৶০ আনী তরফ)
গোলকমণি
(কন্যা)
ঈশানচন্দ্র
(।১০ আনী)
জগদম্বা
(কন্যা)
হরচন্দ্র
(।৶১০ আনী)
কেদারনাথ
দুর্গানাথ
রাজকুমার
সারদাপ্রসাদ
ভবতারিনী
(কন্যা)
বিজয়
দেবেন্দ্র
নগেন্দ্র
প্রসন্ন
গোপাল
যামিনী
গিরিজা, শুকুমার
প্রভৃতি
সুরেশ
দীনেশ
দেবেশ
জ্ঞানেশ
নরেশ
হরিশচন্দ্র
দ্বিজরাজ
অমূল্যকুমার
সরিৎকুমার
প্রাণকুমার
তারেশ
ব্রজেশ
শিবেশ
দ্বিজেশ
ক্ষিতীশচন্দ্র
শিতেশ
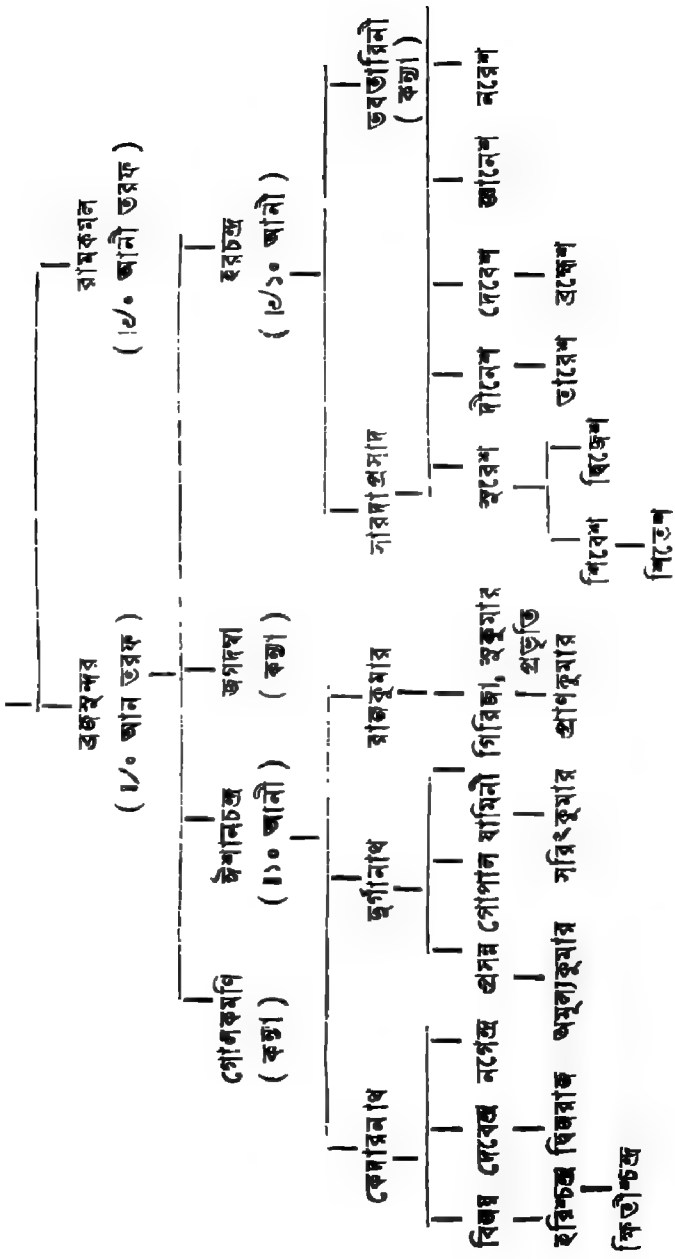
কবিরাজপুর রায়বংশ

মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে ইঁহারা বাৎস্যগোত্র ছান্দাড়ের বংশধর। পরে যখন গ্রাম অনুসারে 'গাঁই' স্থির হয়, তখন ছান্দাড়ের চৌদ্দপুত্রের মধ্যে অন্যতম কবি 'সীমলাল গাঁই' নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার বংশধরগণ 'সীমলাল গাঁই' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। পরে ইঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে এক শাখা ঢাকা জিলার অন্তর্গত ধুল্লা গ্রামে বসতি করেন এবং সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তদবধি ইঁহারা ধুল্লার গোষ্ঠিপতি বলিয়া খ্যাত—গোষ্ঠিপতির মর্য্যাদা মিশ্রগ্রন্থে নিম্ন লিখিতরূপ উল্লেখ আছে :—

"কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্বে যস্যান্নং ভুঞ্জতে সদা।
চন্দনং দীয়তে ভালে স চ গোষ্ঠীপতি স্মৃতঃ।"

বাৎস্য গোত্রে যে পাঁচটি গাঁই শুদ্ধ শ্রোত্রীয়, তৎসম্বন্ধে মিশ্রগ্রন্থে নিম্ন লিখিত কারিকা আছে—

"সিমলাল বাপুলী পূর্ব্ব দীঘাল কাঞ্জি গণি।
বাৎস গোত্রে পঞ্চ গাঁই ক্রমেতে বাখানি।"

এই বংশে ৺ কৃষ্ণরাম রায়ের পৌত্র ৺ মধুসূদন রায়ের পুত্র ৺ দর্পনারায়ণ রায় মহাশয় বিশেষ কৃতী ছিলেন। তিনি তৎকালীন নবাব

সরকারে চাকুরী করিতেন এবং তদ্দ্বারা পূর্ব্বে ঢাকা জিলার এবং বর্ত্তমানে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ধুরিয়াইল গ্রামে তালুকাদি ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া তথায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশাবলী পরিশেষে প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গলা ১২৬৫ সালে ধুরিআইল গ্রাম আড়িয়লখাঁ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, তৎপরে ইঁহারা সকলে ফরিদপুর জিলান্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার অধীন কবিরাজপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

এই বংশের ৺ যশোবন্ত রায় মহাশয়ের পুত্র ৺ পার্ব্বতী চরণ রায় মহাশয় বাংলা ১২৪৭ সালের ২০ শে ভাদ্র তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ ৺ কৃষ্ণমঙ্গল রায় মহাশয় ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া যান যে, তাঁহার পৌত্রগণের মধ্যে এক জন এই বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। ৺ পার্ব্বতী চরণের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল। অল্পবয়সেই পার্ব্বতীচরণ ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় গমন করেন, এবং সেখানে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি স্বীয় অসাধারণ উদ্যম, অধ্যবসায় এবং সততা দ্বারা ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন এবং তদ্দ্বারা কলিকাতায় এবং নিজ দেশে প্রচুর ভূসম্পত্তি ও বৃহৎ জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি অসাধারণ দাতা ছিলেন, গোপনদানও তাঁহার প্রচুর ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং কুলীন প্রধান মাত্রেই তাঁহার বাড়ীতে বার্ষিক পাইতেন; তিনি একটি বৃহৎ সংস্কৃত টোল স্থাপন করেন এবং নবরত্ন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পৈত্রিক বিগ্রহ ৺ লক্ষ্মীগোবিন্দ এবং ৺ দধিবামনচক্র প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বহুব্যয়ে তুলা চতুরাশি প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, বার্ষিক ক্রিয়া কর্ম্মে তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার কলিকাতায়

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায়

বিশাল বাসভবন সর্ব্বদা জন কোলাহলে মুখরিত থাকিত, পূর্ব্ব বঙ্গের বহু দারিদ্র ছাত্র তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে থাকিয়া তাঁহার ব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া এখন অনেকে দেশের গন্যমান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিনি বহুদরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহে, পুত্রের উপনয়নে অর্থসাহায্য করিতেন অথচ তাঁহার দানক্রিয়া লোকচক্ষুর অগোচরেই প্রায় সম্পন্ন হইত। পূর্ব্ব বঙ্গে বিশেষতঃ ফরিদপুরে ঘরে ঘরে তাঁহার বিষয়ে অনেক গল্প এখনও প্রচলিত আছে। এই অসাধারণ কৃতী পুরুষ বাংলা ১৩০৭ সালের ২৯ অগ্রহায়ণ তারিখে ৺কাশীধামস্থ তাঁহার নিজ ভবনে দেহরক্ষা করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায় মহাশয় উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি নিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পিতার প্রবর্ত্তিত এবং অনুষ্ঠিত কার্য্য যথাযথ ভাবে বজায় রাখিতেছেন। তিনি ব্যবসায়ের ঝঞ্ঝাট পছন্দ না করিয়া পরিণত বয়সে নীরবে দেশসেবা করিতে মনস্থ করেন এবং কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নিজ জিলা ফরিদপুরের সেবা করিতেছেন। তিনি ১৯১১ সালে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর যে অধিবেশন হয়, তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হন, গত ২০ বৎসর যাবৎ তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষ অগ্রনী ছিলেন এবং গত ১৯০৬ সাল হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনেই ফরিদপুরের প্রতিনিধি হইয়া গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানের কাজ করিতেছেন।

দর্পনারায়ণ রায়
(১) জয়নারায়ণ, নিঃসন্তান
(২) শূরনারায়ণ,
(৩) কৃষ্ণমঙ্গল
(৪) রাম গোবিন্দ
কৃষ্ণকান্ত
কালীপ্রসাদ
১)চন্দ্রকান্ত (২)গোপাল চন্দ্র (৩)জগৎবন্ধু (৪)পূর্ণচন্দ্র (৫)রামচন্দ্র
নিঃসন্তান
চিরঞ্জীব
নিঃসন্তান
দুই পুত্র নাবালক
(১) রাজকৃষ্ণ (২) যোগেন্দ্র কান্ত (৩) শ্রীশচন্দ্র
(১)রামকান্ত (২)জগবন্ধু (৩)গঙ্গাপ্রসাদ (৪) রামচন্দ্র
রাজচন্দ্র
হরচন্দ্র নিঃসন্তান
নিঃসন্তান
(১)শ্যামাচরণ (২)রজনীকান্ত (৩)কালীকান্ত
নিঃসন্তান
রামেন্দ্রেশ্বর
নিঃসন্তান
(১)তারকচন্দ্র(২)ঈশানচন্দ্র (৩)চন্দ্রকুমার (৪)পূর্ণচন্দ্র
কন্যাসন্তান
নিঃসন্তান
নিঃসন্তান
(১) কেবল কৃষ্ণ (২)শম্ভুনাথ (৩) বৈদ্যনাথ (৪) জশোবন্ত
কন্যা সন্তান
কন্যা সন্তান

বৈদ্যনাথ
(১) তিলক চন্দ্র
(২) রামকুমার
(৩) রাজকুমার
(৪) কালীকুমার
(৫) চন্দ্রকুমার
নিঃসন্তান
নিঃসন্তান
নিঃসন্তান
হরিচরণ
(১) মধুসূদন
(২) রামনারায়ণ
(৩) রসিকলাল
পুত্র নাবালক
(১) কালিদাস
(২) কালীপ্রসন্ন
(৩) কালিপদ
(যশোবন্ত)
(১) কালীচরণ
পার্ব্বতীচরণ
(৩) তারকনাথ
নিঃসন্তান
নিঃসন্তান
(১) কৃষ্ণদাস
(২) আশুতোষ
(১) বিভূতিভূষণ
(২) জয়ন্তকুমার
চন্দ্র
(১) যোগেশচন্দ্র
(২) রমেশচন্দ্র
দীনেশচন্দ্র
সুরেশচন্দ্র
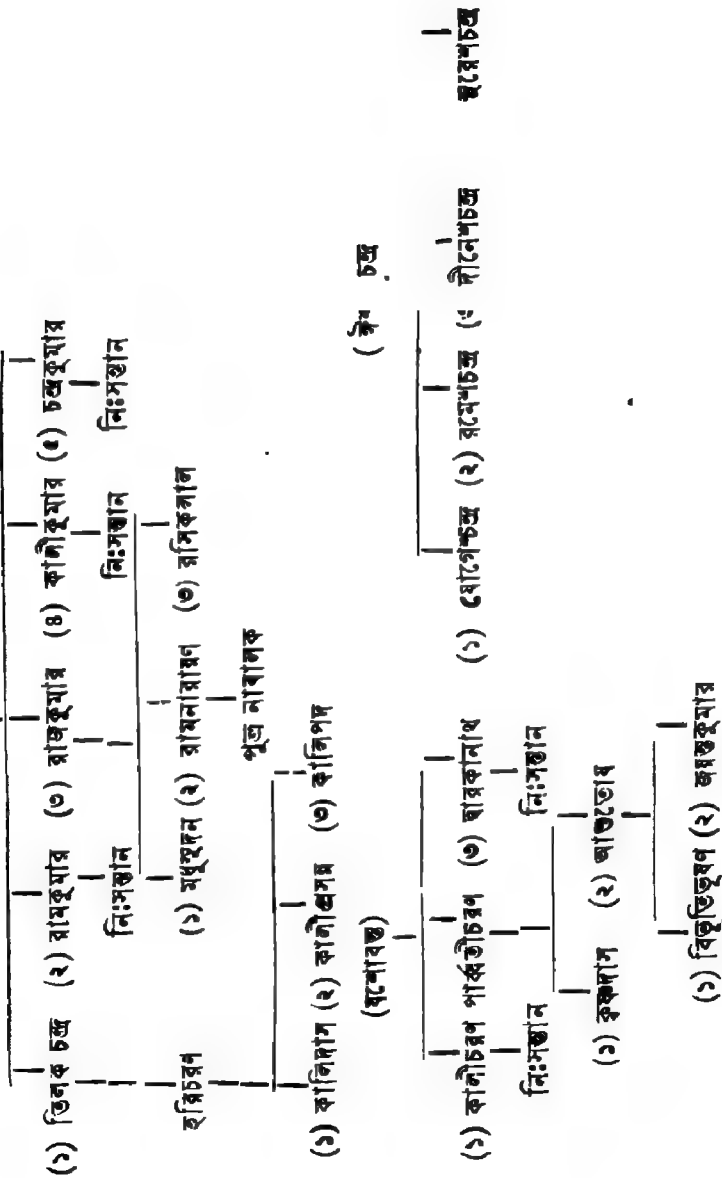
স্বর্গীয় বামনদাস মুখোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের বাঙ্গালাদেশে যে সকল ব্যক্তি আর্থিক অস্বচ্ছলতার ভিতর দিয়া কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে কঠিন পরিশ্রম দ্বারা বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় অন্যতম। ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে। এই ফুলিয়া গ্রামের নাম হইতে ফুলিয়া মেলের প্রচলন হইয়াছে। তাঁহাদের বংশাবলী ফুলের মুখুটী শ্রীধর ঠাকুর হইতে আরম্ভ।* তাঁহার প্রপিতামহ রাম প্রসাদকে হুগলী জেলায় গোস্বামীমালীপাড়া গ্রামের গোস্বামীগণ আনিয়া প্রথমে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী চুঁচুড়া গ্রামে বসবাস করিবার জন্য জমী ও বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন ও তাঁহাদের মধ্যে একজনের কন্যার সহিত উক্ত রামপ্রসাদের পুত্র শম্ভুচন্দ্রের বিবাহ দেন। তাঁহারা তখন স্বভাব কুলীন ছিলেন। তাহার পর ঐ গোস্বামীদের বাড়ীতে ভঙ্গ হওয়ায় শম্ভুচন্দ্র ভঙ্গ কুলীন হইলেন। শম্ভুচন্দ্র ভঙ্গ হইলেও বহু বিবাহ করিয়াছিলেন এবং জীবদ্দশায় কুলীনের ন্যায় সম্মানও পাইয়াছিলেন।†

শম্ভুচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রীর অর্থাৎ গোস্বামীমালীপাড়াস্থ বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার কালীদাস, দুর্গাদাস ও শিবদাস নামে তিন পুত্র হয়। কালে শম্ভুচন্দ্র গোস্বামীমালীপাড়ার শ্বশুরালয়ের সংলগ্ন কতকটা জমী

* "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ও "সম্বন্ধ নির্ণয়" দ্রষ্টব্য।

† বিদ্যাসাগরের "বিধবাবিবাহ" ও "বহু বিবাহ" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় বামনদাস মুখোপাধ্যায়।

শ্বশুরদের নিকট হইতে পাইয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। তদবধি চুঁচুড়ার সহিত তাঁহাদের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়।

দুর্গাদাস মাতুলালয়ে থাকিয়া কুলীনের পুত্রের মত প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। দুর্গাদাস নিষ্ঠাবান ও দশকর্ম্মান্বিত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। দুর্গাদাস ও তাঁহার তিনভ্রাতা ফার্শী ও ইংরাজী কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন, কাজেই মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারা সওদাগরী আফিসে চাকুরী করিতেন। তবে দুর্গাদাস নিজে কখনও চাকুরী করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। অন্য দুই ভ্রাতা চাকুরী করিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে ইংরাজ-রাজ কেবল ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদের রাজ্য ও শাসন বিস্তার করিতেছেন। দুর্গাদাস কুলীন না হইলেও কৌলিন্য মর্য্যাদা রক্ষার জন্য উনবিংশতিটী বিবাহ করেন। তন্মধ্যে নিজগ্রামে প্রথম, বাঁকুড়া সোণামুখী গ্রামে দ্বিতীয় এবং হুগলীর আনা নামক গ্রামে তৃতীয় বিবাহ করেন, অপর বিবাহগুলি কোথায় হয় তাহা বংশাবলীর ইতিহাসে জানা যায় না। বামনদাস উক্ত প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত তৃতীয় সন্তান। প্রথম ও চতুর্থ গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়। দ্বিতীয় হেরম্বচন্দ্র ও তৃতীয় বামন দাস জীবিত ছিলেন। হেরম্বচন্দ্রের ১৮ বৎসর বয়সে বিবাহের পর মৃত্যু হয়। বামনদাস ৭ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তদবধি তাঁহার মাতুলালয় গোস্বামীমালীপাড়ায় ও কলিকাতায় তাঁহাদের কর্ম্মস্থলের বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ বাসা বাটীতে থাকিয়া মানুষ হইতে থাকেন। বামন দাসের কনিষ্ঠ মাতুল ৺রাধামাধব চক্রবর্ত্তীর অবস্থা খুব ভাল ছিল। তাঁহার চাকুরীতে ও ব্যবসায়ে অনেক উন্নতি হয়। তিনি কয়লার দালালিও করিতেন। এই সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্যের মূলে বামন দাসের কনিষ্ঠ খুল্লতাত ৺শিবদাস মুখোপাধ্যায় ছিলেন। তিনি

নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। যাহা হউক বামনদাস পিতৃপিতামহের কোন সম্পত্তি এমন কি বাস্তু ভিটা পর্য্যন্ত পান নাই। মাতুলালয়ে থাকিয়া যখন ১৪ বৎসর বয়স হয়, তখন একদিন কোন কারণে নিজের মাতুলের সহিত তাঁহার মা ঠাকুরাণী ক্ষেত্রমণি দেবীর কলহ হয়। তিনি কুলীন বিধবা ভগিনী, ভ্রাতার সংসারে থাকিয়া রন্ধনাদি করিয়া নিজের ও একমাত্র পুত্রের অন্ন সংস্থান করিতেন। কোন কারণে ভ্রাতার সহিত কলহ হওয়ায় ক্ষেত্রমণি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যোড়াসাঁকো দাঁয়েদের বাটীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। *

এই দাঁয়েদের বাটীস্থ ছেলেদের সহিত বামনদাসের বিশেষ বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্দ্য ছিল। দাঁয়েদের আদি কর্ত্তা গোকুল দাঁয়ের স্বর্ণময়ী দাসী নাম্নী একমাত্র বিধবা কন্যা বাটীতে নিঃসন্তান অবস্থায় থাকিতেন। তিনি বামনদাসের দুঃখ কষ্টের কাহিনী শুনিয়া ও ক্ষেত্রমণির প্রতি ভ্রাতার দুর্ব্যবহারের কথা অবগত হইয়া বামনদাসকে নিজের পুত্রের ন্যায় সযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। এইখানে থাকিয়া বামনদাসের শুভ উপনয়ন কার্য্য সমাপ্ত হয়। স্বর্ণময়ী নিজে উপনয়নের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। স্বর্ণময়ীকে বামনদাস "মা" বলিয়া ডাকিতেন এবং পরবর্ত্তী কালে যখন বামনদাস বিশেষ বিত্তশালী হইয়া উঠেন তখন পর্য্যন্তও স্বর্ণময়ীর সহিত বামনদাসের "মাতাপুত্র" সম্বন্ধ ছিল। বামনদাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ব্যবসায় করিতে মনস্থ করেন এবং চীনাবাজার হইতে নানাপ্রকার খেলনা আনিয়া তাহা পাড়ার মেয়েদের মধ্যে বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু ধনোপার্জ্জন করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম চিনাবাজারের কোন দোকানদার বামনদাসকে বাকীতে জিনিষ পত্র দিত না, বামনদাস অতি কষ্টে দু'চার টাকা সংগ্রহ করিয়া

*৺কীর্ত্তিচন্দ্র দাঁর পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহারা কলিকাতা যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ধনী।

স্বর্গীয় বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের দেবালয়
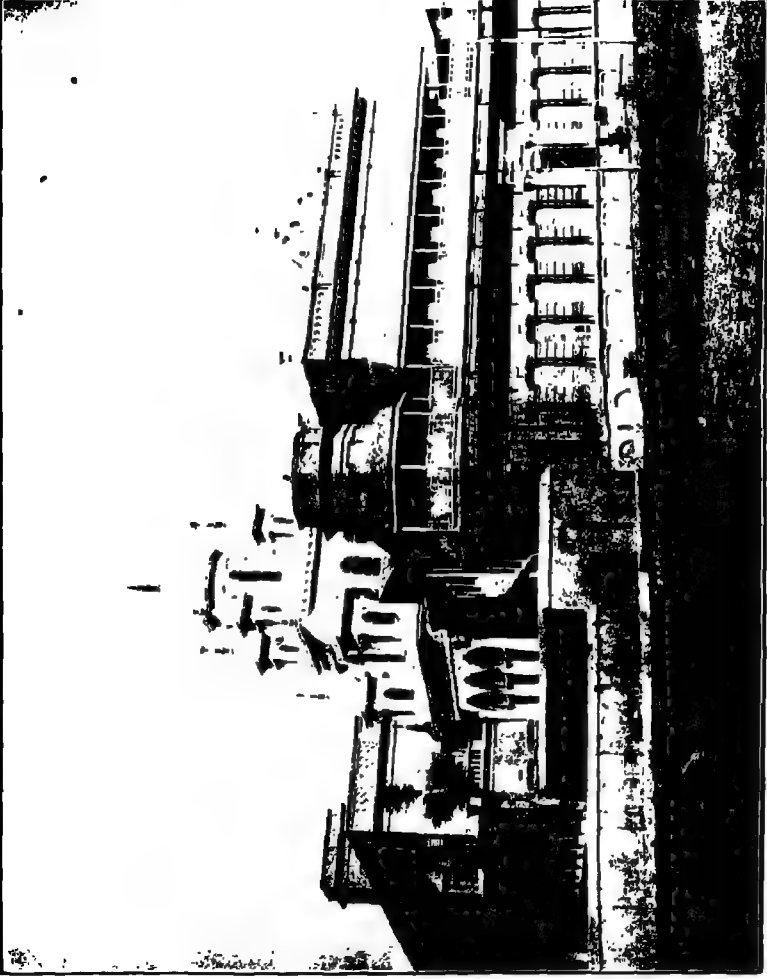
তদ্দ্বারা খেলনাদি ক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় না করিয়া মূলধন বাড়াইতেন। কালক্রমে সেই চীনাবাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ২।১ জন ব্যবসায়ী এখন বামনদাসের প্রজারূপে বসবাস করিতেছেন। কিছুদিন খেলানাদি বিক্রয় করিবার পর বামনদাস দক্ষিণেশ্বর গ্রামের রায় বাহাদুর প্রসন্ন কুমার বন্দোপাধ্যায়ের অধীন শিক্ষানবিশী করিয়া বাটী ও রাস্তাদির নির্ম্মাণ কৌশল শিক্ষা করেন। এখন যে রাস্তা দমদমা রোড নামে খ্যাত তাহা বামন দাসেরই তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়।

একদিন রাত্রিতে গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার—রায় বাহাদুর চেক সহি করিতেছেন, আর বামনদাস প্রদীপের আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তখন এ দেশে বৈদ্যুতিক আলোকাদির প্রচলন হয় নাই। হঠাৎ প্রদীপের আলোটি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া যায়। রায় বাহাদুর ইহাতে বামনদাসের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দেন। তবে বিদায় দিবার সময় রায় বাহাদুর বামনদাসকে কয়েকটি সদুপদেশ দেন। তিনি বলেন, বড় লোক হইলেও কখন সাত হাতের বেশী কাপড় পরিও না। পয়সা কড়ি দিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। কখনও গর্ব্বিত হইয়া কাহারও সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিও না। নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবিও না। সকলের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে। বামনদাস সেই মুহূর্ত্তে চলিয়া আসিলেন। তিনি পথে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন এখন কোথায় যাইবেন,কোথায় দাঁড়াইবেন। পথিমধ্যে শ্রীরামপুর নিবাসী ক্ষেত্রমোহন সাহার সহিত তাঁহার দেখা হইল। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার মাতুলের ব্যবসায় ক্ষেত্রে বামনদাসের সহিত ক্ষেত্রবাবুর আলাপ ছিল। ক্ষেত্রমোহন অল্প বয়সে গম, সরিষা, তিসি, ছোলা ইত্যাদির চালানি করিয়া বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহ তাহার কয়েক বৎসর আগে হইয়াছিল মাত্র। বামনদাস তাঁহার নিকট নিজের দুঃখ দৈন্যের কথা জ্ঞাপন করিলে ক্ষেত্রমোহন তাঁহাকে কানপুরের কুঠীতে ব্যবসায়-শিক্ষা ও সেখানকার কর্মচারীদের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পাঠান। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত ছিল যে বামনদাস ব্যবসায় কার্য্য শিক্ষা করিলে তিনি কানপুর কারবারের চারি আনা অংশ পাইবেন। কিন্তু কয়েকমাস অবস্থানের পর তত্রত্য ম্যানেজারের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি কানপুর হইতে চলিয়া আসিলেন এবং শ্রীরামপুরে আসিয়া ক্ষেত্রবাবুর নিকট বিদায় চাহিলেন। ক্ষেত্রবাবু তাঁহাকে বিদায় দিলেন সত্য, কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর শেষ জীবন পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। শ্রীরামপুরে ঠাকুর বাটী, ডাক্তারখানা ও অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া ক্ষেত্রমোহন নিজকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন।

ক্ষেত্রসাহার কুঠিতে ব্যবসায় কিছু শিখা করিয়া ব্যবসায়ের দিকেই তাঁহার মন গেল। চাকুরীকে তিনি আবাল্য ঘৃণা করিতেন। তিনি কানপুর কুঠীতে যাইবার পূর্ব্বে দিন কতক শ্রীরামপুরে কোন ওলন্দাজ কুঠীতে ও মাসকয়েক কলিকাতায় ইংরাজ দপ্তরে চাকুরী করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্রস্থ উচ্চ পদস্থ ইংরাজ ও দেশীয় কর্মচারীদিগের সহিত সামান্য কারণে কলহ হওয়ায় তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন। প্রথম বয়সে তিনি ইংরাজগণের সংস্রবে থাকিতে মোটেই পছন্দ করিতেন না। তবে শেষ বয়সে কয়লার ব্যবসায়ে ইংরাজগণের দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

স্বাধীনচেতা বামনদাস কাহারও অন্যায় কথা স্বার্থের খাতিরেও সহ্য করিতেন না। সেইজন্যই কাহারও অধীনে চাকুরী তাঁহার পোষাইত না। এই ব্যাপারে উদাহরণ-স্বরূপ একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করা

যাইতে পারে। একসময়ে গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট আফিস বাটীর কোন অংশ প্রস্তুতকালে বামন দাস চূণের অর্ডার লইয়া তাহা সরবরাহ করিতেন। একদিন সেই চূণ হিসাব করিয়া লইবার এক নূতন নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সহিত বামন দাসের চূণের মাপ ও ওজন লইয়া তর্ক হয়, সেই কর্ম্মচারী চূণের মাপ কি ধরণে লইতে হয় তাহা জানিত না, সেই সময় ঐ স্থান দিয়া এক উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী যাইতেছিলেন, তাঁহাদের কথা শুনিয়া তিনি দাঁড়াইয়া বামনদাসকে ধমকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, "তুমি কেন ওজন করিয়া চূণের হিসাব দেখাইয়া দাও না, ফুটে হিসাব দিলে কম হইতে পারে ত?" তাহা শুনিয়া পূর্ব্ব হইতে তর্কে বিরক্ত বামনদাস ঐ উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলেন যে, ইহাত আর সাজিমাটী নহে যে ওজন করিয়া দেখাইয়া দিব? ইহা চূণ!"—এই কথায় উক্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি রজকবংশীয় থাকায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই সরবরাহ কার্য্যের অবসান হয়। তাহাতে বামনদাসের বেশী লাভ থাকিলেও আর গ্রাহ্য করিলেন না। অনেক বন্ধুরা বলিয়াছিলেন, "যে তোমার গোঁয়ারতামীতে তুমি কোন কালেই উন্নতি করিতে পারিবে না," কিন্তু বামনদাস মাত্র বলিয়াছিলেন, "অন্যায় সহ্য করিতে কোনকালেই পারিব না, ইহাতে উন্নতি হউক আর নাই হউক।"

কানপুর হইতে আসিয়া সুপারির ব্যবসায়ের জন্য তিনি চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যান। তিনি এই সময়ে সামান্য পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আর সামান্য টাকা ধার করিয়াছিলেন। অবশ্য এই সময় কিছু দিনের জন্য কাঁসারীপাড়ার বিখ্যাত ধনী ও দানশীল মহাত্মা বাবু তারকনাথ প্রামাণিক বিনা সুদে বামনদাসকে কএক শত টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। ইহা এস্থলে উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে সে সময় নিজের মাতুলের বহু অর্থ থাকা

সত্ত্বেও শতকরা ১৲ হারে সুদেও বামনদাসকে টাকা কর্জ্জ দেন নাই; অন্যলোকে কিন্তু বিশ্বাস করিয়া দিয়াছিলেন। অবস্থার বৈগুণ্য হওয়ার কারণ ঐরূপ হয়। প্রথমে তিনি এই ব্যবসায়ে বেশ দুপয়সা লাভ করিতে লাগিলেন। শেষে লোকসান হইতে লাগিল। তারপর একদিন পদ্মা পার হইতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার কাপড়ের ভিতর হইতে ১১০০৲ টাকা জলে পড়িয়া যায়। সুখের বিষয় যে সেগুলি নম্বরী নোট বলিয়া তিনি সরকারে দরখাস্ত করিয়া একবৎসর পরে ঐ টাকা পান। এই সময় তিনি বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে ৵৩৷ কাঠা জমি ক্রয় করেন। ইহাই তাঁহার কলিকাতার প্রথম ভদ্রাসন সম্পত্তি হইল। তখন প্রতি কাঠার মূল্য মাত্র ২ শত টাকা ছিল।

বামন দাস একবার লবণের ব্যবসায় করিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে লাক্ষার ব্যবসাও ছিল। প্রাচীন সিংহভূম বা বর্ত্তমান চাঁইবাসার জঙ্গলে লাক্ষা পাওয়া যাইত, তখন রেল পথ না থাকায় পদব্রজেই চাঁইবাসায় যাইতে হইত। বামন দাস নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সেই হিংস্র-জন্তু-সমাকুল চাঁইবাসার বনে যাইয়া তত্রত্য বন্য অধিবাসীদিগকে লবণ দিয়া তদ্বিনিময়ে লাক্ষা লইয়া আসিতেন। তাহারা তখনও মুদ্রার প্রচলন বুঝিত না। পথে অনেক সময় ডাকাত ও ঠগীর হাতে তাঁহাদিগকে পড়িতে হইত। এক একবার এই ঠগীদের হাতে তাঁহাদের জীবন পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন হইত। অনেক কৌশলে তবে রক্ষা পাইতেন। সে কথার সবিস্তার আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। ১৯ বৎসর বয়স হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বামন দাসকে গম, তিসি, ছোলা ইত্যাদির ব্যবসায়ের জন্য কানপুর হইতে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থানে যাইতে হইত। কিন্তু এই সমস্তের ব্যবসায়ে তাঁহার ক্ষতি হওয়ায় তিনি কয়লার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে অতি

সামান্য আকারে কয়লার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া শেষে একটি কয়লার ডিপো খুলিলেন। তাহাতে তাঁহার ১৫০০০০৲ টাকা লাভ হওয়ায় একটি কয়লার কুঠি (colliery) খুলিবার সঙ্কল্প করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সাতারামপুরের ছোট দেমুধা নামক স্থানের কতকটা জমি অতি কম খাজানায় কাশীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। এই কয়লার কুঠি (colliery) হইতেই বামন দাসের প্রকৃত সৌভাগ্যের উদয় হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় তিনি কালীঘাটে ৺কালী মাতার মন্দিরের সম্মুখে নাট মন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়া দিয়া তাহাতে মর্ম্মর প্রস্তর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এই কয়লার ব্যবসায়সূত্রে ভাল ভাল ইংরাজ ব্যবসায়ীদের সহিত বামন দাসের পরিচয় হইয়াছিল। সার এ, এ, ম্যাকে যিনি পরে লর্ড ইঞ্চকেপ হইয়াছেন তাহাদের সহিতও তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাঁহার একটি ইটের ব্যবসাও ছিল, কিন্তু তাহা তিনি পরে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক কয়লার ব্যবসায়ে বামন দাস প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে দেশীয়দিগের মধ্যে কয়লার শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বলিয়া তাঁহাকে ইংরাজ ব্যবসায়িগণ "King of the black diamond" উপাধি দিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন এই কয়লার কুঠিতে আগুন লাগিয়া অনেক কলকব্জা নষ্ট হওয়ায় বামন দাস কয়লার ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন, কেবল রাণীগঞ্জের ছোট collieryটী রাখেন। ইত্যবসরে বামন দাস কিছু বিষয় সম্পত্তিও করিয়াছিলেন। একটি মাত্র পুত্র সুতরাং যে ভূসম্পত্তি করিয়াছেন তাহার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হওয়ায় তিনি আর শেষ জীবনে অধিক অর্থোপার্জ্জনের দিকে মন না দিয়া ধর্ম্ম সাধনার দিকে মন প্রাণ নিয়োগ করেন।

কাশীপুরে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার ৫০ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে তন্মধ্যে শ্রীশ্রীকৃপাময়ী নামে কালী মূর্ত্তি শ্রীশ্রী৺দুর্গেশ্বর, শ্রীশ্রী৺ক্ষেত্রেশ্বর নামে লিঙ্গমূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করেন। হিন্দুদিগের সমস্ত পূজা পার্ব্বণ ছাড়া এই মন্দিরে প্রতি বৎসর ৩০শে ফাল্গুন মহাসমারোহে পূজা, পার্ব্বণ ও ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে। প্রতিদিন এই মন্দিরে ৫ জন বিকলাঙ্গ দরিদ্র লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই মন্দিরের আয় হইতে অনেক দেশহিতকর কার্য্যে সহায়তা করা হইয়া থাকে। মন্দিরে মা কালীর প্রতিষ্ঠা থাকিলেও শাক্তদের নিয়মমত কিন্তু এই দেবালয়ে কোন বলিদানের ব্যবস্থা নাই বা মাংস মদ্যের ব্যবহার হয় না, সাত্ত্বিক ভাবেই পূজাদি হইয়া থাকে। তিনি কাশীতে দেবালয় ও অতিথিশালা প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিয়া শেষ বয়সে কাশীতে নিজে ৩॥০ বৎসর ধরিয়া অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া মজুরদের সঙ্গে থাকিয়া বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কারণ এই যে পাছে কোন কন্ট্রাক্টারকে দিয়া "বাবু" হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে ঐ কন্ট্রাক্টার ফাঁকি দেয় ও বাটী অল্প দিন স্থায়ী হয় এবং বেশী পয়সা অনর্থক খরচ হয়। এই কারণে কলিকাতাস্থ অন্যান্য বাটীও নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

কাশীতে দেবালয় প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার কাশীস্থ গুরুদেব মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট প্রতি বৎসর দেখা করিতে যাওয়া আসায় কাশীর উপর অনুরাগ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কাশীতে সৎকীর্ত্তি রাখিবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই দেহাবসান হয়।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩১৮ সালে বামনদাস বাবু কাশীপুরের মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৬০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। বংশের যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি উক্ত কাশীপুরের মন্দিরের সেবাইত হইবেন। সেবাইত মাসিক ৫০৲ মাসোহারা পাইবেন ও মায়ের প্রসাদ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। এইরূপ ধরণের নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন।

বামনদাস বাবু টালা নিবাসী ৺ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে প্রথমে বিবাহ করেন। তাঁহার নাম মুক্তকেশী দেবী। তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁহার সম্মতিক্রমে যোড়াসাঁকোর চাষা ধোবা পাড়া লেনে ৺মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি মহামহোপাধ্যায় ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের ভগ্নীপতি হইতেন। ১৩০৫ সালে মাঘ মাসে কাশীধামে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৩১৪ সালে ১৪ই বৈশাখ তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ১৩২৮ সালের ৪ঠা আষাঢ় স্বয়ং তিনি এক কন্যা দুই দৌহিত্র ও একমাত্র পুত্র ও দুই পৌত্র এবং দুই পৌত্রী রাখিয়া এবং দেবোত্তরের ৪০ হাজার টাকা আয় ও নিজ সম্পত্তির ৬০ হাজার টাকা আয় ও নগদ কয়েক লক্ষ টাকা রাখিয়া প্রায় ৭৬ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

বামনদাস বাবু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। কোন সৎকার্য্যাদি করিয়া ঢক্কা নিনাদ করিতে বা উপাধিভূষিত হইতে মোটেই পছন্দ করিতেন না বলিয়াই সভা সমিতি বা 'জেভী'তে নিমন্ত্রণাদি হইলেও তিনি যাইতেন না। তিনি বাবুয়ানি মোটেই পছন্দ করিতেন না। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ত্যাগী, সংযমী, পরোপকারী ও পরিশ্রমী লোকদিগকে তিনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। তাঁহার জীবন ধর্ম্মময় ছিল। দরিদ্রের দুঃখে তিনি বিচলিত হইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরে কোন ধর্ম্মের ভাণ তাঁহার ছিল না। যাঁহাদের নিকট সামান্য উপকারও পাইয়াছেন,

তাঁহাদের জীবনে কথনও বিস্মৃত হন নাই, অনিষ্টকারীদেরও ভুলিতে পারেন নাই। তবে শেষ জীবনে তাহাদের ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কথার নড়চড় করিতেন না। এজন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে কয়লার ব্যবসায়ে ২.৪ লক্ষ টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে।

ইহার একমাত্র পুত্র মন্মথনাথ। ইনিও পিতার প্রায় সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছেন। পিতৃকীর্ত্তিসমূহ ইনি যথোচিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিতেছেন এবং ইতোমধ্যেই দান, ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার, বন্ধুপ্রীতি, বাক্যরক্ষা প্রভৃতির জন্য পরিচিত স্থলে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কিছু সম্পত্তিও বাড়াইয়াছেন। তন্মধ্যে হাওড়া জিলার আমতা নামক স্থান উল্লেখযোগ্য।

নিম্নে ইহাদের বংশতালিকা দেওয়া হইল—

শ্রীমান্ ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৩২) শম্ভুচন্দ্র

কালিদাস (৩৩) দুর্গাদাস শিবদাস (নিঃসন্তান) শিবচন্দ্র (নোয়াখালি নিবাসী) ইনি কালিদাস, দুর্গাদাস প্রভৃতির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা

(৩৪) বামনদাস

(৩৫) মন্মথ নাথ
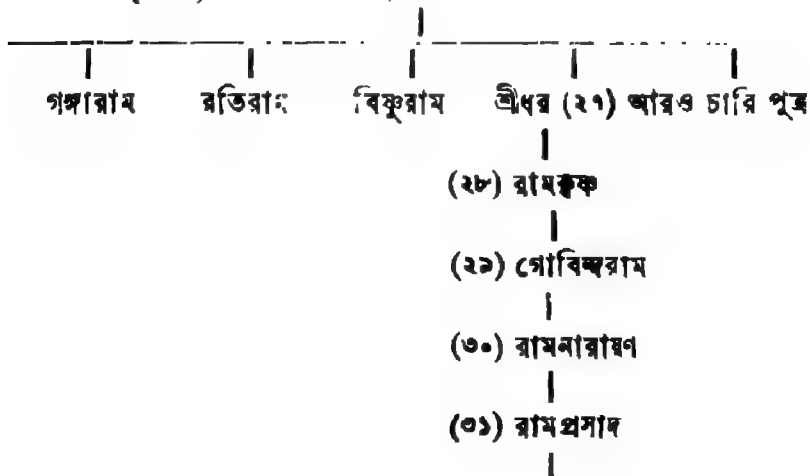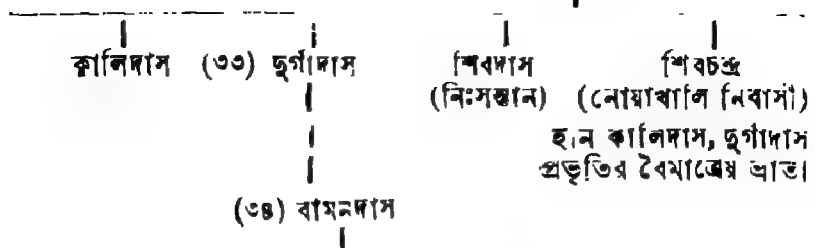
কন্যা বিশ্বেশ্বরী (স্বামী বীরভূম নাভপুর নিবাসী ৺ যাদব লালের কনিষ্ঠ পুত্র নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়)।

(৩৬) ভূপতিনাথ

নরেন্দ্রনাথ

কন্যা অন্নপূর্ণা (স্বামী দক্ষিণপড়িয়া (২৪ পঃ) নিবাসী ৺ দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

আরও তিনটি কন্যা।

সত্যনারায়ণ

নিত্যনারায়ণ

শ্রীযুক্ত রায় নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত এম,এ,বি,এল্, বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশ পরিচয়।

বৈদ্যবংশজাত মৌদ্গল্য-গোত্রীয়, শ্রীযুক্ত রায় নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর এম, এ, বি, এল, বঙ্গাব্দ ১২৭০ সালের ২২শে কার্ত্তিক শনিবার মাতামহগৃহে বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী সিদ্ধিপাশা গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার মাতা স্বর্গীয়া পূর্ণিমা দেবী, পিতা ৺লক্ষ্মীকান্ত সেন মহাশয়ের বড় আদরের কন্যা ছিলেন; কিন্তু বহুদিন তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি না হওয়ায়, অনেকে দেবীমাতাকে বন্ধ্যা মনে করিতেন, এবং এই দোষ পরিহার করে তিনি অনেক ব্রত নিয়মাদি পালন করেন, এবং নানা যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন ও নানা পুরাণাদি 'কথক' মুখে শ্রবণ করেন।

পূর্ণিমা দেবীর গর্ভে অনেক বয়সে ক্রমান্বয়ে ৩টী কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে তন্মধ্যে 'রায় বাহাদুরই' সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মাতামহ ৺লক্ষ্মীকান্ত সেন মহাশয় যদিও তৎকালে তাঁহার একমাত্র পুত্রশোকের অধীর ছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রিয়কন্যা পূর্ণিমা দেবীর গর্ভে পুত্র জন্মগ্রহণ করায়, সেই শোক অনেক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হয়, এই হেতু শিশুর মাতামহ তাঁহার "নিবারণ" নামকরণ করেন। যদিও অন্নপ্রাশন ও নামকরণে অন্য নাম মনোনীত করেন, তথাপি মাতামহ প্রদত্ত নামই শেষে গৃহীত হয়। মাতামহগৃহে নানাপ্রকারের আনন্দোৎসব হয় এবং এই শিশুর আগমনে শোকতমসাচ্ছন্ন গৃহ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বরিশাল জেলান্তর্গত 'মাহিলাড়া' গ্রামটি বৈদ্যপ্রধান, এবং তন্মধ্যে, 'নরসিংহদাশ' বংশই সংখ্যায়, ধনে ও মানে শ্রেষ্ঠ ছিল। 'রায়বাহাদুরের'

রায় বাহাদুর শ্রীনিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত।

প্রপিতামহ ৺ ভবানী প্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়, নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া প্রচুর ধন ও মান অর্জ্জন করেন, এবং তিনিই প্রকাণ্ড দীঘি ও পুকুর খনন করাইয়া বাড়ী প্রস্তুত করেন। তাৎকালিক মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোকের যাহা কিছু ক্রিয়াকলাপ ছিল, তৎসমূহেরই অনুষ্ঠান করিতেন। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্ম, দেবসেবা, অতিথি সেবা ভূরি-ভোজন ইত্যাদি দ্বারা, তিনি প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করেন। তাঁহারই নির্ম্মিত ভদ্রাসন-বাসভূমি, ও তৎসংলগ্ন বহুভূমি লইয়া একটি তালুক সৃষ্ট হয় এবং তাহাই 'ভবানী প্রসাদ দাশ তালুক' নামে ৫০৯ নম্বরে দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে তৌজিভুক্ত হয়। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাৎকালিক প্রথানুসারে বাড়ীর চারিদিকে নানা শ্রেণীর প্রজা বসাইয়া যান।

ধোপা, নাপিত, ভূইমালি নমঃশূদ্র, ও তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ নাপিত, শূদ্র নফর ইত্যাদি সম্পন্ন গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রজা স্থাপন করিয়া সর্ব্বতোভাবে পল্লীরাজ্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার দান শৌণ্ডতা ও প্রতাপশালীতা চারিদিকে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় রাজকিশোর দাশগুপ্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পিতৃত্যক্ত ধন-সম্পদে তাঁহার কোন অভাব ছিল না, সুতরাং অর্থোপার্জ্জনে তিনি কখনও অভিনিবিষ্ট হন নাই, নিতান্ত ধর্ম্মভীরু ও সদাশয় ব্যক্তি বলিয়া তাঁহারও বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার ক্রমান্বয়ে ৩টি পুত্র এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ৺ঈশ্বরচন্দ্র ও সর্ব্বকনিষ্ঠ ৺তারিণীচরণ, অল্প বয়সে পরলোকগত হন। রায় বাহাদুরের পিতা ৺নিমচাঁদ দাশগুপ্ত ও তাঁহার ভগ্নী দুর্গাদেবী পরিণত বয়সে, পুত্র পৌত্রাদি পরিবৃত হইয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন।

নিমচাঁদ দাশগুপ্ত মহাশয় বাখরগঞ্জ জেলার যে তিনজন সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন, তাঁহার অন্যতম। পাদ্রি বেরাক সাহেব যে ইংরাজী বিদ্যালয় বরিশাল সহরে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই স্কুলে গৈলা নিবাসী ৺মহেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বামরাইল নিবাসী ৺মহেশচন্দ্র বসু, ৺নিমচাঁদ দাশগুপ্ত মহাশয় ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন; তৎ-কালীন প্রথানুসারে তাঁহারা পারস্য ভাষাও শিক্ষা করেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রার রায় সাহেব রেবতী মোহন দাশগুপ্তের পিতা ৺মহেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় দীর্ঘকাল ডিষ্ট্রীক্ট জজ সাহেবের হেড ক্লার্কের কাজ করিয়া পরলোকগত হন। ৺মহেশচন্দ্র বসু মহাশয়ও বহুদিন হইল বরিশালে স্পেশাল সবরেজেষ্টারি করিয়া গতাসু হইয়াছেন। ৺নিমচাঁদ দাশগুপ্ত মহাশয় প্রথমে বরিশাল কালেক্টরীতে কেরাণীগিরি, পরে নানাস্থানে পুরাতন পুলিশে নায়েব-দারোগা-গিরি এবং শেষ জীবনে রেজিষ্টারী আফিসে কেরাণী গিরি ও মহাফেজি করিয়া যৎসামান্য পেন্সন লইয়া শেষ জীবনে কাশীবাসী হন এবং তাঁহার ৺কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। ৺নিমচাঁদ দাশগুপ্ত মহাশয় অতীব সরল প্রকৃতির ধর্ম্মভীরু ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তাঁহাকে শেষ জীবনে ঘোরতর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল,তথাপি তিনি কখন দেব-দ্বিজে ভক্তি, দানশীলতা ও সত্যপরায়ণতা পরিত্যাগ করেন নাই।

প্রায় সমস্ত জীবনেই তিনি নিরামিশাষী ও সর্ব্বতোভাবে নিস্পৃহ ছিলেন। তাঁহার সামান্য পেন্সনের টাকা হইতেও, স্বীয় পত্নী ও পুত্র-গণের অজ্ঞাতে অনেক গরীব দুঃখীর সাহায্য করিতেন। রায় বাহাদুরের মাতা বলিয়াছেন—"যেদিন ৺পিতৃদেবের কাশীপ্রাপ্তি ঘটে (১৩০৭ সনের ৬ই আষাঢ়) সেইদিনই তিনি জানিতে পারেন যে, অনেক দুঃখিনী বিধবাকে তিনি কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন,"

কারণ তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়াই সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা প্রকাশ করে। সরিকদিগের সহিত মামলা মোকদ্দমায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন এবং ঋণজালে জড়িত হন। সেকালে অনেকেই কিছু ঘুষ গ্রহণ করা দোষনীয় মনে করিতেন না। ৺ নিমাইচাঁদ দাশগুপ্ত মহাশয়ও প্রথম জীবনে সামান্য 'দস্তুরী' যে না গ্রহণ করিয়াছেন,তাহা নয়। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন যে 'দস্তুরী' গ্রহণ অন্যায় তন্মুহূর্ত্তেই তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সামান্য ২০।৩০ টাকা বেতনে অতি কষ্টেসৃষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ওদিকে তিনি এত অপত্যস্নেহ-পরায়ণ ছিলেন যে রায় বাহাদুরের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাওয়ার সংবাদে আনন্দে অধীর হইয়া প্রায় শত টাকা ধার করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগকে ভোজন করান। অপরদিকেও এতদূর 'সংযমী' ছিলেন যে কখনও তামাক ও পানটুকু পর্য্যন্ত খান নাই। 'রায় বাহাদুর' শিশুকাল হইতেই পিতা-মাতার সঙ্গে নানা স্থানে থাকা হেতু, কখনও কোন গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া করেন নাই। তিনি 'ক,খ' ইত্যাদি বর্ণমালা লিখিতে শিখিবার বহুপূর্ব্বে, 'মার' নিকট বাঙ্গালা পুস্তকাদি পাঠ করিতে শেখেন। তিনি শিশুকালেই অতি সুন্দর সুরে রামায়ণ পাঠ করিতে পারিতেন এবং রামায়ণের (কৃত্তিবাসী) অনেক কবিতাই আবৃত্তি করিতে পারিতেন। শিশুর মুখে মিষ্টি সুরে রামায়ণ গাঁথা, শুনিতে প্রতিবেশিনী পুরমহিলারা মধ্যাহ্নে সমবেত হইতেন এবং পাঠ শুনিয়া প্রীত হইয়া 'শিশু' কি প্রকারে লিখিতে না শিখিয়া, রামায়ণ পাঠ করে, এজন্য বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। তারপর, পিতার সহিত প্রথমে পিরোজপুরে ও পরে মাদারিপুরে মাইনর স্কুলে তাঁহার বাল্যশিক্ষা শেষ হয় এবং মাদারীপুর স্কুল হইতে মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষা দিয়া গবর্ণমেণ্টের ৫৲ পাঁচ টাকা

বৃত্তি পান। তাঁহার জননী পূর্ণিমা দেবী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, এবং সেই কালের অনুষ্ঠেয় নানা শিল্পে ও গুণে ভূষিতা ছিলেন। চিত্র-বিদ্যায় ও অন্যান্য সুকুমার শিল্পে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল, এবং সেই কালের বঙ্গ-কন্যা ও কুলবধূ হইয়াও বেশ বাঙ্গলা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সূপকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। গৃহকর্ম্মে বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। স্বামী বিদেশে বাস করা নিবন্ধন, তাঁহাকেই সকল বিষয়কর্ম্ম দেখিতে হইত, এবং শরিকগণের সহিত বিবাদে ও মামলা মোকদ্দমা পরিচালনে, তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধির বেশ পরিচয় পাওয়া যাইত। অতি বাল্যকালেই কুসংসর্গে পড়িয়া নিবারণ বাবু ধূমপান ও অন্যান্য কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য-ভগ্ন হইয়া পড়ে ও চিররুগ্ন হইয়া উঠেন।

তিনি 'মাইনর' পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া, বরিশাল জিলা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া ৩ বৎসর ঐ স্কুলেই পড়েন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য এতই খারাপ ছিল যে কোন বছরই তিনি বার্ষিক পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তারপরে ভগ্ন স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি তাঁহার কয়েকটি বাল্যবন্ধুর সহিত চুঁচড়ায় গিয়া হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে কয়েকমাস পড়েন। সেখানে সুবিধা না হওয়ায় ফরিদপুর জেলা স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন এবং সেই স্কুল হইতেই পরীক্ষা দিয়া ঢাকা বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া, গবর্ণমেণ্টের ১৫৲ টাকার বৃত্তি ও কয়েকটি পদক পুরস্কার লাভ করেন।

কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য এত খারাপ ছিল যে, পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বেও অনেকে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এফ এ পড়িবার জন্য তিনি কলিকাতা 'জেনারেল এসেম্ব্লিতে' ভর্ত্তি হন। ৺জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ও ৺ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সতীর্থ

ছিলেন। কয়েক মাস পরে, তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হন। তখনকার প্রিন্সিপাল পোপসাহেবের উৎসাহ-বাক্যেই তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া ঢাকা যান এবং যদিও তিনি তৎকালে বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু পিতামাতার আদেশে ও আগ্রহে ফুল্লশ্রী গ্রামের বিখ্যাত মজুমদার পরিবারের ৺অনন্তকুমার সেন মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শশিমুখী গুপ্তার সহিত পরিণয় পাশে আবদ্ধ হন। ইংরেজী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তখনকার এফ-এ পরীক্ষা দিয়া সরকারী ২৫৲ টাকা বৃত্তি পান। বি, এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন এবং সেই বারেই প্রথমে 'সিটি কলেজে' বি, এ ক্লাস খোলা হয় এবং স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের প্ররোচনায় কলেজের অতিরিক্ত ৮৲ টাকা বৃত্তি ও জেনারেল ডিপার্টমেণ্টে 'ফ্রি সিপের' লোভে 'সিটি' কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখানেও বিখ্যাত মনস্বী ও পণ্ডিত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যকে সহাধ্যায়ী-রূপে প্রাপ্ত হন এবং সেখানেই বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিদ্বন্মণ্ডলীর সুপরিচিত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম, এ পাশ করিয়া দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। ডাক্তার শীল, অধ্যাপক জানকী নাথ ভট্টাচার্য্য ও রায় বাহাদুরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সখ্য স্থাপিত হয়। নিবারণ বাবু সেই সময়ে [illegible] পিতার অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন বৃত্তির টাকা বাঁচাইয়া সংসারে [illegible] কিছু কিছু সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বি এ পরীক্ষায় (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ৫০ পঞ্চাশ টাকার ফেলোসিপ দিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়াছিলেন, এবং প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে 'ন্যায়শাস্ত্র' (Logic) ও স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণিত অধ্যাপনার ভার দেন। দৈনিক ২ ঘণ্টা অধ্যাপনার পরও এম, এ পাঠের যথেষ্ট সময় থাকিবে বলিয়াই এই

বন্দোবস্ত হয়। ইতোমধ্যে তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক শীল, নাগপুর মরিস্ কলেজের প্রফেসর হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই কলেজের ইংরাজী-সাহিত্য ও দর্শন পড়াইবার জন্য জনৈক অধ্যাপকের প্রয়োজন হওয়ায় ডাক্তার শীলের অনুরোধে, সেই কলেজের সেক্রেটারী স্যার বি, কে, বসু মহাশয়, নিবারণ বাবুকে ১৫০ দেড়শত টাকা বেতনে ঐ পদে মনোনীত করিয়া 'টেলিগ্রাম' করেন; তিনিও পিতাকে ঋণ-জাল হইতে মুক্ত করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ঐ পদ গ্রহণ করেন এবং এম্, এ, পরীক্ষা দেওয়ার আশা পরিত্যাগ করেন। অধ্যাপক শীল মহাশয় ও নিবারণ বাবু একত্রে নাগপুরে অধ্যয়ন কালেই, ভারতের নানা স্থান যথা বোম্বাই, পুণা, ভোঁসোয়াল, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, 'মার্বেল রক্' প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন, কিন্তু আইন ব্যবসায়ী হওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ না করায়, নিবারণ বাবু সেই মরিস্ কলেজের 'ল' ক্লাসে যোগদান করেন। পরে ডাক্তার শীল উচ্চবেতনে 'বহরমপুর' কলেজে প্রিন্সিপাল হইয়া আসেন এবং দুই বন্ধুর মধ্যে কিছু-দিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু ডাক্তার শীল কিছুদিন পরে নিবারণ বাবুকে বহরমপুর কলেজে 'অধ্যাপক' করিয়া আনেন, এবং শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য্যও সেখানে অধ্যাপক হন; আবার তিন বন্ধুর সম্মিলন ঘটে।

বহরমপুর কলেজে থাকিতে থাকিতেই নিবারণ বাবু, এম্ এ ও বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে বরিশালে ওকালতী করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজের কাজ পরিত্যাগ করিয়া, বরিশালের অধুনালুপ্ত 'রাজচন্দ্র' কলেজের আইন অধ্যাপক হন এবং ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। এখানেই তাঁহার শিক্ষক জীবনের শেষ হয়। তিনি ব্যবহারজীবী হইয়া নানাপ্রকার

সাধারণ হিতকর কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হন। ওকালতীতে ক্রমশঃ তাঁহার আয়বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ করেন।

ইনি চিরকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন এবং চিররুগ্ন বলিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন। যাঁহারা বাল্যকাল হইতে স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত, তাঁহারা প্রায়শঃই স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন এবং ক্রমশঃ অধিকতর রুগ্ন হন। হীন-স্বাস্থ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করায় ইনি ক্রমশঃই হীন-বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। বরিশালের প্রায় সমস্ত সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহিতই ইনি চিরসংশ্লিষ্ট। লোকালবোর্ড ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য, লোকালবোর্ডের ভাইস্‌চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান, ডিস্পেন্সারি কমিটির সম্পাদক ও পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক ইত্যাদি ও অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপে অনেক দিন নানাকার্য্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কংগ্রেসের সহিত ইঁহার ১৯২০ সনের পূর্ব্বে পূর্ব্বাপরই যোগ ছিল, এবং প্রথম লাহোর কংগ্রেসে ও অন্যান্য স্থানে প্রতিনিধি স্বরূপে গমন করিয়াছেন এবং কংগ্রেস মণ্ডপে বক্তৃতাও করিয়াছেন, স্থানীয় "পিপলস্" এসোসিয়েশন্, কংগ্রেস কমিটি, ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন্ প্রভৃতির সহিতও ইঁহার যোগ ছিল।

১৯২০ সনে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রতিনিধি ও সম্বর্দ্ধনা কমিটির (Reception Committee) সভ্য স্বরূপে তিনি উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন যে সে কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধির মত ভিন্ন অন্য কোন মতের প্রতিষ্ঠা বা আলোচনা অসম্ভব এবং বিশেষতঃ স্কুল কলেজ, আইন আদালত শাসনের যন্ত্র, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আইন সভা ইত্যাদি সর্ব্বত্রই বর্জ্জন-নীতি (Boycott) পরিগৃহীত হইবে, তখনই

বিরক্ত হইয়া ২ দিন পরে চলিয়া আসেন এবং কংগ্রেসের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি পূর্ব্বাপর সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, ভূপেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ প্রভৃতির মতাবলম্বী ছিলেন এবং অনেক বিষয়ে মতিলাল ও "অমৃতবাজারের" মতেরও অনুসরণ করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের একটী কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমবারে যখন লোকমান্য তিলকের বিরুদ্ধে 'কেশরী' পত্রিকায় রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য গবর্ণমেণ্ট মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তখন নিবারণ বাবুই সর্ব্বপ্রথমে বড় বড় কৌন্সিলি দ্বারা তিলক পক্ষ সমর্থন জন্য, অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব ও চেষ্টা করেন। এজন্য মতিবাবুর সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়। তিনি বরিশাল হইতে প্রায় ৫০০্ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠান। তাঁহার ইচ্ছা ছিল অমিত তেজা, সিংহ-বিক্রম বৃদ্ধ জ্যাকসন ও গার্থ সাহেব দ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করান হয়, কিন্তু জ্যাকসন সাহেবকে না পাওয়ায় পিউ ও গার্থ সাহেব বোম্বে যাইয়া তিলকের পক্ষ সমর্থন করেন। লোকমান্য তিলকের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে বরিশালে 'রাজা বাহাদুরের' হাবেলিতে যে বিরাট শোকসভা হয়, তাহাতে তিনি পীড়িত থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন এবং তদুপলক্ষে তিনি এতদূর উত্তেজিত হন যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব তাঁহার নিকট ছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি পরে কেন কি অনর্থ না ঘটান! তিনি পূর্ব্বাবধিই বর্ত্তমান রাজনৈতিক সংস্কারের (Reforms) পক্ষপাতী ছিলেন এবং 'সংস্কৃত' আইন সভায় প্রবেশের উদ্যোগ করেন। তদুপলক্ষে ও অন্যান্য কারণে স্থানীয় অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে, তিনি বহু আয়াসে ও বহু অর্থব্যয়ে বাখরগঞ্জের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও

নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়া বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। বিগত যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালী সৈন্য ও অর্থসংগ্রহে অনেক আয়াস স্বীকার করেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এক সার্টিফিকেট অব্ অনার প্রদান করেন। অনেক নিন্দুকেরা তাঁহাকে "সাহেব ঘেঁসা" বলিয়া সাধারণের চোখে 'হেয়' করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কখনও 'সাহেব ঘেষা' নন, তবে যদি কোন রাজপুরুষ, তাঁহার মতের পোষকতা করেন, কি সাহিত্যচর্চ্চার জন্য তৎপ্রতি শ্রদ্ধা পরায়ণ হন্, তবে তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই, উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী সাহেব-দিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার গুণগ্রাহী আছেন।

ওকালতী আরম্ভ করিয়াও শিক্ষা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তিনি সাহিত্য চর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই, অবসর সময় তিনি গ্রন্থাদি পাঠেই নিয়োগ করেন। ইংরেজী ও বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রে নানা সময়ে নানা প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন এবং বর্ত্তমানে 'মুমুর্ষু' বরিশালে শাখা সাহিত্যপরিষদ তাঁহার ও শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর উৎসাহেই প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঐ পরিষদে তিনি সময়ে সময়ে প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছেন, এবং অদ্যাবধি তাহার সভাপতি রহিয়াছেন। তল্লিখিত অনেক প্রবন্ধ একত্রে পুস্তকাকারে "চিন্তালহরী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই গ্রন্থ বহু মনস্বী কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার বহুল প্রচারের জন্য যে আয়াস ও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন তদভাবে গ্রন্থখানি সাধারণ্যে আশানুরূপ পরিচিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও ২।৩ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আইন ব্যবসায়ীর পক্ষে সাহিত্যচর্চ্চা যে কতদূর সম্ভব, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার সাহিত্যা-নুরাগ ব্যবসায়ের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি অনেক ক্ষোভও প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্যানুরাগই তাঁহার জীবনের প্রথম

অনুরাগ। শিক্ষাবিভাগের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া এবং সাহিত্যচর্চ্চার পরিপন্থী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তিনি অনেক সময়ই অনুতপ্ত।

বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহাদের সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক মতের অধিকাংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, হিন্দুর ক্রিয়াকলাপে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না, তজ্জন্য সমাজে নিগ্রহও সময়ে সময়ে ভোগ করিতে হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে করিতে তিনি ক্রমশঃ হিন্দুশাস্ত্রের ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন, এবং হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ না করিয়া, তাহা সংস্কৃত করিতে যত্নবান্ হন। তিনি সমুদ্র যাত্রা নিষেধ, জাতিবিদ্বেষের অস্পৃশ্যতা, কন্যা ও বরপণ গ্রহণাদির কখনও সমর্থন করেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ যতীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাগত হইলে, বন্ধুবান্ধবদিগের সাহায্যে ও বহু অর্থব্যয়ে তিনি যতীন্দ্রকে সাদরে সমাজে ও পরিবারে গ্রহণ করেন, এবং তন্নিবন্ধন যৎসামান্য সামাজিক নিগ্রহও ভোগ করেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দ্বারা একটা বিশেষ সংস্কার সাধন হইবে বলিয়া তিনি কোন আন্দোলন ও নির্য্যাতনে ভীত হন নাই। এই দৃষ্টান্তে তাঁহার স্বগ্রাম হইতেই আরো তিনজন যুবক বিলাত গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোনই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু সমাজের অনেক লোক তদবধি বিলাত অনায়াসে গমন করিয়াছেন, কায়স্থগণও তাঁহাদের পন্থা অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত 'যতীন' অর্থাৎ রায় বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জে, কে, দাশ গুপ্ত 'গ্লাসগো' বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লইয়া এদেশের অন্যান্য স্থানে কার্য্য করিয়া সম্প্রতি পাবনায় ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার তিনটী ভগ্নি; ২টি বালবিধবা, একমাত্র সধো-

জিনী দেবী তাহার পতি-পুত্র-কন্যা ও পৌত্র দৌহিত্রসহ বাস করিতেছেন। নিবারণ বাবুর ২টি পুত্র ও ৩টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র সুরেন্দ্র ও দ্বিতীয়া কন্যা নির্ম্মলা অকালে দুরন্ত কলেরারোগে পিতামাতাকে কাঁদাইয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বি এ, ও কন্যা শ্রীমতী চপলা-বালা সেনজায়া ও শ্রীমতী কিরণবালা গুপ্তা বর্ত্তমান আছেন। নরেন্দ্রনাথ সব্‌ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতেছেন। শ্রীমতী চপলাবালার স্বামী শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র সেন চাঁদপুরে মুন্সেফি কার্য্যে ও শ্রীমতী কিরণবালার স্বামী শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এল্, ওকালতী কার্য্যে লিপ্ত আছেন।

ইংরেজী নববর্ষে (১৯২২) গবর্ণর জেনারেল্ ও রাজ প্রতিনিধি, নিবারণ বাবুকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে বিভূষিত করেন এবং বিগত ২রা আগষ্ট ঢাকা নগরে এক প্রকাশ্য দরবারে বঙ্গের গবর্ণর লর্ড লিটন তাঁহাকে সনন্দ ও পদক প্রদান উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া রায় বাহাদুরের এই ক্ষুদ্র জীবনী ও বংশ পরিচয়ের উপসংহার করিলাম :—

"আপনি পূর্ব্বাপর বরিশালের সর্ব্ববিধ সাধারণের হিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের এবং কাউন্সিলের কার্য্যে যথেষ্ট কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও আপনি সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে, যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর আপনাকে এই সম্মানে ও উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যখন বেঙ্গল কাউন্সিলে ছিলেন তখন আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর শ্রীযুক্ত অনারেবল্ স্যার জন্ কার সাহেব তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, সারল্য ও ক্ষমতায়, তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন, এবং

রায় বাহাদুরকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন এবং তদবধি তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে পত্র ব্যবহারও চলে। বিগত "শারদীয় সফরে" যখন বাংলার একটিং গবর্ণর স্বরূপে, স্যার জন্ কার বরিশালে পদার্পণ করেন, তখন রায় বাহাদুর পীড়িত ছিলেন, সে সংবাদে, কার সাহেব, প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ কোন রাজ প্রতিনিধি কাহারও গৃহে পদার্পণ করেন্ না) রায় বাহাদুরকে দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে গমন করেন। তদুপলক্ষে, রায় বাহাদুরের গৃহ সম্পূর্ণ স্বদেশী ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং হুলু ও শঙ্খধ্বনি সহকারে এই প্রখ্যাত অভ্যাগতের অভিবাদন করা হইয়াছিল। একদিকে ইহার দ্বারা যেমন শ্রীযুক্ত স্যার জন্ কারের সদাশয়তা প্রকাশ হইয়াছিল, অপরদিকে, রায় বাহাদুর কে উচ্চ রাজ কর্মচারীরা যে কত দূর স্নেহের চক্ষে দেখেন তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

[রায় বাহাদুরের বংশ-তালিকা ।]

৺ভবানী প্রসাদ দাশ গুপ্ত।

|

৺রাজ কিশোর দাশ গুপ্ত।

|

৺নিমচাঁদ দাশ গুপ্ত।

|

প্রথমা কন্যা	প্রথম পুত্র	দ্বিতীয়া কন্যা	দ্বিতীয় পুত্র	তৃতীয়া কন্যা
শ্রীআদর মণি গুপ্তা (বিধবা)	রায় শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাশ গুপ্ত বাহাদুর এম, এ,বি,এল, পত্নী শ্রীমতীশশীমুখী গুপ্তা	শ্রীমতী সরোজিনী সেন, পতি শ্রীললিত কুমার সেন বি, এ,	শ্রীমান যতীন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত বি এস্‌সি, (গ্লাস্‌গো) এ,এম, আই,সি,ই (লণ্ডন) ইত্যাদি	শ্রীমতী মণিতারা গুপ্তা (বিধবা)

- প্রথমা কন্যা
  - শ্রীমতী চপলা বালা সেন পতি শ্রীরমেশ চন্দ্র সেন বি, এল্, মুন্সেফ।
    - কন্যা
      - শ্রীমতীসরোজ বালা সেন। (জন্ম ১১ই পৌষ ১৩০৭)
- দ্বিতীয়া কন্যা
  - ৺নির্ম্মলা বালা গুপ্ত পতি শ্রীআশুতোষ গুপ্ত
    - কন্যা
      - শ্রীমতী স্নেহলতা গুপ্তা।
- প্রথম পুত্র
  - ৺সুরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত (মৃত্যু ১লা এপ্রেল ১৯০০ খৃঃ)
- তৃতীয়া কন্যা
  - শ্রীমতী কিরণ বালা গুপ্ত, পতি শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এম্ বি এল্,
    - কন্যা
      - শ্রীমতীঅমিয়া বালা সেন
    - পুত্র
      - শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত
    - শিশুকন্যাদ্বয়
      - বীণা ও কমলা
- দ্বিতীয় পুত্র
  - শ্রীমান নরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত সব্ ডেপুটি কালেক্টর পত্নী শ্রীমতীসুনীতি বালা গুপ্তা।
    - প্রথম পুত্র
      - শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত (নষ্ট)
    - কন্যা
      - মীনারাণী
    - দ্বিতীয় পুত্র
      - ঝুণ্টু

বহড়ুর বসু বংশ।

জেলা ২৪পরগণার অন্তর্গত ও কলিকাতা হইতে ১২ মাইল [illegible] অবস্থিত বহড়ু গ্রামের বসু বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ। ইহারা মাহিনগরের বসু এবং পরে ময়দা নামক গ্রামে বাস করিতেন। সম্ভবতঃ ১১৫৪ সালে তাঁহারা ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতীয় লোকদিগকে আনয়ন করিয়া নিকটবর্ত্তী বহড়ু গ্রাম স্থাপন করেন। দেওয়ান নন্দকুমার বসু কর্ত্তৃক এই বংশের জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন সঙ্গী বঙ্গদেশে আইসেন, তাঁহাদের মধ্যে দশরথ বসু হইতে নন্দকুমার ২৩ পর্য্যায়ের ছিলেন। তিনি প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মণ্ডল ঘাটের কুঠিতে কর্ম্মগ্রহণ করেন, পরে কাশীমবাজারের রেশমের কুঠির ও পাটনার কুঠির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি পাটনায় কুঠির আয় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহাকে বহু অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দিয়াছেন।। পরে তিনি কলিকাতার কাষ্টম হাউসের দেওয়ান হয়েন। নানাস্থানে দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি দেওয়ান নন্দকুমার [illegible] ইংরাজ সমাজে তিনি এরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন যে কলিকাতার Colvin & Cowie কোম্পানীর অধ্যক্ষ ভূতপূর্ব্ব লেফটেনান্ট গভর্ণর সার অকল্যাণ্ড কলভিনের পিতামহ মিষ্টার এ, কলভিন এক সময়ে তাঁহার তীর্থযাত্রাকালে নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছিলেন :—

"Nand kumar Bose goes to Benares and Muttra on a religious pilgrimage. He is a most respectable man. I give him this note to request that he may receive aid and protection in case circumstances should render it necessary, to a moderate amount, say to the extent of Rs. 5000 for which I shall be honour paid to his bills or for any sum he may draw within that sum, say Rs. 5000 the same being endorsed on this."

নন্দকুমার পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া তথাকার মদনমোহন, গোপীনাথ ও গোবিন্দজী ঠাকুরত্রয়ের মন্দিরের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হয়েন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে এক সময়ে জয়পুরের মহারাজা নন্দকুমারের কোন কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু নন্দকুমার অর্থ গ্রহণ না করিয়া ঐ তিনটি মন্দির নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং মহারাজও তাঁহার সেই মহানুভবতা দেখিয়া সানন্দে সেই অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি ঐ তিন মন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমান তিন মন্দির তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। তদ্ব্যতীত বৃন্দাবনে তিনি নিজেরও একটি বৃহৎ প্রস্তরের কুঞ্জ-বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই কুঞ্জবাটীকে হাড়াবাড়ী কুঞ্জ বলে। বহড়ুর বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ৺শ্যামসুন্দর ঠাকুরের জন্য তিনি চুণার হইতে প্রস্তর আনয়ন করিয়া সুনিপুণ ভাস্কর দ্বারা এক সুন্দর মন্দির প্রস্তুত করেন। ইহার গাত্রে ভগবানের বিচিত্র লীলার তৈলচিত্র অঙ্কিত আছে। এইরূপ মনোহর শিল্পকার্য্য-সম্পন্ন প্রস্তর রচিত দেবালয় কেবল ২৪ পরগণায় কেন, বাঙ্গালার অন্য

কোন স্থানে আছে কি না সন্দেহ। ১২৩২ সালের ২রা আশ্বিন তারিখের দান পত্রদ্বারা তিনি ২৪ পরগণা স্থিত কতকগুলি বহুমূল্য জমিদারী ৺শ্যামসুন্দর ঠাকুরকে এবং বৃন্দাবন ও মথুরাস্থিত সম্পত্তি ৺রাধাগোবিন্দ ঠাকুরকে নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। অদ্যাবধি ঐ সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র পর্ব্বাদি ও দুর্গাপূজাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১২৩৭ সালের চৈত্র মাসে তিনি সংসারের মায়া কাটাইয়া বৃন্দাবনবাসী হয়েন। তথায় ১২৪১ সালের ২৩এ পৌষ তারিখে আনুমানিক ৮২ বৎসর বয়সে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া নন্দকুমার সেই পুণ্যধামে প্রয়াণ করেন, যথায় বৃন্দাবনেশ্বর নন্দকুমার চির বিরাজিত আছেন। তিনি প্রকৃতই এক ত্যাগী, ধার্ম্মিক ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর প্রায় শতাব্দী অতীত হইতে যায়, কিন্তু তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম এ পর্যান্ত বৃন্দাবন অঞ্চলে ও ব্রজদেশে অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই বাক্য দেওয়ান নন্দকুমারে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য।

নন্দকুমারের চারি পুত্র ছিলেন। রামধন, গোবিন্দপ্রসাদ, বৈদ্যনাথ ও রাজকৃষ্ণ। প্রথম তিন পুত্র কোম্পানীর নানাস্থানে কেহ বা কোষাধ্যক্ষ কেহ বা দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। রামধনের দুই পুত্র—গোলকনাথ ও মথুরানাথ। উভয়েই অপুত্রক ছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ ও রাজকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন। বৈদ্যনাথের তিন পুত্র—শ্রীনাথ, কৃষ্ণনাথ ও হরিনাথ। শেষোক্ত দুই পুত্র অল্পবয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

শ্রীনাথ বসু ১২২৩ সালের ৩রা আশ্বিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুপুরুষ, সঙ্গীতজ্ঞ ও নানাভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণকে আনুকূল্যদানে, অতিথি সেবায় ও দরিদ্র পালনে তিনি মুক্তহস্ত

ছিলেন। ৺রাসযাত্রার সময় বহু দেশ বিদেশ হইতে সমাগত অধ্যাপক-মণ্ডলীকে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত করিতেন। তিনি নিজে যেরূপ বিদ্বান ছিলেন সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী ও ছিলেন। ১৮৫৬ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখে তিনি নিজগ্রামে একটি উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইহার উন্নতির জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের তদানীন্তন ইন্স্পেক্টার উড্রোসাহেব (Mr. H. Woodrow) এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া শ্রীনাথকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে নিম্নে কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত হইল :—

'Your liberality is well bestowed and your school an immense benefit to the people of the locality. How great the benefit is will only be shown after lapse of years when some of the pupils, who are now receiving good education by your generosity, will. by virtue of that education, rise to high preferments under Government."

উড্রো সাহেবের এই ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থই সফল হইয়াছে। তিনি এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে শ্রীনাথের "শ্রীবাগান" নামক উদ্যানে তিনি নিজে রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া একটী Sundial (সূর্য্যঘড়ি) নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শ্রীনাথ এক তেজস্বী ও আদর্শ জমিদার এবং সকল বিষয়েই সমাজের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার এরূপ সুশাসন ছিল যে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা বিশেষ গুরুতর না হইলে কচিৎ আদালতে উপস্থিত হইত। ইংরাজী বিদ্যালয় ব্যতীত তিনি এক বাঙ্গালা বিদ্যালয়, পাঠশালা ও

চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার দয়া, দান, ঔদার্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণে আপামরসাধারণ মুগ্ধ ছিল। ১২৯০ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

শ্রীনাথের চারি পুত্র। যদুনাথ, মহেন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠ নাথ, এবং দেবেন্দ্রনাথ। যদুনাথ ২৪ পরগণার রোডসেস্ ও এডুকেশন কমিটির মেম্বর ও মেদিনীপুরের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় ও আইনে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। ইঁহার জন্ম ১২৪৩ সাল ২৩ এ আষাঢ় ও মৃত্যু ১৩১২ সাল ৭ই আশ্বিন তারিখে হয়। মহেন্দ্রনাথ বারুই-পুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার বিনয়নম্র প্রকৃতি ও প্রীতিসুলভ সরলতাগুণে লোক তাহাকে 'মনিবাবু'বলিয়া সমাদৃত করিত। ইঁহার জন্ম ১২৫৪ সাল ১লা আষাঢ় ও মৃত্যু ১৩২২ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে হয়।

বৈকুণ্ঠনাথ ১২৬০ সালের ১১ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথির দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় তাঁহার পিতামাতা তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠনাথ রাখিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে কলি-কাতায় টাকশালের নায়েব দেওয়ান, পরে কারেন্সি আফিসের ডেপুটি ট্রেজারার এবং অবশেষে টাঁকশালের দেওয়ান (Bullion keeper) হয়েন। এই দেওয়ানী পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি অনেককে কাজকর্ম্ম দিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি এবং তৎসঙ্গে তরবারি ও শির-পাঁচ খিলাত স্বরূপ প্রদান করেন। ইনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং নানাবিধ যন্ত্রবাদনে ও সঙ্গীতের স্বরযোজনায় তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় তিনি পুস্তক ও নাট্যাভিনয় সমালোচনা

কার্য্যে বহুকাল লিপ্ত ছিলেন। নিজেও 'নাট্যবিকার,' 'পৌরাণিক পঞ্চরং,' 'মান,' 'রামপ্রসাদ' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া ছিলেন। তিনি কলিকাতা ও শিয়ালদহের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও আলিপুর, প্রেসিডেন্সী ও জুভিনাইল জেলের পরিদর্শক ছিলেন এবং কলিকাতার অনেক সভা, পুস্তকালয় ও বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার নানাবিধ গুণে তিনি সকলের নিকটেই সমাদৃত ও সম্মানিত হইতেন। ১৩২৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর প্রভৃতি বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্মৃতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

১২৬৯ সালের ২২ এ চৈত্র পূর্ণিমার মধুযামিনীতে দেবেন্দ্রনাথ "পূর্ণচন্দ্র" রূপে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইনি অষ্টম গর্ভের সন্তান। ইনি পাঠ্যাবস্থায় বহড় বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও তদন্তর্গত এক পুস্তকালয় স্থাপন করেন। প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের কমিশনার মিষ্টার এ, স্মিথ সাহেব এই পুস্তকালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ইনি নিরহঙ্কার ও সর্ব্বদা পরোপকারে যত্নবান ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায়সাহেব" উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার কার্য্যকুশলতার প্রীতি প্রদর্শন করেন। ঐ সালের ২৭এ নভেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট হাউসে যে দরবার হয়, সেই দরবারে বঙ্গের গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে তাঁহাকে নিম্নলিখিত ভাবে সম্বোধন করেন—

"You recently retired after thirty four years of excellent service in the Secretariat, where you have won consistent reputation for trustworthiness and capability"

রায় সাহেব দেবেন্দ্র নাথ বসু।

তাঁহার কলিকাতা বাটীতে যে Students' Club প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই Club কর্ত্তৃক তাঁহার মান্যার্থে এক বিদায়-সভা আহূত হয়। সেই সভায় বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের দুইজন আণ্ডার সেক্রেটারী (Messrs, N. G. A. Edgley and J. D. V. Hodge) ও বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী (জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি) উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মানিত করেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণান্তর ইনি স্বগ্রামে বাস করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। নিজগ্রামের কিম্বা অন্যগ্রামের ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তাহার মীমাংসার জন্য ইঁহাকে অনেক সময় অতিবাহিত করিতে হয়। ইঁহার রাশিনাম "প্রিয়নাথ"। বাস্তবিকই ইনি প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী ও সকলেরই প্রিয়পাত্র। যে কেহ ইঁহার সহিত আলাপ করেন, তিনি ইঁহার আপ্যায়ন ও সুমিষ্ট ব্যবহারে প্রীত হইয়া ইঁহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইনি পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বহড়ুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট এবং প্রপিতামহ প্রদত্ত বৃন্দাবনধামের ও বহড়ুর বিস্তৃত দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইত স্বরূপে দেবসেবাদি নির্ব্বাহ করিয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীনাথের চারি পুত্রের বংশাবলী।

যদুনাথের পুত্র—ভূপেন্দ্র, ভবেন্দ্র (আলীপুর জজ কোর্টের উকিল) ও ৺ গোপেন্দ্র।

ভবেন্দ্রের পুত্র—শৈলেন্দ্র। ৺গোপেন্দ্রের পুত্র—জহরেন্দ্র

মহেন্দ্রনাথের পুত্র—৺খগেন্দ্র, উমানাথ, রজনীকান্ত ও চারুচন্দ্র।

খগেন্দ্রের পুত্র—রমেন্দ্র ও রণেন্দ্র। উমানাথের পুত্র—রবীন্দ্র ও রথীন্দ্র। রজনীকান্তের পুত্র—সলিল ও বিজলী। চারুচন্দ্রের পুত্র—অজিত।

বৈকুণ্ঠনাথের পুত্র—জানকী, নৃপেন্দ্র, ৺ঘনেন্দ্র ও ৺মনীন্দ্র।

জানকীর পুত্র—শচীন্দ্র (বিলাসপুরের উকীল)।

নৃপেন্দ্রের পুত্র—মানবেন্দ্র।

দেবেন্দ্রনাথের পুত্র—বিজয়েন্দ্র ও সুজয়েন্দ্র।

বিজয়েন্দ্রের পুত্র—বিনয়েন্দ্র।

সুজয়েন্দ্রের পুত্র—জগদীন্দ্র ও অজয়েন্দ্র।

"বসুবংশ দাতা" এই চলিত কথার প্রমাণ বহড় বসু বংশে পাওয়া যায়। ইঁহারা নানা স্থানে দেবালয়, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্ম্মাণ এবং খাল ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অনেক দেশহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি (Contai) মহকুমায় এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। অদ্যাপিও লোকে তাহাকে "নন্দকুমার পুষ্করিণী" (Nund kumar Tank) কহে। মেজর স্মাইথ (Major Smyth) তাঁহার ২৪ পরগণার (Geographical Report) বিবরণীতে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—"The Katta khal was cut by the grand-father of the present Zamindar, Srinath Bose, who also built a Pucca bridge over it on the Kulpi Road. The bridge has nine arches and is a good specimen of native architecture as well as of the brick and cement used in former days."

এই বসুবংশ যেরূপ প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী তদনুরূপ বংশের সহিত ইঁহাদের নিকট সম্বন্ধ আছে। যথা—

১। কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশ—(ক) রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেববাহাদুরের সহিত বৈদ্যনাথ বসুর কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হয়। তাঁহার পুত্র কুমার গিরীন্দ্র নারায়ণ

(খ) মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রপৌত্রীর সহিত দেবেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র সুজয়েন্দ্র নাথের বিবাহ হয়।

২। কলিকাতা রামবাগান দত্তবংশ—(ক) রসময় দত্তের পুত্র কলিকাতার ডেপুটি কালেক্টর কৈলাশচন্দ্র দত্তের সহিত বৈদ্যনাথ বসুর প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) ইঁহার পুত্র।

(খ) কলিকাতা টাঁকশালের দেওয়ান রায় হেমচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের প্রথমা কন্যার সহিত বৈকুণ্ঠ নাথ বসুর বিবাহ হয়।

দর্জ্জিপাড়া মিত্রবংশ—(ক) রাজকৃষ্ণ মিত্রের বংশে মথুরা নাথ বসুর কন্যার এবং (খ) লালচাঁদ মিত্রের পৌত্র মোহন লালের সহিত দেবেন্দ্রনাথ বসুর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়।

হাটখোলার দত্তবংশ—(ক) এই বংশ শ্রীনাথ বসুর মাতুল বংশ।

(খ) নগেন্দ্র নারায়ণ দত্তের পুত্র খগেন্দ্র নারায়ণের সহিত দেবেন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয়া কন্যার বিবাহ হয়।

বহুবাজার দাস বংশ—কলিকাতার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাসের পৌত্র ফণীন্দ্র নাথের সহিত দেবেন্দ্র নাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়।

৬। যশোহর নড়াইল রায় জমিদার বংশ—উমেশচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত দেবেন্দ্র নাথ বসুর বিবাহ হয়। ইনি রায়বাহাদুর কিরণ চন্দ্র রায়ের ভগ্নী ছিলেন।

৭। ২৪ পরগণা আড়বেলিয়া নাগ জমিদার বংশ—রাজমোহন নাগের কন্যার সহিত মহেন্দ্র নাথ বসুর বিবাহ হয়।

৮। " খড়দহের বিশ্বাস জমিদার বংশ—তারকনাথের সহিত শ্রীনাথ বসুর প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়।

৯। " বারুইপুর রায় চৌধুরী জমিদার বংশ—(ক) যোগেন্দ্র কুমারের সহিত শ্রীনাথ বসুর কনিষ্ঠা কন্যার ও (খ) বিপ্রেন্দ্র কুমারের কন্যার সহিত বৈকুণ্ঠনাথ বসুর পুত্র মণীন্দ্র নাথের বিবাহ হয়।

১০। ২৪ পরগণা মজিলপুর দত্ত জমীদার বংশ—(ক) বিপিন কৃষ্ণের সহিত যদুনাথ বসুর কন্যার, ও (খ) সুরেন্দ্র নাথের কন্যার সহিত উক্ত বসুর পুত্র ভবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়।

গোস্বামীমালিপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশ

ন্যূনাধিক ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তঃপাতি গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামে উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ কতকাল হইতে ঐ স্থানে বাস করিতেছেন তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে যে তাঁহারা বহু প্রাচীন বংশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ধনিয়াখালির সন্নিকটস্থ মালাবাঁধি গ্রামে ও তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডারহাটীতে ইঁহাদের জ্ঞাতিদের বাস পরে হইয়াছিল বটে, কিন্তু মূল বংশ গোস্বামীমালিপাড়াতেই থাকিয়া যান। তাঁহাদের বৃত্তান্ত "বংশ পরিচয়ে" সন্নিবেশিত হইল।

উমেশচন্দ্রের সময়েই সমৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ সোপান আরোহণের সৌভাগ্য লাভ হয়। তিনি আজিকালিকার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারী না হইয়াও স্বীয় অধ্যাবসায়ের বলে অতুল ধন ও অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি আস্থা দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিরীশচন্দ্র, বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত করেন। তখনকার দিনে ষ্টিভডোর বা জাহাজের বেনিয়ানী কার্য্য, যাহাকে চলিত ভাষায় "কাপ্তেনি" বলিত, বড়ই লাভ জনক ব্যবসা ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীও বড় অধিক ছিলনা। এই ব্যবসায় হইতেই উমেশচন্দ্রের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। পরে ক্রমে ক্রমে তিনি নানারকম ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। মানভূমে কয়লার খনি খরিদ করিয়া নিজে খাদ চালাইতে থাকেন, বীরভূমে রেশমের কুঠী, কলিকাতার উপকণ্ঠে

ময়দার কল, তেলের কল, পাটের ব্যবসায় প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং জমীদারি ও বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। কলিকাতায় ২৫।৩০ খানি বাটী ও বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলাতে জমীদারি ও প্রধান প্রধান নগরে বাটী ক্রয় করিয়া গিয়াছেন।

স্বগ্রামে প্রতিবৎসর অত্যন্ত ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসব সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু পূজার এই বিশেষত্ব ছিল যে অন্যান্য ব্যাপারের সহিত প্রায় ২।৩ হাজার ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান ও ৪।৫ হাজার কাঙ্গালী বিদায় হইত; কলিকাতার বাটীতেও খুব ধুমধামের সহিত কার্ত্তিকপূজা করিতেন।

নিজগ্রামে কৃষ্ণসাগর, ময়রা পুষ্করিণী প্রভৃতি সুবৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া সাধারণের জলকষ্ট দূর করেন। টোলবাটী স্থাপন, প্রাচীন দেব মন্দির সংস্কার, ব্রাহ্মণকে ভূমি দান প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্য স্বগ্রামে ও নিজ অধিকারস্থ জমীদারির সীমানার মধ্যে করিয়া যান।

পূর্ব্বে যখন বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে নির্ম্মিত হয় নাই তখন হুগলী হইতে ৫ ক্রোশ ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া গোস্বামীমালিপাড়ায় আসিতে হইত। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া সেঁয়ে গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়া আর গাড়ি চলাচলের রাস্তা ছিল না। সে কারণ তিনি সেঁয়ে হইতে গোস্বামীমালিপাড়া পর্য্যন্ত এক সুপ্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করাইয়া যাতায়াতের কষ্ট দূর করেন। উক্ত রাস্তার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিরীশ-চন্দ্রের নামানুসারে গিরীশ মুখার্জ্জী রোড বলিয়া নামকরণ হয়।

তিনি ক্রমান্বয়ে ৩টী বিবাহ করেন। তৃতীয় বিবাহ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মহিষডাঙ্গা গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ৺ স্বর্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়। এই স্ত্রীর গর্ভজ পুত্র নৃসিংহ প্রসাদই তাঁহার

একমাত্র বংশধর। নৃসিংহ প্রসাদ তাঁহার পিতার সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হইয়া দান ধ্যানাদি ব্যাপারে পিতৃপদাঙ্কানুসরণ করিয়া পিতৃকীর্ত্তি সংরক্ষণে সতত মনোযোগী। ইঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৪২ বৎসর। ইঁহার দুই পুত্র শ্রীমান কার্ত্তিকচন্দ্র ও কীর্ত্তিচন্দ্র, উভয়েই নাবালক। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইলে নৃসিংহ প্রসাদই প্রথম প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন ও দক্ষতার সহিত উক্ত কার্য্য সম্পাদন করেন।

উমেশচন্দ্র ৫০ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে কলিকাতার বাটীতে অকস্মাৎ কয়দিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে স্বগ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী হাসপাতাল স্থাপন করিতেন। সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন হইয়াও তাঁহার হঠাৎ স্বর্গলাভ হওয়ায় উক্ত কার্য্যগুলি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

বংশ-তালিকা।
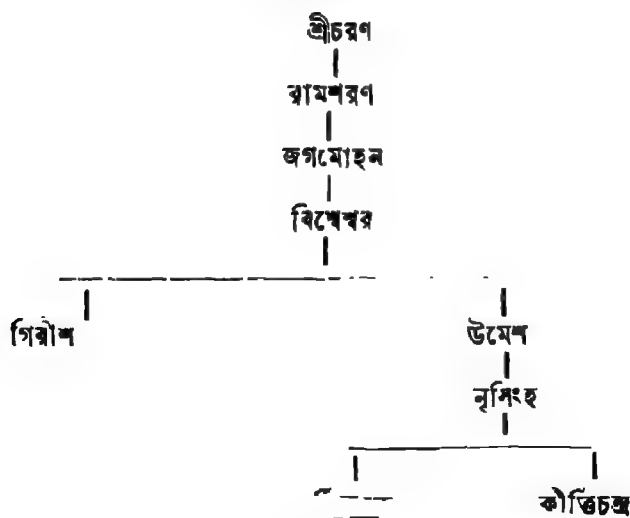
রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুর।

নোয়াখালির প্রসিদ্ধ জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুরের বাসস্থান হরিনারায়ণপুরে। এই গ্রাম নোয়াখালি সহরের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের রেলওয়ে ষ্টেশন রায় বাহাদুরের উদ্যমে ও অর্থব্যয়ে খোলা হইয়াছে।

তাঁহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণ কান্ত দত্ত। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্ব হইতেই তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল উক্ত পদে কার্য্য করার পর চট্টগ্রামে থাকিতে থাকিতে তিনি পেনসন লয়েন।

রায় বাহাদুরের বয়স যখন ১৯।২০, সেই সময় হইতেই তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে লিপ্ত আছেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে যখন জমিদারীর ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়িল তখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালিতে এক প্রবল ঝটিকা হয়। ঐ বৎসর বাঙ্গালার তদানীন্তন লাট স্যর রিচার্ড টেম্পল নোয়াখালিতে যায়েন। তিনি এই তরুণ যুবকের গুণাবলী সন্দর্শনে এত প্রীত হইয়াছিলেন যে রাজকুমার অল্প বয়স্ক হইলেও তিনি তাঁহাকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া আইসেন। সেই হইতেই এ যাবৎকাল তিনি উক্ত পদে অধিরূঢ় থাকিয়া দেশের ও দশের উপকার সাধন করিতেছেন। সাধারণের হিতার্থে তাঁহার দানে ও নিরপেক্ষ সুবিচারে মুগ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সার্টিফিকেট অব [illegible]

রায় রাজকুমার দত্ত বাহাদুর

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন বিধিবদ্ধ হয়। ঐ বিধি অনুসারে নোয়াখালিতে জিলা বোর্ড স্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উক্ত বোর্ডের অন্যতম সদস্য মনোনীত করেন। সেই হইতে তিনি উক্ত বোর্ডের সদস্যপদে ব্রতী থাকিয়া দেশের হিতকর কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নোয়াখালি জিলা জেলের বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েন এবং পর পর চারি বৎসর পরিদর্শকরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

দানশীলতা।

রায় বাহাদুর সাধারণের হিতার্থে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। অর্থ সাহায্য অপেক্ষা তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন, শ্রমশীলতা ও উদ্যম সবিশেষ প্রশংসনীয়। অর্থবান অনেকেই আছেন, দানও অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু রায় বাহাদুরের ন্যায় হৃদয়বান দাতা অতি বিরল। তাঁহার জমিদারীর উপস্বত্ব সাধারণের হিতার্থে ব্যয়িত হইবার জন্য সদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নোয়াখালীর প্রবল ঝটিকার সময়, নোয়াখালি টাউন হল নির্ম্মাণ কালে, নোয়াখালির হাসপাতাল স্থাপন সময়ে, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিরক্ষায়, এডওয়ার্ড স্মৃতিরক্ষায় এবং দার্জ্জিলিঙ্গে লুই জুবিলি স্যানিটোরিয়াম স্থাপন কালে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সৎকার্য্যে তিনি প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন।

—স্কুল [illegible]

নোয়াখালি সহরে রায় বাহাদুর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার জুবিলি [illegible] স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এখনও উহা নিজ ব্যয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি বৎসরের স্মৃতিরক্ষার্থ এই স্কুলটী স্থাপিত হয়। প্রথম

শ্রেণীর স্কুল বলিয়া এই স্কুলের বেশ সুনাম আছে এবং ছোট লাট হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নস্থ বহু রাজকর্ম্মচারী স্কুলটী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। স্কুলটী এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে যে বিগত নন্-কোঅপারেশন হুজুগের সময় ছাত্র মহলে কোন চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় নাই। এই সুন্দর শৃঙ্খলা দেখিয়া স্যর ব্যামফিল্ড ফুলার এরূপ প্রীত হইয়াছিলেন যে তিনি স্কুলের কল্যাণে অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই অর্থ দ্বারায় স্কুলের বর্ত্তমান সুন্দর সৌধটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

উক্ত স্কুল ব্যতীত রায় বাহাদুর মুসলমান প্রজাদিগের জন্য তাঁহার বাটীর নিকটে একটী মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার স্বগ্রাম হরিনারায়ণপুরে রায় বাহাদুর একটী মধ্য ইংরাজী স্কুলও স্থাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সকল বিদ্যালয়ের রক্ষাকল্পে তিনি প্রতি বৎসর অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

রায় বাহাদুর নোয়াখালি জেলার মধ্যে একজন বিশিষ্ট ও ক্ষমতাশালী রাজভক্ত জমিদার। তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগে নানা জনহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের কোন মঙ্গলজনক কর্ম্মে কদাচ আলস্য প্রকাশ করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোট লাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ও পরে স্যার ল্যান্সলট হেয়ার যখন নোয়াখালিতে আইসেন তখন তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত তিনি নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার যথোচিত সুবন্দোবস্ত করেন।

রাজভক্তি।

মিঃ জে. জি, ডানলপ্ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—" * * * আমি তাঁহাকে জিলার শাসন-কার্য্যে একটী স্তম্ভস্বরূপ বিবেচনা করি।"

রায় বাহাদুরের জমিদারীর মধ্যে এরূপ শান্তি বিরাজিত আছে যে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা একরূপ নাই বলা চলে। প্রজাগণের মধ্যে যে সকল বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মধ্যস্থতা করিয়া ঐ সকল মিটাইয়া দেন। তিনি প্রজাদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া তাহাদের নিকট শ্রাদ্ধার্হ হইয়াছেন। নোয়াখালীতে যে কয়বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, রায় বাহাদুর প্রতি বারই নিজ ব্যয়ে সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ও দুঃখিগণের সাহায্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

সুবিবেচক জমিদার।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালি সহর হইতে ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী জয়কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে মহামারী দেখা দেয়। জয়কৃষ্ণপুর রায় বাহাদুরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত না হইলেও তিনি মহামারী দমনকল্পে গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি ঐ অঞ্চলে দোকান করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ তত্ত্বাবধান করিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার পুত্র নরেন্দ্র কুমারকে ঐ স্থানে অহঃরহ রাখিয়া পুত্রের জীবন বিপন্ন করিয়াও রাজকর্ম্মচারীর কার্য্যে সহয়তা করিয়াছিলেন।

নোয়াখালিতে প্লেগ।

প্লেগ দমনার্থ যে রাজকর্ম্মচারী ঐ স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তিনি রায় বাহাদুরকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—"জয়কৃষ্ণপুরের প্লেগের সময় আপনি যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। আপনি দরিদ্রদিগের বিশেষ ক্লেশের সময় অন্নদান করিয়া তাহাদিগের যে উপকার করিয়াছেন তাহা আপনার দয়াশীলতার পরিচায়ক। আপনি প্রত্যহ ঐ স্থানে উপস্থিত থাকায় দরিদ্রগণ

উৎসাহ পাইত। যদিও আপনার ঐ অঞ্চলের সহিত কোন সংস্রব নাই তথাচ আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা ঐ গ্রামের ভূস্বামীও করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছিলেন।"—মিঃ আলি মহম্মদ চৌধুরী, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালি প্লেগ ক্যাম্প। ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন সনন্দ প্রদানের সহিত এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"আমি আপনার ব্যক্তিগত মর্য্যাদার জন্য আপনাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিলাম।"

সনন্দ।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের ভারত আগমনে দিল্লীতে যে দরবার হয় তাহাতে রায় বাহাদুর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ পাইয়া দরবারে গমন করিয়াছিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টের অতিথিরূপে শিবিরে বাস করিবার জন্যও সাদর আহ্বান পাইয়াছিলেন। কিন্তু রায় বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বাহুল্য না করিয়া নিজ ব্যয়ে দিল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, এমন কি পাথেয় পর্য্যন্ত লয়েন নাই। ঐ দরবারে তিনি "দরবার মেডেল" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিল্লির দরবার।

দিল্লী দরবার ছাড়া কলিকাতায়ও যখন ঐ উপলক্ষে উৎসবাদি সম্পন্ন হয় তখনও রায় বাহাদুর নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ সকল উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বড় লাটের "লেভীতেও" রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতার উৎসব।

দেশের উন্নতির জন্য অথবা লোকের দুঃখ দূরীকরণার্থ যাঁহারা অর্থদান করেন তাঁহারা প্রশংসার্হ। আমাদের কামনা রায় বাহাদুর দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুন।

দাশরথি কবিরাজ।

দাশরথি কবিরাজ সন ১২৭৮ সালের কার্ত্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ঈশ্বর চন্দ্র কুণ্ডু, জাতিতে শঙ্খ বণিক। ঈশ্বর চন্দ্রের ছবির ফ্রেমের কারবার ছিল। তাঁহার সময়ে তিনিই বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। কলিকাতার ইংরাজ দোকানদারেরা থ্যাকার স্পিঙ্ক কোং, নিউম্যান কোং ও লিপেজ কোং, তাঁহার নিকট হইতে ছবির ফ্রেম প্রস্তুত করাইয়া গবর্ণমেণ্ট প্যালেস, টাউন হল, রাজা, মহারাজা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ধনীলোকদিগকে সরবরাহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর, মহারাজ স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, মাননীয় বাবু কালী কৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর গোষ্ঠী এবং মাননীয় স্মরণ চন্দ্র মল্লিক এবং মাননীয় কুঞ্জলাল মল্লিক প্রভৃতি মল্লিক গোষ্ঠী ও কলিকাতার অধিকাংশ ধনীলোকদিগের কার্য্য করিতেন। এই সমস্ত কার্য্যে তিনি যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাঁহার একটিও সন্তান জীবিত থাকিত না বলিয়া তাঁহার সংসারে বিশেষ মন ছিল না। ৺জগদ্ধাত্রী পূজায় এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদে সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার ৫২ বৎসর বয়সে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া জীবিত ছিল। তিনি একটি প্রতিবাসী পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় ১৩।১৪ বৎসরের স্বজাতীয় বালককে নিজ বাটীতে রাখিয়া উক্ত ছবির ফ্রেমের কার্য্য শিখাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কানাই লাল দত্ত। ৬।৭ বৎসর পরে কানাই লালের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ঘর জামাই করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার ২।৩ বৎসর পরে দাশরথির জন্ম হয়। কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশতঃ দাশরথির বয়স যখন ৩ বৎসর তখন তাঁহার পিতার ৪৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ঈশ্বর চন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে জামাতা কানাইলালকে ছবির ফ্রেমের কারবারের সমস্ত ভার দিয়া গিয়াছিলেন। কানাই লাল ২৪।২৫ বৎসর বয়সে এরূপ গুরুভারাক্রান্ত হইয়া অতি কষ্টে পড়িয়াছিলেন। এইরূপ কষ্ট তাঁহার ৩।৪ বৎসর ছিল। পরে তাঁহার জ্বরবিকার হওয়ায় দুই মাস শয্যাগত ছিলেন এবং কারখানা একরকম বন্ধ ছিল। সেই জন্য থ্যাকার স্পিঙ্ক ও নিউম্যান কোং নিজস্ব কারিকর রাখিয়া ফ্রেমের কার্য্য করিতেছিলেন, তদবধি উক্ত কোম্পানীরা এখনও নিজ আফিসে নিজস্ব কারিকর দ্বারা কার্য্য করাইতেছেন। দাশরথির বয়স যখন ৫ বৎসর তখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে লাগিলেন এবং ৭ বৎসর বয়সে যদু পণ্ডিত মহাশয়ের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। স্কুলে প্রতি বৎসর প্রাইজ পাইতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মাতার মনে বড়ই আনন্দ হইল। ৫ বৎসর পরে ওরিএন্টাল সেমিনারিতে ভর্ত্তি হইয়া ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এখানে প্রতিবৎসর ডবল প্রোমোশন ও প্রাইজ পাইতে লাগিলেন ও শিক্ষকগণের প্রিয়ছাত্র হইলেন। তাঁহার স্কুলে পাঠকালে ১৪।১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ৺গঙ্গালাভ করেন। দাশরথি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। ১৪।১৫ বৎসর বয়সের বালক দাশরথি মাতার বিছানার চাদর, পরিবার কাপড় প্রভৃতি ধৌত করিয়া দিয়া স্কুলে যাইতেন। তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"তোমার ভগিনীপতিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিবে, সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিবে, কখনও বেশ্যালয়ে গমন ও সুরাপান করিবেনা।" তাঁহার মাতার কিছু টাকা ছিল, তিনি পাড়ার কতকগুলি বিজ্ঞ লোক ডাকাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে

কবিরাজ শ্রীদাশুরথি কবিরত্ন

এই বলিয়া উইল করিয়া যান যে "এই টাকা আমার জামাতার নিকট দিলাম, উহা ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে। দাশরথিকে ৩২ বৎসর বয়সে স্বদ সমেত দিয়া দিবে।" বালক দাশরথি সে সময় কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই,—কিন্তু বয়স ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতার আজ্ঞা সম্পূর্ণ পালন করিয়াছিলেন। মাতৃশোকে দাশরথি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন। সে বৎসর স্কুলে প্রাইজ পাওয়ার উপযুক্ত না হওয়ায় মাষ্টার মহাশয়রা একমত হইয়া তাঁহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া একটী প্রাইজ দিয়াছিলেন।

দাশরথিকে প্রতিবাসীরা সকলেই স্নেহ ও যত্ন করিত, কারণ তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়া প্রতি বৎসর স্কুলে প্রাইজ পাইতেন। ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। দাশরথি ও তাঁহার ৮।১০ জন সহপাঠী স্কুলের ছুটীর পর বেলা ৪টা হইতে ৫।০ টা পর্য্যন্ত শিক্ষক অন্নদা বাবুর নিকট প্রাইভেট পড়িতেন, কিন্তু ২য় শ্রেণীতে বিধুভূষণ বাবু পড়াইতেন। ২।৩ জন ছাড়া সকলে অন্নদা বাবুকে ত্যাগ করিয়া বিধুভূষণ বাবুর নিকট প্রাইভেট পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইলেন। দাশরথিরও সম্পূর্ণ ঐ মত ছিল, কিন্তু অন্নদা বাবুর মনে কষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহার মায়া ছাড়াইতে পারিতে-ছিলেন না। তিনি ২।৩ দিন অন্নদা বাবুর নিকট পড়িতে যাইলেন না। অন্নদা বাবু তাঁহার অনুপস্থিতির কারন জিজ্ঞাসা করিলেন। দাশরথি অন্নদা বাবুর মুখের দিকে চাহিবামাত্র, তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি কোন মতে বলিতে পারিলেন না "আমি বিধু বাবুর নিকট পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইব।" অন্নদা বাবু তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় বালক দাশরথি মিথ্যাকথা বলিলেন। তিনি বলিলেন "আমার অভিভাবক মাষ্টারের বেতন দিতে অক্ষম।"

এই মিথ্যাকথা তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। এই মিথ্যা আচরণ ৪৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছিল। অন্নদা বাবু এই কথা শুনিয়া বলিলেন "তোমাকে বেতন দিতে হইবে না, তুমি আমার বহুদিনের প্রিয় ছাত্র, তুমি বিনা বেতনে আমার নিকট পড়িবে। এইকথা শুনিয়া দাশরথি আর কোন কথা কহিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তদবধি তাঁহার পড়িবার আসক্তি কমিয়া আসিল। তাঁহার এই মিথ্যা আচরণে তিনি সর্ব্বদা মনে কষ্ট অনুভব করিতেন। পড়িবার সময়ে শিক্ষক মহাশয় যাহা বলিতেন তাহা শুনিতেন বটে, কিন্তু পড়ার কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহস হইত না, সর্ব্বদা তাঁহার সেই কপটাচরণের কথা তাঁহাকে মনঃ-কষ্ট দিত। এইরূপ গোলমালে তাঁহার লেখাপড়ার কিছুই উন্নতি হইল না। ৮।৯ মাস ২য় শ্রেণীতে পাঠ করিয়া স্কুল হইতে সার্টি-ফিকেট লইয়া স্কুল ছাড়িয়া দিলেন। ৩।৪ মাস পরে হেতুয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া পুনরায় নূতন উৎসাহে লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। ১ম শ্রেণীতে পড়িবার সময় পরীক্ষার পূর্ব্বে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। হুগলিতে দাশরথির মাতুলালয় ছিল, তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতামহ ও মাতুল উভয়েই স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। দাশরথির বয়স যখন ৬।৭ বৎসর তখন তাঁহার মাতামহীর মৃত্যু হয়। সেই সময়ে তিনি তাঁহার মাতার সহিত হুগলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সামান্য কিছু তৈজসপত্র ব্যতীত আর কিছুই পান নাই। তাঁহার মাতা-মহের নূতন সহোদর (তাঁহারা ৯ সহোদর ছিলেন) রামচাঁদ বাবু একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি উর্দ্দু ও পারসীতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন ও হুগলি আদালতের মুন্সেফ ছিলেন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার স্ত্রী (নূতন গিন্নী) ঐ বাটী ভোগ করিতেছিলেন।

একদিন দাশরথি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার সম্পত্তি কোম্পানী লইয়াছে। এই শুনিয়া দাশরথি তাঁহার ভগ্নীপতিকে সঙ্গে লইয়া হুগলিতে যাইয়া শুনিলেন যে নূতন গিন্নি ঘরে মারা যান এবং পুলিশ সংবাদ পাইয়া উপস্থিত হয় এবং জিনিষপত্র, গহনা ও নগদ টাকাকড়ি সমুদয় পাড়ার লোকদিগকে সাক্ষী রাখিয়া লইয়া যায়। তৎপরে পুলিশের হুকুম অনুসারে শব দাহ করা হয়। দাশরথি এই সকল শুনিয়া ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন। কিন্তু উক্ত সম্পত্তিতে দাবী করিয়া দাশরথির অন্যতম মাতামহের এক বিধবা পুত্রবধূ পূর্ব্বেই দরখাস্ত করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ দরখাস্ত নিষ্পত্তির জন্য জজ সাহেবের বরাবর প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ সময় দাশরথির পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তিনি স্কুলের প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড মরিসন সাহেবের নিকট হইতে এক পত্র লইয়া জজ সাহেবের নিকট হাজির হন এবং মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিবার জন্য প্রার্থনা করেন। জজ সাহেব সানন্দে ঐরূপ করেন। তৎপরে ঐ দরখাস্তের নিষ্পত্তি হইল এবং দাশরথি লেটর অব য়্যাডমিনিষ্ট্রেসনের বলে সমুদয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং ভগ্নীপতির নিকট রাখিয়া দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দাশরথি পরীক্ষায় ফেল হইলেন এবং আর পড়িতে ইচ্ছা করিলেন না। এই সময়ে তাঁহার ভগ্নীপতি দাশরথির বাটীর পার্শ্বে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। বাড়ী সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। দাশরথি মাতৃআজ্ঞা পালন করিয়া ভগ্নীপতির সেবা করেন কিন্তু কোন দিন তাঁহার টাকার কথা ভগ্নীপতির নিকট উত্থাপন করেন নাই।

ক্রমে তাঁহার ভগ্নীপতি আরোগ্যলাভ করিলেন এবং পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে লইয়া পুনরায় দাশরথির সাহায্যে কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগি-

লেন। দাশরথিও যেমন তাঁহার ভগ্নীপতিকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন তাঁহার ভগ্নীপতিও তাঁহাকে তদ্রূপ স্নেহ ও যত্ন করিতেন।

দাশরথি বাল্য হইতেই মাতৃশিক্ষার ফলে ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন ও সর্ব্বজীবে দয়াবান ছিলেন। যেখানে মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইত, দাশরথি তথায় যাইয়া নিবিষ্ট মনে আদ্যন্ত শ্রবণ করিতেন। একদিন বেনেটোলার বারোয়ারী পূজায় একটী মহিষ বলিদানার্থ আনয়ন করা হয়। কিন্তু ঐ মহিষকে কোন মতেই আয়ত্ব করিয়া যূপকাষ্ঠে স্থাপন করা গেল না, যূপকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেল এবং সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় পশুটীকে পরদিনে বলি দিবার জন্য বাঁধিয়া রাখা হইল। দাশরথির কোমল প্রাণ পশুটির প্রতি দয়ার্দ্র হইল। তিনি উহার রক্ষাকল্পে মহেন্দ্র নাথ দাঁর নিকট প্রস্তাব করেন। মহেন্দ্র বাবু শুনিয়া বলিলেন যে দাশরথি যদি উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্থাৎ ৩০।৪০৲ টাকা দিতে পারেন তাহা হইলে মহেন্দ্র বাবু বাকী অর্দ্ধেক টাকা দিয়া ঐ পশুটিকে উদ্ধার করিতে পারেন। এই প্রস্তাবে দাশরথি সম্মত হইলেন এবং কতকগুলি লোকের চেষ্টায় পশুটীর মূল্য দিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়া পিঞ্জরাপোলে পাঠান হইল। সকলে দয়ার্দ্র হইয়া কিছু কিছু দিয়াছিলেন, তাহাতে দাশরথির ৪।৫৲ টাকার অধিক দিতে হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় ঐ পশুটির উদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছিল। এই ঘটনার ২।৩ বৎসর পরে পাড়ার সকলের মন ফিরিয়া গেল এবং প্রত্যেক বৎসর বেনেটোলার বারোয়ারী পূজার পশুবলি চিরতরে বন্ধ হইল। এক্ষণে অনেকেই অহিংসা যে পরমো ধর্ম্ম তাহা জানিতে পারিয়াছেন। এমন কি সকলে চাঁদা করিয়া হরিসভার জন্য ১টী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এই সময়ে তাঁহার ভগ্নীপতির বাটী সম্পূর্ণ হওয়ায় তিনি ঐ বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ঐ বাটীও দাশরথির বাটীর সহিত সংলগ্ন থাকায়

উভয় পরিবারই বস্তুতঃ এক রহিলেন। দাশরথি উৎসাহের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুর ও মল্লিক গোষ্ঠীর সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে দাশরথির বিবাহ হইল। বিবাহের ২।৩ বৎসর পরে দাশরথি ভগ্নীপতির নিকট কিছু মাসোহারা চাহিলে ভগ্নীপতি বলিলেন যে, কারবারে দাশরথির কোন অধিকার নাই, কারণ ঐ কারবার হইতে তিনি দাশরথিকে লেখা পড়া প্রভৃতির ব্যয় যোগা-ইয়াছেন। তাঁহার এরূপ উক্তিতে দাশরথি মর্ম্মাহত হইলেন। দাশরথির পুরাতন কারিকরগণ দাশরথিকে ট্রেটি বাজারে একটী নূতন দোকান খুলিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু দাশরথি ঐরূপ করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় ষ্ট্যাম্প আফিসের হেড ক্লার্ক ছিলেন। তিনি দাশরথির জন্য চাকুরী যোগাড় করিবেন বলায় দাশরথি কোন মতেই স্বাধীনতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দাসত্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার পিতৃপিতামহ কেহ কখনও চাকুরী করেন নাই। সুতরাং দাশরথিও চাকুরী না করিয়া স্বাধীন ব্যবসায় করিবেন এইরূপ অভিমত জানাইলেন। এই সময় বঙ্গে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে দাশরথির হুগলির বাটীর কিয়দংশ পড়িয়া যায় এবং এই ভূমিকম্পের পরেই হুগলি হইতে আদালত উঠিয়া চুঁচুড়ায় যায়। দাশরথি হুগলির বাটী বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পরে তিনি এক প্রতিবেশীর সহযোগে ক্যানিং ষ্ট্রীটে ১খানি মনোহারী দোকান খুলিলেন। দোকান সামান্যভাবে চলিতে লাগিল। দাশরথি মিথ্যা প্রবঞ্চনা জানিতেন না, কাজেই তাঁহার অংশীদারের সহিত মনোমালিন্য ঘটিতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ঐ দোকানের সহিত সর্ব্বসম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। ফলে দাশরথি সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় পড়িলেন। এই সময়ে তিনি প্রতিবেশীগণের রোগসেবা প্রভৃতি কার্য্যে অধিক সময় নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন

কবিরাজের কম্পাউণ্ডারের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি পরে বুঝিলেন যে বিশুদ্ধভাবে ঔষধ প্রস্তুত করিলে কবিরাজী চিকিৎসায় অধিক ফল দর্শে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি এক বন্ধুর সহযোগে চিৎপুর রোডে একটী কবিরাজীখানা স্থাপন করিলেন এবং কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেনকে ব্যবস্থাপক কবিরাজ নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ২ বৎসর পরে হিসাব করিয়া দেখিলেন যে ঘরভাড়া ও বিজ্ঞাপন প্রচার প্রভৃতি ব্যয়ে দেড় হাজার টাকা খরচ হইয়াছে এবং ৫০০৲ টাকা ঋণ হইয়াছে। তৎপরে ব্যয়সঙ্কোচ পূর্ব্বক আর এক বৎসর চালাইয়া দেখা গেল যে কিছু লাভ হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে অংশীদারের সহিত মনান্তর হওয়ায় দাশরথি দোকানের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার অংশের টাকার শুদ্ধ মাত্র একখানি হাতচিঠা লইয়া সন্তুষ্ট হন। দাশরথি আর অংশীদার না লইয়া স্বয়ং নিজবাটীতে ২নং দাঁরলেনে কবিরাজীখানা করিবার অভিপ্রায়ে ভগ্নীপতির নিকটে গেলেন, কিন্তু তাঁহার ভগ্নীপতি বলিলেন যে তাঁহার মত দম্ভহীন ভাল মানুষ ব্যবসায় করিতে পারে না. তাঁহার পক্ষে চাকুরী করাই উচিত। তিনি টাকা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। দাশরথি কিন্তু ইহাতে ভগ্নমনোরথ হইলেন না। তিনি মহাজনদিগের নিকট হইতে ধারে জিনিষপত্র লইয়া স্বীয় বাটীতে ঔষধালয় স্থাপন করিলেন এবং বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধভাবে ঔষধ-প্রস্তুত প্রণালী তিনি পূর্ব্বেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুনরায় তিনি সোৎসাহে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মফঃস্বলে অনেক গ্রাহক হইল, তাঁহার স্বপ্রস্তুত ঔষধাদিতে উপকার পাইয়া লোকে তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ ঔষধের জন্য লিখিতে লাগিল। কারবার সমধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহাদের পুরাতন বাটীতে আর স্থান সঙ্কুলান হইল না। এই সময় তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ ৯ নম্বর বাটী বিক্রয় হইতেছে

শুনিয়া তিনি তাহা ক্রয় করিলেন এবং পুরাতন বাটী ভাঙ্গিয়া নূতন একটী ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, দাশরথির বাটী ও তাঁহার ভগ্নীপতির বাটী বস্তুতঃ এক বাটী ছিল। দাশরথির ভগ্নীর কিছুকাল পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। এইক্ষণ দাশরথির সহিত তাঁহার ভগ্নীপতির বিশেষ কলহ হইতে থাকায় দাশরথি উঠানে দেওয়াল তুলিয়া দুই বাটীর সংযোগ ভিন্ন করিলেন।

কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে এই পারিবারিক কলহের অবসান হইল। দাশরথির ভগ্নীপতি কানাইবাবু কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইলেন। ব্যাধির তাড়নায় অস্থির হইয়া একদিন তিনি দাশরথিকে তাঁহার পার্শ্বে ডাকাইলেন এবং মনোমালিন্যের কথা উল্লেখ করিয়া দাশরথির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দাশরথি জ্যেষ্ঠ সোদরপম ভগ্নীপতির কাতরতা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মনোবাদ বিস্মৃত হইয়া ভগ্নীপতির চিকিৎসার ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু করাল কাল তাঁহাকে অব্যাহতি দিল না। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইল এবং তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে একদিন দাশরথির শিক্ষক অন্নদা বাবুর সহিত হঠাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দাশরথি শিক্ষকের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে একদিন দাশরথির বাড়ীতে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। [illegible] ২দিন পরে অন্নদাবাবু দাশরথির বাটীতে উপস্থিত হইলে দাশরথি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যয়ন-কালে তাঁহার সহিত যে মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া অনুতাপ করিলেন এবং অন্নদাবাবু তাঁহাকে ৮।৯ মাস যাবৎ বিনা বেতনে পড়াইয়াছিলেন বলিয়া দাশরথি তাঁহার সমক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং কিছু অর্থ শিক্ষকের পদপ্রান্তে স্থাপন করিলেন। অন্নদাবাবু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া

প্রস্থান করিলেন। অধুনা কলিকাতায় যে সকল কবিরাজ অর্থ ও যশো-লাভ করিয়াছেন, দাশরথি তাঁহাদের অন্যতম। সাধুতাই তাঁহার ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। তিনি নিরামিষাশী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া জনসাধারণের উপকার করুন ইহাই আমাদের কামনা।

স্বর্গীয় কুমার হরি প্রসাদ রায়।

স্বর্গীয় কুমার হরিপ্রসাদ রায়।

স্বর্গীয় কুমার হরিপ্রসাদ রায়ের আদি পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত ধর। লক্ষ্মীকান্ত ধরের পূর্ব্ব পুরুষ সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সপ্তগ্রাম বহুদিন হইতে বাঙ্গালার বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের অবনতির পর ইঁহারা কলিকাতায় আগমন করেন। সুতা-নুটিতে অবস্থান করিয়া ইংরাজদিগের সহিত লক্ষ্মীকান্ত ধরের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন।

লক্ষ্মীকান্ত ধরের সময় এই বংশ প্রচুর ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। লক্ষ্মীকান্ত ঈশ্বরপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এক সময় প্রতিশ্রুতি পালন করিতে না পারায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তথাপিও তিনি সত্যচ্যুত হন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যার নাম পার্ব্বতী। একপত্নীব্রত অপুত্রক লক্ষ্মীকান্তকে অনেকে দারান্তর গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। পার্ব্বতীর গর্ভজাত পুত্রেরা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মীকান্তের শ্রীবৃদ্ধির সহিত ইংরাজ কুটিয়াল সাহেবদের সঙ্গে তাঁহার টাকা লেন-দেন কারবার খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। নবকৃষ্ণের জীবন-চরিত লেখক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মিত্র মহাশয় বলেন, ক্লাইব ধর মহাশয়ের বাড়ীতে নবকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ এ বাড়ীতে সামান্য মুহরীর কার্য্য করিতেন। ক্লাইব একজন চতুর লোক চাহিলে ধর মহাশয় নবকৃষ্ণকে ক্লাইভের হস্তে অর্পণ করেন। নবকৃষ্ণ বিশ্বস্ততার

সহিত কার্য্য করিয়া ক্লাইভের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। কালক্রমে তিনি প্রভূত বিত্ত ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ইংরাজ-আশ্রিত বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ কথিত হয় যে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর আজীবন এই উপকারের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন।

লক্ষ্মীকান্ত ধরের চরিত্রে আমরা একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাই। উপাধি-লোলুপতারূপ মানসিক ব্যাধি সর্ব্বত্র সকল কালে প্রবলভাবে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়,কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত যে সে ব্যাধির প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিলে অবগত হই। ইংরাজ সাম্রাজ্য সংস্থাপয়িতা রাজপুরুষগণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব বড় কম ছিল না। মনে করিলে তিনি অনায়াসে রাজসম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ইহা লাভের জন্য সচেষ্ট হন নাই। ইংরাজ সরকার হইতে ১৭৭২ খৃঃ ৫ই জুলাই তিনি একটি খিলাত প্রাপ্ত হন, ইহা তাঁহাদিগের দপ্তরের কাগজ হইতে অবগত হওয়া যায়। জন-হিতকর কার্য্যে তিনি আনন্দিত হইতেন। রাস্তা, ঘাট, জলাশয়, পান্থ-নিবাস, শিক্ষাবিস্তার, আরোগ্য-নিকেতন প্রভৃতিতে ব্যয় করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ আদি উদ্দেশ্যে হিন্দু সকল অবস্থাতে ব্যয় করিয়া থাকেন। এ সকল বিষয়ে তিনি যথেষ্ট ব্যয় করিতেন, সে কথা আমরা উল্লেখ করিব না। কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের সুখের জন্য তাঁহার ব্যয় আনন্দের সহিত তাঁহার দেশবাসী স্মরণ করিবেন। এই প্রবৃত্তি তাঁহার দৌহিত্রদিগের মধ্যে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পুরীর রাস্তা নির্ম্মাণ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জনপ্রিয় লক্ষ্মীকান্তকে তাঁহার দেশবাসী আদর করিয়া নকুধর নামে অভিহিত করিতেন। ইহা রাজা মহারাজা উপাধি হইতে গৌরবসূচক

ছিল। নকুধর বিনয়ের খনি ছিলেন, সুজনতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, আর ছিলেন অধ্যবসায়ের অবতার। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন বড়ই মধুর ছিল। কখনও অলসভাবে সময় কাটাইতেন না। ঈশ্বরোপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া অবকাশ পাইলে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন।

বৈষয়িক হিসাবে লক্ষ্মীকান্ত ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। তিনি মিতাচারী, মিতাহারী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। যে পুরুষে এই মিত-ত্রয় অবস্থান করে তথায় লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও শান্তি বিরাজ করিয়া থাকে। লক্ষ্মীকান্ত মিতাচারী ও মিতব্যয়ী হইলেও দান ও প্রচুর ভোজ্যে সকলকে আপ্যায়িত করিতেন।

লক্ষ্মীকান্তের কন্যা পার্ব্বতীর গর্ভে সুখময় নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। কালক্রমে এই পুত্র মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া স্বদেশ-সেবায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, লক্ষ্মীকান্তের চরিত্র ও ধনের প্রভাবে সুখময় সে সময়ের বাঙ্গালায় বিশেষ গণনীয় ও স্মরণীয় পুরুষ হইয়াছিলেন।

এরূপ কথিত হয় লক্ষ্মীকান্তের কন্যার রূপের কথা অপেক্ষা গুণের কথা সে কালের লোকেরা আনন্দের সহিত কীর্ত্তন করিতেন। দরিদ্র-পোষণ তাঁহার স্বভাবগত ব্রত ছিল। আর্ত্তকে ত্রাণ ও দুঃস্থকে সুস্থ করিতে তিনি অন্নপূর্ণার ন্যায় মুক্তহস্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে এতদ্দেশীয় আরোগ্যশালার জন্য ৩০,০০০৲ টাকা এবং কাশীপুর লোহার কারখানা হইতে দমদম পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা তৈয়ার করিবার জন্য ৪০,০০০৲ টাকা প্রদান করেন। পার্ব্বতী দাসীর পৌত্র রাজা নরসিংহ পিতামহীর আকাঙ্খিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দমদম কাশীপুর অঞ্চল লক্ষ্মীকান্তের

জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান কালেও রামলীলার সুপ্রসিদ্ধ বাগান তাঁহার বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন। এ অঞ্চলের প্রজারা বর্ষাকালে তাহাদের রাস্তার দুরবস্থার কথা পার্ব্বতী দাসীর কাছে নিবেদন করে। এই নিবেদনের ফলে সকরুণহৃদয়া পার্ব্বতী এই দান করিয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি সে সময় সম্রাট আকবরের বংশধরদিগের সমস্ত রাজশক্তি অন্তর্হিত হইলেও তাঁহাদের নামের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা কিছু নজর পাইলে রাজা মহারাজা প্রস্তুত করিতেন, আর আমাদের দেশের লোক তাহা প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রদত্ত উপাধি সকলকে সম্মোহিত করিতে সমর্থ হইত না। এ জন্য কোম্পানী সম্রাটের নিকট হইতে সনন্দ আনয়ন করাইয়া অনুগৃহীত ব্যক্তিদিগকে সম্মানিত করিতেন। রাজা নরসিংহ মহারাজ সুখময়ের পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার সময়ে কাশীপুরের রামলীলার বাগান কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মিলনস্থান ছিল। এ স্থানের নানাপ্রকার বৃক্ষ পশু পক্ষী সাধারণের চিত্ত বিনোদন করিত। রাজা বৈদ্যনাথ পশুপালন জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে Zoological societyর সদস্য ছিলেন।

এই বংশের রাজারা তীর্থ যাত্রা কালে ইংরাজ সরকার হইতে রাজোচিত সম্মান ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। রাজা নরসিংহ পুরী গমন কালে একশত বন্দুকধারী সিপাহি দুইটী হাতি ১০টা ঘোড়া ২০ কুড়িখানিগাড়ি, ১৬ খানা পাল্কী ইত্যাদি জনগণ সহ গমন করিয়াছিলেন। গমনপথে কালেক্টার প্রভৃতির উপর গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর আদেশ করিয়াছিলেন যাহাতে রাজা বাহাদুরের কোনরূপ অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে যেন তাঁহারা সচেষ্ট হন।

রাজা নরসিংহের পুত্র রাজা রাজকুমার। ইঁহার দুই পুত্র, কুমার রাধা প্রসাদ ও কুমার দেবী প্রসাদ রায়। দেবীপ্রসাদ অল্প বয়সে স্বর্গলাভ করেন। কুমার দেবী প্রসাদের পুত্র কুমার হরিপ্রসাদ রায়। রাজা নরসিংহ পোস্তার যে পৈত্রিক বাটী প্রাপ্ত হন, কুমার হরিপ্রসাদ রায় সেই বাটীর ।৷৹ আনা উত্তরাধীকারীসূত্রে প্রাপ্ত হন। কুমার হরিপ্রসাদের অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাত তাঁহার তত্ত্বাবধান করেন। কিছুদিন ইঁহার মাতুল ইঁহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

রায় সাহেব হারাণ চন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কিছুদিন কুমারকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। কুমার হরিপ্রসাদ পণ্ডিত-মণ্ডলীর সঙ্গ বড় ভাল বাসিতেন। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ কুমারের গুণ-গৌরব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে"সাহিত্যনিধি" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। কুমার হরি প্রসাদ সাহিত্য সভা, সাহিত্য পরিষদ্, বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি, পশুক্লেশ নিবারিণী প্রভৃতি সভা সমিতির সদস্য ছিলেন। কোন দুঃস্থ সাহিত্যিক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে অবস্থা অনুসারে সাহায্য করিতেন। সাময়িক পত্রিকাতে তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধ সকল অতি সমাদরের সহিত পঠিত হইত। কুমার হরিপ্রসাদের পশু-সংগ্রহ-বৃত্তি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পোস্তা রাজবাটীর সিংহ, বার্ড অফ্ প্যারাডাইস্ প্রভৃতি দেখিবার বিষয় ছিল।

কোন শুভ অনুষ্ঠান কুমার হরিপ্রসাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইত না। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, মূকবধির বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বজাতির কল্যাণ জন্য স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহাতে যোগদান করিতেন। মেদিনীপুরে তাঁহার স্বজাতি সম্মেলন হইলে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেও তাহাতে

যোগদান করিয়াছিলেন, যশোহর সাহিত্য সম্মেলনে সাধারণ সাহিত্যিকের ন্যায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সরলতা অনুকরণীয়, তাহাতে ধনবত্তার উত্তাপ অনুভূত হইত না।

ভ্রমণস্পৃহাও তাঁহাতে বলবতী ছিল। উত্তর পশ্চিমে অনেক তীর্থ তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেবার গঙ্গাসাগরে তিনি গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বহু রুগ্নব্যক্তির সেবা ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে কুমারের বড় অনুরাগ ছিল। তাঁহার গৃহের অস্ত্র, যন্ত্র ও ঔষধাদি সংগ্রহ অনেক বড় হাঁসপাতালেরও সমকক্ষ হইত।

সাগর হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি রুগ্ন হইয়া পড়েন। দুই মাস রোগ ভোগ করিয়া তিনি প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

হরিপ্রসাদের স্বধর্ম্মনিরতা পত্নী শ্রীমতী সখিসোনা দাসী এক্ষণে তাঁহার সম্পত্তির রক্ষয়িত্রী। ইনি সুশিক্ষিতা, ধর্ম্মপরায়ণা, ও সহৃদয়া। ইঁহার কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। তাহার মধ্যে মানস-প্রসূন প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর যথেষ্ট কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। লেখিকার নির্ভীকতা ও ওজস্বিতা প্রশংসনীয়। দেশের দুরবস্থা দেখিয়া লেখিকা যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখিকার স্বদেশপ্রেম বেশ ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমতী সখিসোনা দাসী সাধারণতঃ রাণী নামে অভিহিতা হন। রাণী হইতে হইলে যে সকল সদ্‌গুণে ভূষিতা হওয়া উচিত সে সকল সদ্‌গুণ ইঁহাতে যথেষ্ট আছে। ইনি কেদার, বদ্রীনাথ, রামেশ্বর সেতু বন্ধ প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। তীর্থ যাত্রা কালে অনেক লোকহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ২টি আফ্রিকা দেশীয় সুন্দর সিংহ জুলজিক্যাল গার্ডেনে স্বামীর স্মরণার্থে প্রদান করিয়াছেন।

কুমারের একমাত্র কন্যার বিবাহ খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। সে বিবাহে কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, হাইকোর্টের জজেরা এমনকি, সার আশুতোষ মুখার্জ্জি, সার আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমান পশুপতি ধর, কুমার বাহাদুরের জামাতা। ইনিও ধার্ম্মিক, অধ্যবসায়ী ও পরোপকারনিরত। শ্রীমানের একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। নবকুমার রাজলক্ষণ সম্পন্ন, শ্রীভগবান ইহাদিগকে দীর্ঘজীবি করিয়া রাজবংশকে গৌরবোজ্জল করুন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ইতিহাস প্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থ প্রণেতা বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশে ও তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পশুপতি আচার্য্যের ধারায় ইঁহার জন্ম। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ, কাপ। শরৎচন্দ্র বঙ্গাব্দ ১২৭২ সনে ১০ই অগ্রহায়ণ ঢাকা জেলার অন্তর্গত দৌলতপুর থানার অধীন কৈলা (কলিয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শরৎচন্দ্রের দুই সহোদর ছিলেন—জ্যেষ্ঠ শশীভূষণ ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র (গণেশ), ইঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। দুই জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা অম্বিকা সুন্দরী দেবী ও শ্রীযুক্তা নবদুর্গা দেবী বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের মাতার নাম আনন্দময়ী দেবী। শরৎচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ কৃষ্ণ নারায়ণ ভুঁইয়া চৌধুরী অতি ধণাঢ্য ও কতিপয় পরগণার মালিক ছিলেন। শৈশবে পিতৃহীন হইলে জমিদারীর নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে ও নবাব সরকারে বহু টাকা রাজস্ব বাকি পড়ে। যখন কৃষ্ণনারায়ণের বয়স মাত্র একাদশ বৎসর, তখন যজ্ঞোপবীত উপলক্ষে গৃহে সন্ন্যাসী অবস্থায় থাকার সময়ে নবাবের লোক তাঁহাকে ধরিয়া মুর্শিদাবাদ লইয়া যায়, সে স্থানে তিনি কয়েদী অবস্থায় প্রায় দ্বাদশবৎসর অতিবাহিত করেন। তখন রাজকীয় কয়েদীগণকে জেলখানায় আবদ্ধ রাখা হইত না, মুর্শিদাবাদ সহরে যথেচ্ছারূপে পরিভ্রমণ করিতে দেওয়া হইত। এই সময়ে কৃষ্ণনারায়ণ কোন এক পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

করিতেন। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং গঙ্গাস্নান কালে অতি সুললিত কণ্ঠে গঙ্গাদেবীর ও অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনা-স্তোত্র গান করিতেন। তিনি গঙ্গার যে ঘাটে স্নান ও স্তোত্র গান করিতেন ঐ ঘাটে দিনাজপুরের রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারী রাজারাম রায় সপরিবারে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া নৌকাতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার একটি পরমাসুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। রাজারাম ও তাঁহার পত্নী প্রত্যহ এই সুন্দর ব্রাহ্মণ যুবককে দেখিয়া ও তাঁহার সুললিত কণ্ঠের স্তোত্র শুনিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে নিজেদের নৌকায় আনাইয়া তাঁহার পরিচয় অবগত হন। রাজারাম রায়ের চেষ্টায় ও নবাব সরকারের প্রহরী কর্ম্মচারীগণের সহায়তায় কৃষ্ণনারায়ণ রাত্রিযোগে মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন এবং রাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী নাম ধারণে নিজ দেশে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার অবরোধ-কাল মধ্যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং প্রভূত জমীদারী রাজস্বের দায়ে নিলাম হইয়া অপরাপর ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল। পরে তিনি রাজা রামের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় কৈলা গ্রামে বাস করিতে থাকেন। শরৎচন্দ্রের পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। শৈশবে কুচবিহার রাজধানীতে এক আত্মীয়ের আবাসে থাকিয়া লেখা পড়া করেন এবং ইংরেজী ১৮৮৩ সনে কুচবিহার জেঙ্কিন্স স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ও পরে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে বি,এ ও বি, এল্ পরীক্ষা পাশ করেন। কুচবিহারের তৎকালীন অধীশ্বর মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর তাঁহার ষ্টেটে শরৎচন্দ্রকে নায়েব আহেলকারী পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে শরৎচন্দ্র তাহাতে সম্মত না হইয়া ১৮৯৩ সনে ময়মনসিংহে যাইয়া ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু তথায় মাত্র ১মাস থাকিয়াই ঢাকায় চলিয়া আইসেন। এই

স্থানে এখনও পর্য্যন্ত ওকালতী ব্যবসা করিতেছেন। অধ্যবসায়, বাগ্মীতা ও নৈপুণ্যতার জন্য শরৎচন্দ্র শীঘ্রই ব্যবসায়ে বিশেষ কৃতকার্য্য হইলেন; ঢাকা জেলার প্রায় সকল প্রধান প্রধান জমীদার তাঁহার মক্কেল। ঢাকার তদানীন্তন ডিষ্ট্রীক্টজজ মিষ্টার ডগলাস্ তাঁহাকে দুইবার অস্থায়ী মুন্সেফ পদে নিযুক্ত করেন এবং তদনুসারে তিনি মুন্সীগঞ্জে ও মানিক-গঞ্জে মুন্সেফের কার্য্য করেন। এইকার্য্যে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হওয়ার জন্য তিনি কোন প্রয়াস পান নাই। ১৯৯৮ সনে যখন তিনি অস্থায়ীভাবে মুন্সেফের কার্য্য করিতেছিলেন ঐ সময়ে ঢাকাতে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সের এক অধিবেশন হয়। শরৎচন্দ্র মোক্তারী পরীক্ষার্থীগণের মৌখিক পরীক্ষক মনোনীত হইয়া ঢাকায় থাকা সময়ে উক্ত কন্‌ফারেন্সে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন এবং বক্তৃতায় গবর্ণমেন্টের কোন কোন কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই কারণেই হাইকোর্ট তাঁহাকে স্থায়ী মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করেন না; প্রথম হইতেই তিনি দেশের ও সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করেন। ঢাকার ডেলিগেট স্বরূপে তিনি কলিকাতা, বোম্বাই মান্দ্রাজ, পুনা, বেনারস প্রভৃতি স্থানে ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের অধি-বেশনে যোগদান করেন। ইং ১৯০১ সনে তিনি ঢাকা পিপল্‌স এসোসিয়েসন (জনসাধারণ সভা) স্থাপন করেন। এই সভা ঢাকা জেলার যাবতীয় হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদাই অগ্রবর্ত্তী। শরৎচন্দ্রের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ে এই সভা পূর্ব্ববঙ্গের সমুদায় সভার মুখপত্র। ১৯০৭ সনে লর্ডকার্জ্জন ঢাকা ময়মনসিংহ জেলা বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসাম প্রদেশভুক্ত করার জন্য সেক্রেটারী রিজলি সাহেব দ্বারা এক সার্কুলার চিঠি বাহির করিলে ঢাকা পিপল্‌স্ এসোসিয়েশনএই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিবাদ করেন। ঐ সনের ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজে জাতীয়

মহাসভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে এই বিষয়ের প্রতিবাদ করার জন্য শরৎচন্দ্রকে ঢাকার ডেলিগেট (প্রতিনিধি) স্বরূপে পাঠান হয়। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ উক্ত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা হইতে লালমোহন ঘোষ, শরৎ চন্দ্র মল্লিক,শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ প্রভৃতির সহিত শরৎচন্দ্র একত্রে মান্দ্রাজ যাত্রা করেন এবং পথি-মধ্যে ট্রেনে রিজলী সাহেবের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তখন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের নেতৃবর্গের রিজলি সাহেবের সার্কুলার লেটারের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। লালমোহন ঘোষ মত প্রকাশ করেন যে এই বিষয়টী প্রাদেশিক বিষয়,ইহা কংগ্রেস মহাসভার আলোচ্য বিষয় নহে। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্ব রাত্রিতে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে শরৎচন্দ্র রিজলী সাহেবের সার্কুলার লেটার উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিবাদ করার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্যার ফিরোজসা মেটা ভিন্ন অন্য কেহই শরৎচন্দ্রকে পোষকতা করিলেন না। সেই অধিবেশনে ময়মনসিংহ হইতে কোন প্রতিনিধি যায়েন নাই এবং ঢাকা হইতে মাত্র শরৎচন্দ্র একা গিয়াছিলেন। বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতেতে তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তিনি স্পষ্ট মত প্রকাশ করিলেন যে এই প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত না হইলে ঢাকা ও ময়মনসিংহ কখনও কংগ্রেসে যোগদান করিবে না। তিনি এই কথা বলিয়া সভা পরিত্যাগ করিয়া বাসায় চলিয়া আইসেন। তৎপর স্যার সুরেন্দ্র নাথ, শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ বাসায় আসিয়া শরৎচন্দ্রকে জানান যে রিজলি সাহেবের সার্কুলার লেটারের প্রতিবাদ করার জন্য বিষয় নির্ব্বাচন কমিটি ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং কংগ্রেসের মেম্বরগণের মধ্যে অপর কেহই ঐ বিষয় ভাল

করিয়া অবগত নহেন। অতএব শরৎচন্দ্রকেই আগামী কল্য কংগ্রেস মহাসভায় উক্ত প্রস্তাবনা উপস্থিত করিতে হইবে। তারপর দিন শরৎচন্দ্র কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তাহা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। ইহার কয়েকদিন পরে রিজলি সাহেবের সারকুলার লেটারের মর্ম্মানুসারে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসাম প্রদেশভুক্ত না করিয়া ঢাকা ডিভিসন, চট্টগ্রাম ডিভিসন, রাজসাহী ডিভিসন ও প্রেসিডেন্সি ডিভিসন হইতে যশোহর ও খুলনা জেলা ও আসাম প্রদেশ লইয়া নূতন একটি প্রদেশ সৃষ্ট হইবার এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় এবং ঐ বিষয়ে ঢাকাবাসিগণের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য, ঢাকা নবাবএষ্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার মিঃ জি, এন্ গার্থ সাহেবের বাড়ীতে ঢাকার ২৫জন হিন্দু ও মুসলমান নেতাগণকে আহ্বান করিয়া উক্ত নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। ঢাকার নবাব স্যর সলিমুল্লা সাহেবও ঐ মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন। ঐ মিটিংএ উপস্থিত হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গ ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। লর্ড কার্জ্জন এই নূতন প্রদেশ স্থাপনের প্রস্তাব সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ আগমন করেন ও ঐ সকল স্থানে ধারাবাহিকরূপে বক্তৃতা করেন। ঢাকাতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নবাব স্যার সলিমুল্লা বিপুল আয়োজন করেন। ঢাকা মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে অভিনন্দন দেওয়ার প্রস্তাব হয়। ঢাকার তদানীন্তন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ র‍্যাঙ্কিন সাহেবের সভাপতিত্বে কতিপয় ডিঃ বোর্ডের মেম্বর ও মিউনিসিপাল কমিশনরের এক কমিটি অভিনন্দন প্রস্তুতের জন্য গঠিত হয়। এই কমিটিতে শরৎচন্দ্র একজন সভ্য ছিলেন। তিনি বঙ্গব্যবচ্ছেদে সর্ব্বসাধারণের অভিমত নাই এই বিষয় উক্ত অভিনন্দন পত্রে লিখিতেচাহিলে মুসলমান ও রাজকর্ম্মচারী মেম্বরগণ তাহাতে স্বীকৃত হন না। এই বিষয় লইয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত

ঘোর বাদানুবাদ হয়। শরৎচন্দ্র বলেন যে লর্ডকার্জ্জন যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব লইয়াই ঢাকায় আসিতেছেন তখন এই বিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপাল কমিশনরগণের মত প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত অন্যরূপ হওয়ায় তাঁহাদের মতানুসারেই অভিনন্দন পত্র লিখিত হয় ও তাহাই লর্ডকার্জ্জনকে দেওয়া স্থির হয়। তখন শরৎচন্দ্র ও ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কতিপয় মেম্বর উক্ত বোর্ডের মেম্বর-পদ পরিত্যাগ করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণের মধ্যে তিনি একা কমিশনারের পদ পরিত্যাগ করেন। লর্ডকার্জ্জনকে অভিনন্দন দেওয়ার যে সভা আসান-মঞ্জিলে হয় ঐ সভায় উক্ত পদত্যাগী মেম্বরগণকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। লর্ডকার্জ্জন ঢাকায় আসিবার পর উক্ত বিষয় অবগত হইলে তাঁহাদিগকে পরে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বঙ্গব্যবচ্ছেদের ও স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে বঙ্গের কেন্দ্রস্থল ঢাকাতে ছিল। এই সকল কার্য্যে শরৎচন্দ্র প্রভূত স্বার্থত্যাগ করিয়া যোগদান করেন এবং তিনি ঐ সকল আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও অগ্রণী ছিলেন।

১৯২০ সনের পূর্ব্বে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সভাপতি থাকিতেন। এই সময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণের যেরূপ ক্ষমতা ছিল তাহাতে মনোনীত মেম্বরগণের মতামত প্রায়ই গ্রাহ্য হইত না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মতানুসারেই জেলাবোর্ডের সমুদয় কার্য্য পরিচালিত হইত। শরৎচন্দ্র ১৮৯৮ সনে প্রথমে জেলা বোর্ডের মেম্বর হইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যানের কার্য্যকলাপ নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। ১৯১২ সনে সম্রাট ৫ম জর্জ্জ দিল্লির দরবারে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত করা ঘোষণা করিলে পূর্ব্ববঙ্গের ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারীগণ ও বেসরকারী ইংরেজগণ বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দিল্লির দরবারের পর

সম্রাটের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে বঙ্গদেশের সমগ্র ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেওয়ার প্রস্তাব হয়। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের এক সভায় শরৎচন্দ্র ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে কতিপয় ইংরেজ মেম্বর ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। এই বিষয় লইয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত বাদানুবাদ হইতে থাকে। যখন দেখা গেল যে ইংরেজ সভ্যগণ সম্রাটকে অভিনন্দন দেওয়ার বিপক্ষে তখন শরৎচন্দ্র স্পষ্টভাবে বলিলেন যে ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের মেম্বরগণ মধ্যে যে অলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell) আছে তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। এই কথা বলামাত্র ইংরাজ মেম্বরগণ মস্তক অবনত করিলেন এবং নির্ব্বিবাদে শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সিভিলিয়ন ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অনেক সময় শরৎচন্দ্রের নির্ভীকতা ও সৎসাহসের প্রশংসা করিয়াছেন। ১৯১৪ অব্দে তিনি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান মনোনীত হন এবং ১৯২০ সনে প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত এই কার্য্য করেন। ডিষ্ট্রীক্টম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যানগণ শরৎচন্দ্রের উপর ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের সমুদয় কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে থাকিতেন এবং বাৎসরিক রিপোর্টে তাঁহার কার্য্য নিপুণতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ১৯২০ সনে ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্তের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে শরৎচন্দ্রই প্রথমে ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েন। ইং ১৯১৯ সনে প্রবল ঝটিকায় ঢাকা জেলার প্রায় সমুদয় ডিস্‌পেনসারী গৃহ ও বহু রাস্তা ও পুল একেবারে ধ্বংস হয়। শরৎচন্দ্র তাঁহার চেয়ারম্যানি আমলে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সাধারণের আয়দ্বারা ও বিনাঋণে ঐ সকল ডিসপেনসারি গৃহ পাকা এমারতে পরিণত করেন এবং রাস্তা ও পুল সমূহের পুনঃসংস্কার করেন। বোর্ডের বহু স্কুল গৃহও ঐ ঝটিকাতে ভগ্ন হইয়াছিল, ঐ সকলেরও সংস্কার

করেন। তিনি ঢাকা জেলার প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জলের সরবরাহ করার জন্য পাকা ইন্দারা বা পুষ্করিণী খনন করিতে আরম্ভ করিয়া বহু থানায় ঐ সকল কার্য্য করাইয়াছেন। কচুরী পানা (Water hyacinth) বিনাশের জন্য তিনি ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যে এক নিয়ম (Byelaw) প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে পূর্ব্ববঙ্গের অপর কতিপয় জেলা বোর্ডও ঐরূপ নিয়ম করিয়াছেন এবং ঐ নিয়মের উপরে নির্ভর করিয়াই বেঙ্গল ওয়াটার হায়াসিন্থ কমিটি কচুরী পানা বিনাশের জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, লর্ডকার্জ্জনের ঢাকা আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া বিষয় লইয়া অভিনন্দন প্রস্তুত কমিটির অধিকাংশ মেম্বরগণের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মেম্বরী ও মিউনিসিপাল কমিসনারী পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরেই তিনি পুনরায় উক্ত উভয় পদে পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটীর কমিশনাররূপে তিনি উক্ত কমিটির প্রায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার বিনা অভিমতে চেয়ারম্যান কি অন্য কোন কমিশনার প্রায় কোন কার্য্যই করিতেন না। কমিশনারগণ তাঁহাকে দুইবার চেয়ারম্যান পদে নির্ব্বাচিত করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ঢাকা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের গুরুতর কর্ত্তব্যকার্য্য রীতিমত করিতে পারিবেন না বলিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহার উপদেশে ঢাকা মিউনিসিপালিটির জলের কলের পুনর্গঠন ও মৃত্তিকার নীচে পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুতের অবতারণা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণের পক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও উচ্চ আদর্শ যাহা তিনি দেখাইয়াছেন তাহা নিতান্ত অনুকরণীয়। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের পূর্ব্বে তিনি তিনবার ঢাকা বিভাগের মিউনি-

নিপালিটি সমূহের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর হওয়ার প্রার্থী হন। প্রথমবার (ইং ১৯১৪) বরিশালের অনারেবল মহম্মদ ইছমাইল সাহেবের সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা হয়, এই সময় ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লা সাহেব উক্ত ইছমাইল সাহেবকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তথাপি মাত্র ২ ভোটের জন্য শরৎচন্দ্র পরাস্ত হন। দ্বিতীয় বারে (ইং ১৯১৬) ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক স্বর্গীয় অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা হয়। অম্বিকা বাবু ও শরৎচন্দ্র উভয়েই সমান সমান সংখ্যক ভোট পাইলে ঢাকার ডিভিসনল কমিশনর নির্ব্বাচনের নিয়মানুসারে লটারী করেন। তাহাতে অম্বিকা বাবু জয়ী হয়েন। অম্বিকা বাবু অসুস্থতা নিবন্ধন পরে পদত্যাগ করিলে শরৎ চন্দ্র তৃতীয় বার (ইং ১৯২০) ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্রের প্রতিযোগিতা সত্বেও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়া বেঙ্গল কাউনসিলের মেম্বর স্বরূপে মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্ত্তণ হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি অন্যান্য বিষয় মধ্যে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাবের কারণ অনুসন্ধান ও তাহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ, ঢাকা জেলার নদী নালা সংস্কার, ঢাকাসহরের উন্নতিকল্পে একটী ইম্প্রুভমেণ্টট্রাষ্ট গঠন, রেল ও ষ্টীমারে যাত্রীগণের জন্য সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। আইন সভা কর্ত্তৃক গঠিত মূল্য বৃদ্ধি কমিটি (High Prices Committee,) শিশুমঙ্গল (Child Welfare Commitee) ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কচুরীপানা কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হইয়া ঐ সকল কমিটির কার্য্য অতি দক্ষতার সহিত করিয়াছেন। ঢাকা হইতে মানিকগঞ্জ যাতায়াতের অসুবিধা

নিবারণ করার জন্য ঢাকা আরিচা রেলওয়ে প্রস্তুত করার জন্য আজ ২৫ বৎসর কাল তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে আন্দোলন করিতেছেন। ঢাকা জেলা মধ্যে প্রবাহিত বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র শীতলক্ষ্যা প্রভৃতি নদী সংস্কারের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালের গবর্ণর স্বরূপে রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্যের সুব্যবস্থা ও ঐ হাসপাতালের বহুসংস্কার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় ঐ হাসপাতাল প্রথম শ্রেণীর সরকারী হাসপাতাল স্বরূপে গবর্ণমেণ্ট ইহার ভারগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের স্থাপন সময় হইতেই মেম্বর আছেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় পরীক্ষার জন্য যে বজেট্ কমিটি হইয়াছিল তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন এবং অতি দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এক রিপোর্ট দিয়াছিলেন। ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলি স্কুলের তিনি একজন ট্রাষ্টি ও গভার্ণিং বডির প্রেসিডেণ্ট্ ও ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টার মিডিয়েট্ কলেজের গভার্ণিং বডির মেম্বর আছেন। পূর্ব্ব বঙ্গ জমীদার সভার বহুদিন জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন এবং মেম্বর আছেন। ঢাকা জেলার সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রকারের হিতকর কার্য্যে তিনি অগ্রবর্ত্তী। ইহার পিতা ঈশান চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাং ১২৯৫ সনের ৪ঠা আষাঢ় তারিখে ও তাঁহার মাতা অনঙ্গময়ী দেবী বাং ১৩১৪ সনের ১২ই ভাদ্র তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশীভূষণ বাং ১৩১৯ সনের ১২ই আশ্বিন ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র বাং ১৩০২ সনের ১লা চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী বসন্তকুমারী দেবীর বাং ১৩০৯ সনের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে ঢাকাতে ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হয়। তারপর তিনি

উথ্লীর গোস্যামী বংশের শ্রীমতী কমল কামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে শ্রীমান অবিনাশ চন্দ্র বাং ১৩০৩ সনের ৪ঠা কার্ত্তিক তারিখে ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে শ্রীমান সমরেন্দ্র চন্দ্র বাং ১৩১২ সনের ২৫শে বৈশাখ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কোন কন্যা সন্তান হয় নাই।

স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র বসু

কলিকাতা আহিরীটোলার বসুবংশ।

কলিকাতা আহিরীটোলার সম্ভ্রান্ত বসুবংশীয়গণ ন্যায় ও ধর্ম্ম-পরায়ণতায় প্রসিদ্ধ। ইঁহারা প্রায় দেড়শত বৎসর হইল এই কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিতেছেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ স্বনামধন্য ৺তারিণী চরণ বসু মহাশয় বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত স্বীয় নিবাস ভূমি নওয়াবকাড় হইতে আসিয়া আহিরীটোলায় প্রথম বসবাস আরম্ভ করেন। ইনিই বিখ্যাত ৺হরিশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতামহ।

৺হরিশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা ৺হরলাল বসু ও জ্যেষ্ঠতাত ৺পার্ব্বতী চরণ বসু বহুধন সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। ৺হরলাল বসু মহাশয় অল্পবয়স্ক বালক হরিশচন্দ্রকে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

বৈষয়িক মামলা মোকদ্দমায় ৺হরিশচন্দ্রের পিতৃরক্ষিত সম্পত্তির অধিকাংশ ব্যয়িত হয়। ইঁহার মাতাঠাকুরাণী অনেক পোষ্য পালন করিতেন। সম্পত্তির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেই পোষ্যবর্গের পরিপোষণে তাহা নিঃশেষিত হয়। উক্ত হরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী নামক বিদ্যালয়ে পড়িতেছিলেন।

অবস্থার দুর্ব্বিপাকে হউক অথবা স্বতঃপ্রবৃত্তির ফলেই হউক এই সময় হইতে বালক হরিশচন্দ্রের হৃদয়ে বিদ্যাধ্যয়নের ব্যাকুল বাসনা জাগিয়া উঠিল। অধ্যয়নে আগ্রহ ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি পুরস্কার স্বরূপ বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত স্কুল হইতে দক্ষতার সহিত জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হয়েন ও কয়েক বৎসরের মধ্যে অধ্যয়নে

আপনার ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া সিনিয়র পরীক্ষার সার্টিফিকেট্ পান . এই সময়ে তিনি মজিলপুরস্থ বিখ্যাত দত্তবংশীয় ৺মধুসূদন দত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন।

একদিকে সংসার চিন্তা অন্যদিকে প্রবল অধ্যয়নেচ্ছা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। শিক্ষকতা করিয়া এতদিন তিনি পাঠের ব্যয় আপনিই সংগ্রহ করিতেছিলেন। সংসার পরিচালনে তাঁহার এমন কেহ দ্বিতীয় অবলম্বন ছিল না যে. তিনি সংসারের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া নবোদ্যমে অধ্যয়নরত হইয়া ব্যাকুল বাসনার পরিতৃপ্তি করিবেন। কর্ত্তব্যের কঠোর অনুরোধে তাঁহাকে এতাদৃশী অধ্যয়নেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিতে হইল।

ছাত্র জীবনের যবনিকাপাত করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। কর্ম্মের জন্য বহু অন্বেষণ করিয়া শেষে সামান্য বেতনে ইংরেজের সওদাগরী আফিসে কেরাণীর পদে প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহার কর্ম্মপটুতা ও হিসাব প্রভৃতিতে তাঁহার অপরিসীম অধিকার দেখাইয়া তিনি উক্ত আফিসে বুক কিপার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন।

কি জ্ঞানে, কি দানে, কি ধীরতায়, কি নম্রতায়, কি বিশ্বস্ততায়, কি কর্ম্মনিপুণতায় তিনি সকল গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তি দর্শনে চক্ষু ভক্তিভরে আপনিই নত হইত, তাঁহার সরল হাসিতে হৃদয় অজস্র পুলকে পুরিত হইত। তাঁহার ধর্ম্ম-পরায়ণতার উপর পূর্ব্বোক্ত আফিসের বড় অংশীদারের এত বিশ্বাস ছিল যে বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সকল কার্য্যের ভার তাঁহারি উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়া যাইতেন।

কিছুকাল পরে তত্রত্য সাহেবদিগের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া মার্কিনের সওদাগর হুইটনী ব্রাদার্স

কোম্পানির আফিসে বুক কিপারের কার্য্যগ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার প্রবল অধ্যয়নেচ্ছা যেন বাণিজ্যেচ্ছায় পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তখন তিনি "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই সংস্কৃত প্রবাদের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন।

উক্ত কোম্পানীর গোলাবাড়ীর নিকট তিনি একটি কাঁচের বাসনের দোকান করিলেন। এই দোকানটির উন্নতিকল্পে তিনি আফিসের কাজ করিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন ও তাহার ফলে আরও দুইটী দোকান বৰ্দ্ধিত করেন।

এই সময় বিলাতি দ্রব্য আমদানী করিবার জন্য তিনি হরিশচন্দ্র বসু এণ্ড কোম্পানী নামে একটী আমদানী আফিস করেন, এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত আফিস রাধাবাজারে লইয়া যান। পরে আপন আফিসের উন্নতির জন্য পূর্ব্বোক্ত সওদাগরী আফিসের কার্য্য ত্যাগ করেন। হরিশচন্দ্র বসু এণ্ড কোম্পানীর এই আফিসটি এখনও তাঁহার পুত্রগণ ও পৌত্রদিগের দ্বারা উক্ত স্থানে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

দারিদ্র্য ও কঠোরতার মধ্য দিয়া মানুষ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ক্ষমার বৈশিষ্ট্য ভালরূপেই প্রণিধান করিয়াছিলেন, দান ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকৃতরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহার আফিসের সাহায্যে বহু ব্যবসায়ী নিজ নিজ ভদ্রাসন তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিয়া পণ্য দ্রব্য বিলাত হইতে আনয়ন করিতেন। মাঝে মাঝে এইরূপেই ব্যবসায়ীগণ দ্রব্য আনাইয়া পরে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিজ ভদ্রাসন ছাড়িয়া দিতে অথবা তাহা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি গোপনে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া "আমি আপনাদিগের পরিবারবর্গকে পথে বসাইয়া আমার টাকা লইতে প্রস্তুত নহি"—ইহা বলিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে সমস্ত খৎ খণ্ড খণ্ড

করিয়া ফেলিয়া দিতেন ও "ভগবান আমাকে দিয়াছেন আমার একরূপ চলিতেছে। আপনার অবস্থা অস্বচ্ছল; আপনার নিজের জন্য না হইলেও এ ঋণ আপনার পরিবারবর্গের জন্য ভুলিতে হইবে"—এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন।

ব্যবসায়িক দায় হইতে উদ্ধার ব্যতীত বসুবংশীয়গণের অন্যান্য দান-ধর্ম্মের কথা এখনও শুনা যায়। ইনি তিনপুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া ৫৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র কন্যার মধ্যে এখনও দুই পুত্র জীবিত আছেন।

৺উমাচরণ বসু।

শ্রীযুত রাজেন্দ্র কুমার বসুর পিতার নাম ৺উমা চরণ বসু। পিতামহের নাম ৺হরলাল বসু। হরলালের পিতা ৺তারিনী চরণ বসু মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত "দত্তীর হাট" গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া কলিকাতার আহিরীটোলা পল্লীতে ভূমি ক্রয় করিয়া বাস করেন সেই বসত ভূমির একখণ্ডে উমাচরণ বসু মহাশয় নিজ বাড়ী প্রস্তুত করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর, বাঙ্গালা ১২৫৩ সালের ৫ই পৌষ তারিখে শ্রী রাজেন্দ্র কুমার বসুর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারুইপুর গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্ম হয়। তাঁহার মাতামহ ৺নিত্যানন্দ রায় চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র। নিত্যানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বণিতা ৺ দুর্গামণি খ্যাতনামা রাজা নবকৃষ্ণের দৌহিত্রী। রাজেন্দ্র কুমার প্রথমে "ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে" দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করেন। পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৪৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। সেথান হইতে ক্রমান্বয়ে এফ্ এ, বি এ ও বি এল পরিক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার হাইকোর্টে তিনি উকিল শ্রেণীভুক্ত হন। ঐ সনের জুন হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত বেঙ্গল রিপোর্টের তরফে সাব রিপোর্টারের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে একটি অস্থায়ী

মুনসেফীপদে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি স্থায়ীভাবে ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত অস্থায়ীভাবে সবজজের কার্য্য করিয়া ঐ সনের অক্টোবর মাসে স্থায়ী সব জজ পদে নিযুক্ত হন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সহকারী সেসন জজের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পুনরায় ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে আবার ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ৪ মাস বর্দ্ধমানে এডিসন্যাল জেলা জজের পদে কার্য্য করেন। তারপর ঐ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ১ মাসের জন্য কৃষ্ণনগরে অস্থায়ী ভাবে জজের কার্য্য করেন। পুনরায় ১৯০৪ সনের ৺পূজার পূর্ব্বে আন্দাজ ৪ মাস পূর্ণিয়ায় অস্থায়ীভাবে জেলা জজের পদে কার্য্য করেন। ইনি ১৯০৫ সনের জুন মাসে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্‌সন্‌ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন

বংশ তালিকা

রামকৃষ্ণ বসু

তারিণী চরণ বসু

হরলাল বসু (মধ্যম পুত্র)

নন্দরাম বসু, রামগোপাল, উমাচরণ, হরিশ্চন্দ্র

যোগেন্দ্র রায় রাজেন্দ্র কুমার বসু বাহাদুর দেবেন্দ্র সুরেন্দ্র নগেন্দ্র গুণেন্দ্র

অমরেন্দ্র শচীন্দ্র

নীরেন্দ্র জীতেন্দ্র রমেন্দ্র বারীন্দ্র

দীনেন্দ্র দীপেন্দ্র রণেন্দ্র হেমেন্দ্র গোপেন্দ্র

সমরেন্দ্র বিজয়েন্দ্র বিমলেন্দ্র রথীন্দ্র অমলেন্দ্র মনজেন্দ্র বি মন্দ্র

উ পেন্দ্র মনিন্দ্র ঋষীন্দ্র সমিরেন্দ্র রূপেন্দ্র রবীন্দ্র

শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল রায়।

বাঙ্গালা ১২৫৭ সালের ৪ঠা বৈশাখ বগুড়া টাউনের শিববাটী সহর-তলীতে শ্রীযুক্ত গৌর গোপাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রামনৃসিংহ রায়। ইঁহারা জাতিতে বারেন্দ্র কায়স্থ। ভৃগু নন্দীর বংশ, কানুর ধারা, কাশ্যপ গোত্র। ১৩২৩ সালের "কায়স্থ পত্রিকায়" ৩৫২ পৃ: "অষ্টমমনীষার নন্দী "বলিয়া ইঁহাদের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—"উক্ত বংশে গোপী কান্ত রায় কানুনগো হইয়া নিয়োগী ও তদ্বংশীয় সুবুদ্ধি ও কমল সহোদর ভ্রাতৃদ্বয় মোগল সম্রাটের রাজত্ব কালে "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি খাঁর বংশধর গৌর কিশোর রায় নবাবী আমলের শেষে ও ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় মুন্‌সেফ্ নিযুক্ত হন ও তাঁহার পুত্র" চৈতন্য প্রসাদ রায় রাজসাহী দেওয়ানী আদালতের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কমল খাঁর বংশীয় শ্রীযুক্ত গৌর গোপাল রায় বগুড়ার সুপ্রসিদ্ধ নবাব সৈয়দ আবদাস্ সোভান চৌধুরী সাহেবের দেওয়ান পদে বহুকাল যাবৎ নিযুক্ত থাকিয়া অতিশয় দক্ষতা ও যশের সহিত কার্য্য করিতেছেন। তিনি নবাব সরকারের প্রধানতম সচিব হইলেও উক্ত জেলার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য, মিউনিসিপাল কমিশনর, জেলখানার পরিদর্শক প্রভৃতি কার্য্যও দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি এইরূপ রাজসেবা দ্বারা সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক সময়ে দুইবারই "সার্টিফিকেট অব অনার" প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের

রায় বাহাদুর শ্রীগৌর গোপাল রায়

রাজ্যাভিষেক কালে ১৯০৩ খৃঃ দিল্লীতে যে বিরাট দরবার হয়, তাহাতে ইনি সরকার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা সুবুদ্ধি খাঁ ও কমল খাঁ উভয় ভ্রাতার পুত্রগণ যে 'রায়রাঞা' উপাধি পাইয়াছিলেন; তাহা হইতেই উভয়ের বংশধরগণ "রায়" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।"

গৌর গোপাল বাবুর এক কন্যা ও দুই পুত্র। কন্যা মগ্নপ্যারির বিবাহ অষ্টম মনীষার বাজুরসের চাকীবংশীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়ের সহিত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়। ইঁহার বিবাহ সাধুখালীর দাশ বংশীয় পাবনার ৺সতীশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কন্যার সহিত হইয়াছে। ইঁহার এক কন্যা ও তিন পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ রায় বগুড়ায় ওকালতী ব্যবসা করিতেছেন। মৌরট্টের চাকী বংশীয় নদীয়া জিলার দুর্লভপুর নিবাসী রায় বাহাদুর পূর্ণচন্দ্র মৌলিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। ইঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা।

গৌর গোপাল বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় বগুড়া কালেক্টরীর সেরেস্তাদার, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় বগুড়ার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল ভাইস-চেয়ারম্যান এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায় তাড়াশের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৺রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের এষ্টেটে কার্য্য করিতেছেন।

কোণার মিত্র বংশ

জেলা ২৪ পরগণার ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলবর্ত্তী সাধকশ্রেষ্ঠ রাম প্রসাদের জন্মস্থান হালিসহরের সন্নিহিত দক্ষিণকোণা সর্ব্বজনবিদিত প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই কোণা গ্রামের বিশিষ্ট গৌরব স্থানীয় মিত্র বংশ ও মিত্র বংশীয়গণ। এই আদর্শ কায়স্থ বংশই সর্ব্বতোভাবে গ্রামের গৌরব-শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কোণা সর্ব্বজনবিদিত করিয়াছেন। ইদানীন্তন যদি কোণার গৌরব-শ্রী কিছু হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা মিত্র বংশের কোন ত্রুটির জন্য নহে, দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রকোপই তাহার প্রধান কারণ।

মিত্র বংশের আদি পুরুষ সুখদেব মিত্র হুগলি জেলার অন্তর্গত বন্দীপুর হইতে কোণায় আগমন করেন, তাঁহার এই আগমনের একটা বিশেষ উপলক্ষ্য ছিল। সুখদেব মিত্র মহাশয় যে বন্দীপুরের মিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই মিত্র বংশের দেশব্যাপী যথেষ্ট খ্যাতি আছে। প্রাতঃস্মরণীয় নীলকমল মিত্র মহাশয়ের সুনাম ও সুযশ ভারতবিদিত এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র চারুচন্দ্র মিত্রও পিতৃ পদাঙ্ক স্মরণ-পূর্ব্বক দেশ ও লোক সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বন্দীপুর মিত্র বংশ গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

কোণার মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা শুকদেব মিত্র হুগলীতে নবাব ফৌজদারের অধীনে কাজ করিতেন। তিনি কোণার তৎকালীন প্রসিদ্ধ ধনী ৺অনন্তরাম শীলের কন্যা শ্রীমতী নবমল্লিকার পানিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ সূত্রেই তিনি কোণায় বাস করেন। ইহা নবাবী আমলের কথা।

ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পর হইতেই মিত্র বংশীয়গণ ইংরাজী ভাষা-শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং অনেকেই পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বিশ্বনাথ মিত্র ও দেবনাথ মিত্র কলিকাতার অনেক ধনী ও জমিদার বংশীয়গণকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং এই শিক্ষাদানের সাফল্যের জন্য তাঁহাদের সুযশঃ নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিশ্বনাথ মিত্র তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকলণ্ডের কোন নিকট আত্মীয়কে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ ছাতু-লাটু বাবুরও শিক্ষক ছিলেন। তিনি কলিকাতার শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজে "মাষ্টার" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

মিত্র বংশের কথা বলিতে বা লিখিতে গেলে শুকদেব মিত্রের পৌত্র চন্দ্রকুমারের নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই চন্দ্রকুমারের পত্নী আনন্দময়ী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। সতীর পুণ্য তেজে আজও মিত্র বংশ সমুজ্জ্বল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শুকদেব মিত্র মহাশয় নবাবী আমলে কোণায় আসিয়া বাস করেন এবং সেই সময় হইতে কোণার মিত্র বংশ কুলে-শীলে, বদান্যতায় ও জ্ঞানগৌরবে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইংরাজগণ যখন বঙ্গদেশ জয় করিয়া বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, সেই সময়ই হইতেই মিত্র বংশ জনসমাজে প্রতিষ্ঠান্বিত এবং সেই প্রতিষ্ঠা এখনও সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা মিত্র বংশের আর বেশী শ্লাঘার কথা কিছুই হইতে পারে না। শুকদেব মিত্রের পুত্র ইন্দ্র নারায়ণ মিত্রের তৃতীয় পুত্র দেবনাথ মিত্র। ইনি কলিকাতা টাকশালে চাকরি করিতেন। তাঁহার খুল্লতাত পুত্র গুরুচরণ মিত্র কেবলই যে ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন তাহাই নহে, তিনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ আদর্শ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার সত্যপ্রিয়তা,

অমায়িকতা, সরলতা ও পরদুঃখকাতরতা এবং পরসেবা প্রবৃত্তির জন্য তিনি জনসমাজে সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। গুরুচরণ মিত্র টাকশালে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু পরীক্ষা বিষয়ক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়, উন্মত্ত সিপাহীদল গুরুচরণকে বেষ্টন করিয়া টাকশাল লুণ্ঠন করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে টাকশালের চাবি লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। বিদ্রোহীদল তাঁহাকে বার বার প্রাণনাশের ভয় দেখাইলেও তিনি কিছুতেই চাবি দেন নাই। তিনি নিজ কর্ত্তব্যসাধনে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের আদর্শ বড়ই বিরল। গুরুচরণ যেরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন, তাঁহার পত্নী গোবিন্দমণিও সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণা আদর্শ হিন্দু রমণী ছিলেন। তিনি তাঁহার সময়ের শিক্ষিত মহিলাগণের আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন। বৃহৎ সংসারে সমস্ত গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া আহারান্তে, প্রত্যহ নিয়মিতরূপে গ্রামস্ত লোকদিগের সহিত সদালাপ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন এবং রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইতেন। দরিদ্র অন্নহীন জনে অন্নদানে তিনি সদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। এই লক্ষ্মীস্বরূপা গোবিন্দমণির গর্ভে গুরুচরণ মিত্র মহাশয়ের চারিটী পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্বনামধন্য স্বর্গীয় রায় ঈশানচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, মধ্যম ৺গিরিশ-চন্দ্র মিত্র বাহাদুর, তৃতীয় হরিশচন্দ্র মিত্র এবং কনিষ্ঠ রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর। ইহারা চারিজনেই স্বধর্ম্মপরায়ণ ও গুণশালী ব্যক্তি এবং মিত্র বংশের গৌরবশ্রী ইঁহাদের দ্বারা বিশেষভাবে সমুজ্জলিত হইয়াছে।

গুরুচরণ মিত্রের চারিটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ স্বনামধন্য স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ঈশান চন্দ্র মিত্র। বাঙ্গলা দেশে ইঁহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। "হুগলীর

ঈশানবাবু" বলিলেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট আর তাঁহার পরিচয় অন্য কিছু দিতে হয় না। ঈশানচন্দ্রের নাম বঙ্গদেশে—বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্র সর্ব্বজনবিদিত। ঈশানচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা তাঁহার পাঠ্য অবস্থাতেই প্রতীয়মান হইয়াছিল। তৎকালীন প্রথানুসারে তিনি প্রথমে পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করিয়া হুগলি স্কুলে ও কলেজে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরিশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ সমাপন করেন। কি হুগলিতে বা প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি যেখানেই যখন শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সেইখানেই তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহার চরিত্রগুণে ও প্রতিভাদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মজীবন যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন আইন অধ্যাপক পণ্ডিত ব্যারিষ্টার মনক্রৌ সাহেব ঈশানচন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং তিনি যে বিশেষ সৌভাগ্যবান ও অশেষ যশের অধিকারী হইবেন এই ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন শেষ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন। পরে তিনি ও তাঁহার সহপাঠিগণ সে সময়ের প্রসিদ্ধ এবং হাইকোর্টের স্বর্গীয় রমা প্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম প্রণালীর পন্থা নির্দ্দেশের জন্য গমন করেন। রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় ঈশানচন্দ্রকে হুগলিতে আসিয়া ওকালতি করিবার পরামর্শ দেন এবং তদনুসারে তিনি হুগলিতেই ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অধ্যবসায় ও বাগ্মীতা প্রথম হইতেই তাঁহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে লাগিল। ওকালতি করিয়া ঈশানচন্দ্র যে প্রতি-পত্তি লাভ করেন, যে সুনাম, সুযশ ও অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং লোক-সমাজ ও গভর্ণমেণ্টের নিকট যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন

সেইরূপ সৌভাগ্য আর কয়জন লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। ঈশানচন্দ্রের আইন-জ্ঞানের গভীরতা, কূট-তর্ক-পটুতা, আইনের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণের পারদর্শিতা ও বাগ্মীতা দেশপ্রসিদ্ধ। ৺তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার কথা অনেকরই মনে আছে। এলোকেশী নাম্নী ব্রাহ্মণ কন্যাকে তাহার স্বামী হত্যা করে। এই হত্যা ব্যাপারে হুগলির দায়রায় যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে সরকারী উকিলরূপে ঈশানচন্দ্র যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আজও লোকে বিস্ময়ের সহিত উল্লেখ করিয়া থাকে। সেই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বী ও আসামী পক্ষের কাউন্সিল হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টারদ্বয় Mr. Branson ও Mr. Jackson ছিলেন। সূক্ষ্ম ও সুবিচারের জন্য চিরস্মরণীয় কলিকাতা হাইকোর্টের জজ Mr. Justice Field হাইকোর্টের জজ হইবার পূর্ব্বে হুগলীর জেলা ও দায়রার জজ ছিলেন। এই Field সাহেব মহোদয় হুগলীর জজরূপে উপরোক্ত ৺তারকেশ্বরের মোকদ্দমার বিচার করেন।

এই মোকদ্দমায় ঈশানচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া Field সাহেব বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলন—"Ishan, I wish I could speak in your language as fluently and as brilliantly as you have spoken in mine."

ঈশানচন্দ্র বহুদিন অতি দক্ষতার সহিত হুগলীতে সরকারী উকিলের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তিনি যে কেবল দেশপ্রসিদ্ধ উকিল ও ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন তাহাই নহে। তিনি হুগলীর সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের অগ্রণী ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং দেশহিতার্থ অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন নাই। হুগলীর টাউনহল ঈশানচন্দ্রের দানশীলতা ও বদান্যতার পরিচায়ক।

তিনি এইরূপ বিবিধ লোকহিতকর কার্য্য তাঁহার জীবনে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। দেশবাসীর হিতসাধন ও স্বার্থরক্ষাই যে দেশ প্রতিনিধির প্রধান কর্ত্তব্য তাহা ঈশানচন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে ঈশানচন্দ্র জনপ্রতিনিধিগণের কর্ত্তব্য ও কার্য্যপ্রণালীর যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকেরই অনুকরণীয়। তিনি বহুদিন হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের আসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের একটা বিশেষত্ব এই যে তিনি গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ এই উভয়েরই বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ঈশানচন্দ্রের স্ত্রী উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত পত্নী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা রমণী বিরল। এইরূপ আদর্শ সহধর্ম্মিণী ও জীবনসঙ্গিনী না পাইলে ঈশানচন্দ্রের জীবন এতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইত কি না বলা যায় না।

আর একটা কথা বলিয়া রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্রের এই সংক্ষিপ্ত জীবন কথার পরিসমাপ্তি করিব। ঈশানচন্দ্র প্রকৃতই স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি যে শুধু কোণার মিত্র কুলই গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই নহে। তিনি কায়স্থ-কুল গৌরব, জাতি-গৌরব এবং দেশ গৌরব। তিনি কোন স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে সেই সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারিতেন। ঈশানচন্দ্রের জীবনীর প্রতি পৃষ্ঠা আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস, চরিত্রবল, শ্রমশীলতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি তাঁহার বংশীয়গণের জন্য ও দেশবাসীর জন্য একটা বড় আশার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চরিত্রবল থাকিলে, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশীল ও অধ্যবসায়ী হইলে প্রত্যেক

মানুষ জীবনে কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে, ঈশানচন্দ্র নিজ জীবনে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। যে ঈশানচন্দ্র পরীক্ষার ফি দিবার জন্য কলিকাতার টাঁকশালে ১৮৲ বা ২৮৲ টাকা বেতনে চাকরী লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই ঈশানচন্দ্রই হুগলীর উকিল দেশবিখ্যাত রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্র। তাঁহার স্মৃতি ও কীর্ত্তি আজও দেশবাসী নির্বিষ্টচিত্তে স্মরণ করিয়া থাকে। রাজদ্বার ও দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি বরণ্যে ছিলেন এবং নিজ উপার্জ্জিত অগাধ ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। আজও তাঁহার কোণার বাটীর দুর্গোৎসব এক বিরাট ব্যাপার এবং এই দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পুজাদির ব্যয়ের জন্য তিনি যে সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা ধনশালী উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই অনুকরণীয়। বহু বৎসর হইল, ঈশানচন্দ্র স্বর্গগত হইয়াছেন, কিন্তু আজও সমস্ত দেশ তাঁহার নাম উল্লেখমাত্রেই শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে। মানবের ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য ও যশের কথা আর কি হইতে পারে!

গুরুচরণ মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র গিরিশচন্দ্র মিত্র। ইনি অশেষ সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন। ইনি যে কেবল সুশিক্ষিত ও সদাশয় ছিলেন তাহা নহে। ইঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, কর্ত্তব্যপরায়ণ, নিষ্ঠাবান, হিন্দু এবং বন্ধুবৎসল, পরোপকারী ও লোকপ্রিয় ব্যক্তি বিরল। ইনি হুগলীতেই দায়ীত্বপূর্ণ সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অনেক দিন হইল, ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার পুত্র কুঞ্জবিহারী মিত্র। ইনি হুগলীতে কালেকটারি Treasurer ছিলেন; এক্ষণে পেন্সন লইয়া হুগলীতেই বাস করিতেছেন। বঙ্গভাষায় ইনি একজন সুলেখক ও কবি। ইঁহার পুত্র শ্রীমান সিদ্ধেশ্বর মিত্র সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান।

গুরুচরণ মিত্রের তৃতীয় পুত্র হরিশ্চন্দ্র মিত্র। ইনিও উচ্চ শিক্ষিত এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার এক পুত্র প্রভাশচন্দ্র বর্ত্তমান এবং কোণার বাটীতে থাকিয়া স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার অন্য দুই পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও আভাশচন্দ্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়ের একপুত্র শ্রীমান্ অনিল কুমার এবং আভাশচন্দ্রের একপুত্র সুনীল কুমার বর্ত্তমান আছেন। প্রভাশচন্দ্রের এক পুত্র [illegible] নাথ মিত্র হুগলীতেই শিক্ষালাভ করিতেছেন।

রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্রের তিন পুত্র। পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন, স্বর্গীয় বিপিনবিহারী মিত্র। ইনি অতি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিপিনবিহারী উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্র গুণে ইনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেশবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেন। বিপিনবিহারী হুগলিতেই ওকালতী করিতেন ও অনেকদিন হুগলি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বিশেষ দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত চেয়ারম্যানের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সৌম্যমূর্ত্তি যুবা পুরুষ অকাতরে অর্থদান করিয়া কত সঙ্কটাপন্নের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির হুগলিতে যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বিপিনবিহারী যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিমত্তা, উচ্চ হৃদয়, দেশ হিতৈষণা ও ভাবুকতার পরিচায়ক। বিপিনবিহারী চন্দননগরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা ছিলেন।

বিপিনবিহারীর দুই পুত্র বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ শ্রীমান সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

ও কনিষ্ঠ শ্রীমান্ সত্যশান্তি মিত্র। সৌরেন্দ্রনাথ সুশিক্ষিত ও হৃদয়বান যুবক। তিনি তাঁহার এই অল্প বয়সেই তাঁহার পৈত্রিক জমিদারী ও অন্যান্য বিষয় কার্য্য পরিচালনার গুরুভার নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া তাহা বিচক্ষণতার ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। হুগলিতে সৌরেন্দ্রনাথ এক জন প্রতিপত্তিশালী, উৎসাহী, বদান্যবর ও সদা সদনুষ্ঠানে নিরত, ধনশালী জমিদার। সৌরেন্দ্রনাথের চরিত্রে একটা বিশেষত্ব এই যে তিনি নীরবে, গোপনে কর্ত্তব্যকর্ম্ম স পরিহিত করিয়াই সন্তুষ্ট—নামজাহির করিবার ও সাধারণের নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জনের স্পৃহা তাঁহার আদৌ নাই। সৌরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলেই এখনই সমাজে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করিতে পারেন।

বিপিনবিহারী মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যশান্তি মিত্র হুগলিতেই শিক্ষা লাভ করিতেছেন। সত্যশান্তি সুশীল ও হৃদয়বান।

রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র লালবিহারী মিত্র এম. এ, বি, এল, হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। তিনি অশেষ সদগুণ-শালী ছিলেন, কিন্তু অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান খোকালাল মিত্র এক্ষণে এম, এস্, সি, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শ্রীমান্ খোকালাল সর্ব্বগুণের অধিকারী ও প্রিয়দর্শন। ইনি যে ভবিষ্যতে কর্ম্মজীবনে বিশেষ সাফল্য লাভ করিবেন এবং কোণার মিত্র বংশের গৌরব অটুট রাখিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র চারুচন্দ্র মিত্র। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী ছিলেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। চারুচন্দ্র মিত্র বংশের সকল গুণেরই

অধিকারী ছিলেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, অতি অল্প বয়সেই ইনি লোকান্তরিত হন। এক্ষণে চারুচন্দ্রের একটীমাত্র নাবালিকা কন্যা বর্ত্তমান।

রায় বাহাদুর মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র গুরুচরণ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয়, স্বদেশহিতৈষী, আদর্শ চরিত্র লোক বিরল।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে কোণায় তাঁহার পিত্রালয়েই মহেন্দ্র চন্দ্রের জন্ম হয়। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হালিসহরস্থ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। মেকলে-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালী তখন অঙ্কুরিত হইয়াছে মাত্র। আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ৺হেমেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় ব্রজনাথ মিত্র মহাশয় তৎকালে হালিসহর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি বালক মহেন্দ্র চন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধা দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিতেন এবং অপত্য নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতেন। দুই তিন বৎসর হালিসহর বিদ্যালয়ে অধ্যয়নান্তর মহেন্দ্র চন্দ্র ঐ বিদ্যালয় হইতে একটী বৃত্তি (ফ্রীস্কলার সিপ) পান। তদনন্তর তিনি হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ১৮৲ বৃত্তিসহ পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। অনন্তর হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ঐ কলেজ হইতে সসম্মানে এফ এ, বি, এ, ও এম এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কালে তিনি মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রতিষ্ঠিত "লাহা বৃত্তি" প্রাপ্ত হন। তদনন্তর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজ হইতেই বি এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং

রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বাহাদুর এম, এ, বি, এল,

তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পল ও উড্রো সাহেবের নিকট শিক্ষা-নবিশী করেন।

পঠদ্দশাতেই মহেন্দ্র চন্দ্র অশেষ গুণরাজির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় কঠোর পরিশ্রমী ছাত্র অল্পই দৃষ্ট হয়। সমস্ত দিবারাত্র তিনি পাঠাভ্যাসে নিরত থাকিতেন তাঁহার পিতাও সন্তানবর্গের সুশিক্ষার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র চন্দ্র শিশুকাল হইতেই সরল ও মিষ্টভাষী এবং সেই জন্য কি স্কুলে কি কলেজে সকল ছাত্রই তাঁহার অনুরক্ত ছিলেন। যৎকালে তিনি হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তৎকালে তাঁহার জনৈক সহাধ্যায়ী সাতিশয় দারিদ্র্যবশতঃ বেতন দিতে অক্ষম হন। মহেন্দ্রচন্দ্র আপনার জলপানির টাকা হইতে সহপাঠীর বেতন প্রদান করিয়া বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তার পরিচায়ক এরূপ অসংখ্য ঘটনার [illegible] [illegible] মহেন্দ্র চন্দ্র এক বৎসর ওকা-লতি করিয়াছিলেন। ১৮৭? খ্রীষ্টাব্দে হুগলী আদালতে আসিয়া তিনি ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হন। এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর ঈশান চন্দ্রের ওকালতিতে যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি ছিল, সুতরাং মহেন্দ্র-চন্দ্র তাঁহার আনুকূল্যে ও স্বীয় প্রতিভাবলে অল্প বয়সেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তিনি হুগলী কোর্টে ওকালতির প্রারম্ভেই হুগলী কলেজের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার অধ্যাপনায় মুগ্ধ হইয়াছিল।

মহেন্দ্র চন্দ্র চাকুরীকে ঘৃণা করিতেন। অল্পদিন হুগলী আদালতে ওকালতি করিবার পর মুন্সেফী পদ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক স্বাধীনতাবশতঃ উহা প্রত্যাখ্যান করেন। সাধারণের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা তাঁহার বাল্যাবধি ছিল।

তিনি বিশ বৎসর কাল হুগলীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটীর দুইবার চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন এবং পরে হুগলী চুঁচড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হন। এই পদের কার্য্য উভয়স্থলেই বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন ও করিতেছেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্র চন্দ্র হুগলী জেলার উকীল সরকার ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন এবং একাদিক্রমে ১৭ বৎসর এই পদে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন; পরে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার জন্য এই উচ্চপদ ও অর্থোপার্জ্জন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। তদবধি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি জন-সাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। একাধারে উভয়ের বিশ্বাস লাভ করা কয়জনের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে? হুগলী ভিক্টোরিয়া টাউন হলে এক আহূত সভায় বাঙ্গালার স্বর্গগত মন্ত্রী স্যর সুরেন্দ্র নাথ এ বিষয়টী উল্লেখ করিয়া মহেন্দ্র চন্দ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্র চন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ প্রশংসনীয়। ইনি ইংরাজি ভাষায় "হাজি মহম্মদ মহসীনের" জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তক রচনায় তাঁহার গভীর অনুসন্ধান ও ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিত ৺যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্পাদিত বিখ্যাত "আর্য্য দর্শন" পত্রে ইহার রচিত "হাসি ও কান্না" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই রচনাটী তাৎকালিক সুধীমণ্ডলী কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ইনি আইন সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী। The Commentary of the Specific Relief Act নামক আইন গ্রন্থ প্রণয়নে মহেন্দ্রচন্দ্র অপূর্ব্ব আইন জ্ঞান ও ব্যাখ্যা প্রণালীর পরিচয়

দিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইঁহার আবাল্য মমতা দেখা যায়। চুঁচুড়া সহরে একবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন হয়। সেবার তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকরূপে সমস্ত কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গগতা মাতৃদেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি কায়মন সঁপিয়া সাহিত্য সম্মিলনরূপ বিরাট অনুষ্ঠানে রতী হইয়াছিলেন এবং নিজ হইতে যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন।

হুগলী চুঁচুড়া সহরে এমন লোকহিতকর কার্য্য নাই যাহার অনুষ্ঠানের সহিত মহেন্দ্রচন্দ্রের ঘনিষ্ট সম্পর্ক নাই। ইনি বর্ত্তমানে হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও জেলাবোর্ডের সভ্য; ইমামবাড়ী হাসপাতাল ও স্ত্রী হাসপাতাল কমিটির সদস্য; হুগলী বার এসোসিয়েসনের সভাপতি, ছাত্র-সম্মিলনীর সভাপতি, টাউন হল কমিটীর সভাপতি এবং হুগলী ওয়াটার ওয়ার্কস সমিতির সভাপতি। এতগুলি অনুষ্ঠান ব্যতীত হুগলী জেলার সর্ব্বত্র সাধারণের হিতকর সভাসমিতির অধিবেশনে তিনি সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া নেতৃত্ব করেন অথবা উপদেশাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

হুগলী চুঁচুড়া সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠা মহেন্দ্রচন্দ্রের এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও এই মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান পরলোকগত বিপিন বিহারী মিত্র বি এল এর সাহায্যে সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই বিরাট ব্যাপারের আরম্ভ হয়। সর্ব্বসমেত এই জলের কল স্থাপন কার্য্যে ছয়লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রচন্দ্র স্বয়ং এই ব্যয় বহুল অনুষ্ঠানে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতার বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মেসর্স মার্টিন্ এণ্ড কোংকে এই কার্য্যের কনট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছিল এবং উহারাই ঐ কার্য্য

সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সহরবাসী যে কি উপকার পাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হুগলি ও চুঁচুড়া সহরে বিজলী বাতি তিনি স্থাপিত করিয়াছেন।

তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার ফলেই এই জলকল স্থাপনের জন্য টাকা সংগৃহিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রচন্দ্রের অসাধারণ হিতকর কার্য্য সমুদয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯১২ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার উপলক্ষে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়।

রায় বাহাদুর অতি জনপ্রিয় ব্যক্তি, সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্ত, ব্যবহার অমায়িক। তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত সন্তান শচীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতেও তিনি অস্থির হন নাই। দেশের ও দশের মঙ্গলে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি নিদারুণ পুত্রশোক সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান-পূর্ণ বাগ্মিতা, মনোহারী ভাষার লালিত্য, ভাবের গভীরতা, যুক্তির পারিপাট্য পূর্ণ বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের নিকট সমানভাবে সম্মানিত। মহেন্দ্র [illegible] মিত্র জেলাবাসীর পরম আত্মীয়, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, বিপদের সহায়। বঙ্গীয় [illegible] ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজ[illegible]ন সুপরিচিত। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের ও দশের উপকার করি[illegible]ত থাকুন।

কর্ম্মীপুরুষ চি[illegible]রদিনই আত্মনির্ভরশীল। এইরূপে আত্মনির্ভরশীল কর্ম্মীপুরুষ আবেগভরে [illegible] বলেন—কর্ম্মই ভগবান—Work is God। রাজপুতনার বহুস্থানে কর্ম্মদে[illegible]বীর মন্দির আছে। মহেন্দ্রচন্দ্র নিজ হৃদয়ে কর্ম্মদেবীর মন্দির গঠন করি[illegible]য়া লইয়াছেন। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্রই কর্ম্ম। কর্ম্মই তাঁহার সাধনা, কর্ম্মই [illegible] তাঁহার উপাস্য, কর্ম্মই তাঁহার আরাধ্য

ও আরাধনার বস্তু। তিনি কর্ম্মদেবীর একনিষ্ঠ উপাসক, কর্ম্মদেবীর মন্দিরের দ্বাররক্ষক। মহেন্দ্র চন্দ্রের কর্ম্ম জীবনের আদর্শ অতি উচ্চ। ইঁহার ন্যায় শ্রমশীল কঠোর কর্ম্মীপুরুষ আজকাল বিরল। মানুষ যে বয়সে বিরাম লওয়াই জীবনের শান্তি ও সুখ বলিয়া অনুভব করে এই জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান সেই বয়সে সংসার ভুলিয়া, শোক জ্বালা ভুলিয়া, দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, দেশের সেবায় একেবারে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই লোক-হিত ও দেশ সেবার ভার দেবতার দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই দেবকার্য্যে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া নিজেকে, কোণার মিত্র বংশকে ও তাঁহার দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শে বঙ্গদেশ অনুপ্রাণিত হউক ইহাই আমাদের বাসনা। মহেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় আদর্শ কর্ম্মী ও বঙ্গমাতার কৃতী সন্তান যে খুব বেশী নাই তাহা বলা যাইতে পারে। যিনি কর্ম্ম জীবনের একাগ্রতা ও শ্রমশীলতার আদর্শ দেখিতে চান তিনি যেন মহেন্দ্রচন্দ্রকে দেখিয়া যান।

সমগ্র হুগলী জেলায় ও সন্নিহিত স্থানে এমন কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য ও সদনুষ্ঠান নাই যাহার সহিত রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সংশ্লিষ্ট নন; রায় বাহাদুর দেশে সংখ্যাতীত, কিন্তু হুগলি জেলায় সরকারী কি বে-সরকারী মহলে শুধু "রায় বাহাদুর" বলিলে রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে বুঝায়। ইহা অপেক্ষা তাঁহার লোকপ্রিয়তার নিদর্শন আর কিছুই বেশী হইতে পারে না।

মহেন্দ্রচন্দ্র ফরাসডাঙ্গানিবাসী, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার দ্বারকানাথ পালিত মহাশয়ের কন্যা নীরদা দাসীর পাণি গ্রহণ করেন। মহেন্দ্র চন্দ্রের পত্নিভাগ্য বড়ই ভাল ছিল। তাঁহার পত্নী নীরদা দাসী আদর্শ হিন্দু রমণী এবং বিদুষী ও বিদ্যোৎসাহিনী

ছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুশাস্ত্রাদেশ ও রীতিনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি সুশীলা, কর্ম্মকুশলা, ধর্ম্মপ্রাণা ও ভক্তিমতি হিন্দু রমণী ছিলেন, শুধু এই কথা বলিলে সেই সতীসাধ্বী নারীর গুণরাজির কথা অতি সামান্য মাত্র বলা হয়। তিনি শিক্ষিতা, সুলেখিকা, সুকবি ও অতি উচ্চ ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাঁহার দেব সঙ্গীত ও ভক্তিরস-পরিপ্লুত বিবিধ কবিতা ও অন্যান্য রচনাবলী পাঠ করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া যায়। তাঁহার অন্যান্য বিবিধ রচনার মধ্যে "সঙ্গীত কুসুম" নামক পুস্তক পাঠে তাঁহার উচ্চ মনোভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। মহেন্দ্র চন্দ্রের পত্নী ধর্ম্মেকর্ম্মে বিশেষ উদ্যোগিনী ছিলেন। তিনি গৃহিণীরূপে সাংসারিক কার্য্যে কুশলা, সুনিপুণা ও সেবাপরায়ণা ছিলেন। মহেন্দ্র চন্দ্রের গৃহলক্ষ্মী সর্ব্বাঙ্গীনভাবে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। এই গৃহ-লক্ষ্মীর জীবদ্দশায় মহেন্দ্র চন্দ্রের আবাসগৃহে প্রত্যহ বহু নরনারীকে অন্নবস্ত্র বিতরণ করা হইত। নীরদা দাসী অনেককে মাসিক ও এক কালীন সাহায্য দান করিতেন। দানে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন এবং সেজন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে বহু নরনারী মাতৃহীন হইয়াছে। নারী মঙ্গলোদ্দেশ্যে নীরদা দাসীর জীবন কথা লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়িবে ; তবে একথা বলা বিশেষ প্রয়োজন যে এই স্বর্গগতা সাধ্বী নারী হিন্দু রমণীর কর্ত্তব্যের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কবির কথায় বলা যাইতে পারে, তিনি—

শীতলি তাপিতে   উদ্ধারিতে পতিতে
মৃত্যুমুখে করি অমৃত দান।
শোকে দিয়া শান্তি   বিপদে সান্ত্বনা
আঁধারে আলোক, অজ্ঞানে জ্ঞান।
হাসি পর সুখে   কাঁদি পর দুঃখে
সাধিয়া রমণী জীবন নিকাম।

× × ÷

—এই অপূর্ব্ব মাতৃত্বের সাধনা করিয়া, মাতৃত্বের আদর্শ রাখিয়া তিনি সেই অজানা দেশে—সেই দ্বেষ হিংসা শূন্য অমর ভবনে গমন করিয়াছেন।

সাধ্বী পরলোক গিয়া একমাত্র পুত্রের মৃত্যু-শোক জ্বালা এড়াইয়াছেন। আর তাঁহার পত্নীগত-প্রাণ স্বামী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর পুণ্যময় স্মৃতি লইয়া দেশ সেবায় তাঁহার আজীবন বাঞ্ছিত কর্ম্ম যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মহারথী ভীষ্ম শরশয্যায় শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, শরশয্যায় জগতে মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ দেশসেবক মহেন্দ্রচন্দ্র বৃদ্ধবয়সে একমাত্র পুত্র ও পত্নী হারাইয়াছেন; তাঁহার শোকে বিহ্বল হইবার কথা। কিন্তু তিনি তাহা হন নাই এবং সেটা দেশের সৌভাগ্যের কথা। ভীষ্ম শরশয্যায় মহাসত্যের প্রচার করিয়াছিলেন, মহেন্দ্রচন্দ্র মানসিক বল প্রভাবে ত্যাগ স্বীকার দ্বারা দেশহিতে আত্মনিয়োগ করিয়া কিরূপে রোগ ও জরাশোক ভুলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায় তাহাই দেশবাসীকে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু মহেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয়ে একবারে কোমল অংশ নাই বলা চলে না। কঠোর কর্ম্মযোগী মহেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সাধ্বী, পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীর গুণরাশির উল্লেখ করিলে বোধ হয় যেন সময়ে সময়ে একটু আত্মহারা ও একটু বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাঁহার চক্ষের কোণে জল আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই কঠোরকর্ম্মী মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া ফেলেন।

মহেন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। এখন কেবলমাত্র একটি বিধবা কন্যা বর্ত্তমান। পুত্র শচীন্দ্র নাথ হৃদয়বান যুবক ছিলেন এবং নিজ চরিত্র গুণে অতি অল্প বয়সেই বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিতেন। শচীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায়

লোকপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, সদালাপী, মিষ্টভাষী, দয়ার্দ্র হৃদয়, দরিদ্র ও নিঃসহায়ের বন্ধু, ধনীর সন্তান আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। লোক-হিতই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য নিপুণতার সহিত বন্দোবস্ত করিবার এবং শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিবার শচীন্দ্র চন্দ্রের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি হুগলি, চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও হুগলির অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং এই উভয় কার্য্যই বিশেষ দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করিতেন। শচীন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় মমতায় ভরা ছিল। সেই প্রিয় দর্শন, মিষ্টভাষী শচীন্দ্রচন্দ্র অতি অল্প বয়সেই পত্নী, দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা এবং বৃদ্ধ পিতামাতাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা এই দারুণ শোক-জ্বালা ভুলিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু এ জ্বালা ভোলা যায় না—এ জ্বালা নিভে না। মনস্বী মহেন্দ্রচন্দ্র বুঝি শুভকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া শোকের জ্বালা দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন।

মহেন্দ্রচন্দ্র ৫০ বৎসর কাল নিজের বিস্তৃত ওকালতী কার্য্য ব্যতীত হুগলী জেলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী সরকারী উকিলের কার্য্য বিশেষ দক্ষতা ও অশেষ প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দায়রার মোকদ্দমার প্রারম্ভে মহেন্দ্রচন্দ্রের বক্তৃতা ও জুরিদিগকে তাঁহার মোকদ্দমা বুঝাইবার প্রণালী ও নিরপেক্ষতা অনুকরণযোগ্য। দায়রার মোকদ্দমায় মহেন্দ্রচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিবার জন্য আদালত গৃহ লোকপূর্ণ হয়। সরকারী মোকদ্দমা ব্যতীত তিনি অন্য মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেই সেই মক্কেলের মোকদ্দমায় সফলতা লাভ সম্বন্ধে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। ইহা অপেক্ষা আর কোন উকিলের আর বেশী যশঃসৌভাগ্য হইতে পারে না। মহেন্দ্রচন্দ্রের গভীর আইন

জ্ঞান ও মোকদ্দমা বুঝাইবার প্রণালী তাঁহার দেশব্যাপী খ্যাতির একটি অন্যতম কারণ।

১৯১৭ সালে রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমান বিভাগের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সমূহ দ্বারা বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য মনোনীত হন। এই সময়েই তিনি সরকারী উকিলের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। দেশ-সেবার অভিপ্রায়ে তাঁহার এই ত্যাগ স্বীকার একটী স্মরণীয় কথা। ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যরূপে যে সমস্ত দেশ ও লোকহিতকর কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতে গেলেও একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়িবে; সেইজন্য আমরা অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করিব।

দামোদর নদের ধ্বংস-লীলা সকলেই অবগত আছেন। বারবার দামোদরের বন্যায় দেশের যে কত ক্ষতি হয় এবং মানুষ ও পশু কত দুর্দ্দশাপন্ন হয় তাহা সকলেই জানেন। মহেন্দ্রচন্দ্র ইহার প্রতিবিধানের জন্য অশেষ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গভর্মেণ্টের কতকটা সহানুভূতি লাভ করেন। দামোদরের ও অন্যান্য নদীর উভয়কূলবর্ত্তী স্থানসমূহ বৎসর বৎসর বারবার জলপ্লাবিত হইয়া যাহাতে ধ্বংস মুখে পতিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সজাগ থাকিবার জন্য পূর্ত্তবিভাগ আদিষ্ট হইয়াছেন। বন্যা নিবারণের জন্য বাঁধ বাঁধান ও অন্যান্য কার্য্যে অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং হইতেছে।

নিম্নে মিত্রবংশের বংশতালিকা দেওয়া হইল—

পূত সলিলা ভাগীরথীর জল অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর হয় ইহা মহেন্দ্রচন্দ্রের অসহনীয়। অথচ ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বের কল সমূহের

শ্রমজীবিগণের মল মূত্র দ্বারা ভাগীরথীর জল অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া আসিতেছে। কল সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ দ্বারা সকল কলেরই মল মূত্র নির্গমনের জন্য সেপটিক ট্যাঙ্ক (Septic Tauk) প্রবর্ত্তন করাই ভাগীরথীর জলের শোচনীয় অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হইবার প্রধানতম কারণ। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য মহেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার কাউন্সিল প্রবেশের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত অবিরাম চেষ্টা ও অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। তিনি প্রকৃত প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। এরূপ প্রকৃত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত অতি বিরল বলিয়াই আমদের মনে হয়। মহেন্দ্রচন্দ্রের অবিরাম চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার একবারেই ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার চেষ্টার ফল এই হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট আর তাঁহার সাধুচেষ্টা ও আশু প্রতিকারের দাবী উপেক্ষার সহিত উড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না। সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা Septic Tank সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইয়াছেন। এই অনুসন্ধান কার্য্যে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষজ্ঞ মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গুরুতর সমস্যাটীর সমাধান কল্পে নিয়োজিত ছিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন ও প্রতি-কারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনুসন্ধানের ফল ও প্রতিকারের পন্থা শীঘ্রই জনসাধারণের গোচরীভূত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে নূতন কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ লিখিত অঙ্গীকারপত্র দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন যে, যাহাতে ভাগীরথীর জল দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর না হয় সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং সতত দৃষ্টি রাখিবেন। অন্যপক্ষে অনেক কলের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যদি নির্দ্দিষ্ট

কালের মধ্যে তাঁহাদের শ্রমজীবিগণের মল ও মূত্র নির্গমনের সুব্যবস্থা না করেন ও তাঁহাদের অবহেলার জন্য ভাগীরথীর জল আরও অব্যবহার্য্য ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আইনানুযায়ী যথাবিহিত প্রতিকার করা হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে মহেন্দ্র চন্দ্র এই সমস্যার সমাধানকল্পে সমান ভাবে পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যোগী ও যত্নশীল আছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবেই। তাঁহার দেশবাসী-গণও প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহার সাধু চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক।

দরিদ্র ও সহায়হীনের বন্ধু মহেন্দ্র চন্দ্র, তাঁহার ন্যায় দরিদ্রের প্রকৃত বন্ধু ও সহায়হীনের সাহায্যদাতা ও পৃষ্ঠপোষক সংখ্যায় বেশী বলিয়া বোধ হয় না। রায় বাহাদুর যে কত অসহায় নিম্বল দারিদ্র্য-পীড়িত শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির অন্ন সংস্থান ও পোষ্য প্রতিপালনের উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনুগ্রহের ফলে অনেকেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হইয়াছেন ও সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। মহেন্দ্র চন্দ্র একটী খাঁটি মানুষ, তাঁহাকে সম্যকভাবে চিনিতে হইলে তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইতে হয়। তাঁহার হৃদয়ের ঐরূপ সম্যক পরিচয় পাইবার সুযোগ আমাদের ভাগ্যে অনেকবার ঘটিয়াছে এবং সেইজন্যই আমরা এই খাঁটি মানুষটীকে, এই আদর্শ, অহঙ্কার লেশ মাত্র শূন্য হিন্দুটিকে, এই কর্ম্ম দেবীর ভক্ত পূজারিটীকে চিনিয়া আত্ম-তৃপ্তিলাভ করিয়াছি এবং আমাদিগকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি।

দেশের অন্ন সমস্যা দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশ হিতৈষিগণ, দেশ সেবিগণ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই এই সমস্যা সমাধান করিবার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু মহেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় আর কে অন্ন বস্ত্রহীনের জন্য, ঔষধ পথ্যহীন হতভাগ্য দেশবাসীর জন্য এমন বুকফাটা কান্না কাঁদেন, তাহা আমরা জানি না। তিনি প্রথমে রোগ নির্ণয় করিয়া, রোগের মূল কারণ ধরিয়া প্রতিকারের পক্ষপাতী। দেশ প্রতিনিধিরূপে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল বিষয়ে আলোচনা করিতেন ও প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেন সর্ব্বদাই তাহা উল্লিখিত নীতি অনুসরণ করিয়াই করিতেন। বাঙ্গালার শিক্ষালয় সমূহে কার্য্যকরী শিক্ষা (Vocational education) প্রবর্ত্তনের তিনি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন; তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের অন্ন সমস্যার সমাধান। আমাদের পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। দেশের যুবকবৃন্দ পিতা মাতা ও অভিভাবকগণের বহু অর্থ ব্যয়ে স্কুল ও কলেজে বিদ্যা শিক্ষা শেষ করিয়া অন্ন বস্ত্রের জন্য চাকরীর অনুসন্ধানে বাহির হন; কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া হতাশ হইয়া পড়েন। ফলে চারিদিকে দেশব্যাপী অশান্তি ও হাহাকার, রায় বাহাদুর বহু পূর্ব্বে দেশের এই শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করেন ও প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া উপায় নির্দ্দেশ করিয়া-দেন। দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে এই কঠিন অন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে মহেন্দ্রচন্দ্র আজ ৫।৬ বৎসর কাল অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গদেশের সমস্ত স্কুল কলেজে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বালক ও যুবক ছাত্রগণকে কার্য্যকরী শ্রমশিল্প হাতে কলমে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব (Resolution on vocational education) উপস্থাপিত করেন;

সেই প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভা ও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিগৃহিত হয়। এই সুচিন্তিত প্রস্তাবানুযায়ী বাঙ্গালা দেশের মফঃস্বলে ও সহরে এবং কলিকাতার অনেক স্কুল কলেজে কার্য্যকরী শ্রমশিল্প শিক্ষা দান আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার মিডিয়েট কলেজেও উক্ত প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐরূপ শিক্ষাদানের জন্য চুঁচুড়া, রাণীগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কয়েক স্থানে (Industrial এবং Technical) স্কুল খুলিবার প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন। মহেন্দ্র চন্দ্রের প্রস্তাবানুযায়ী যে দিন বঙ্গের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর সকল বিদ্যালয়ে কার্য্যকরী শ্রমশিল্প শিক্ষাদান করা হইবে সেই দিনটী সমগ্র দেশবাসীর স্মরণীয় দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে। কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন, শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও উন্নতি এবং উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্যে দেশবাসীর আত্মনিয়োগ করা ব্যতীত আমাদের অন্ন সমস্যা সমাধানের যে আর একটী দ্বিতীয় উপায় নাই তাহা চিন্তাশীল কর্ম্মীমাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। মহেন্দ্রচন্দ্র কেবল স্কুল কলেজে হাতে কলমে কার্য্যকরী শ্রম শিক্ষাদানের প্রস্তাব করিয়া ও পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। ঐ সকল বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় একটী কলেজ (Technological college) স্থাপনের জন্যও বিধি মতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বর্থব্যয় করিয়া পাশ্চাত্যভূমে কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালন করা হয় তাহার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এ বিষয়ে মহেন্দ্র চন্দ্রের ও তাঁহার বন্ধুবর্গের শুভ চেষ্টা একবারে নিষ্ফল যায় নাই। কলিকাতায় শীঘ্রই একটী (Technological Institute) স্থাপনের জন্য সকল আয়োজন করা হইয়াছে এবং বাটী নির্ম্মাণের জন্য সরকারী তহবিল হইতে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

মহেন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় নীরব কর্ম্মীর সংখ্যা যে কত অধিক তাহা আমাদের জানা নাই। তবে তিনি যে নীরবে নানাদিকে দেশের জন্য ও তাঁহার দেশবাসীর জন্যই সর্ব্বদা শুভ চেষ্টা করেন তাহা আমরা বেশ জানি এবং তাঁহার শুভ চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হয় এজন্য প্রার্থনা করি। তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহার সকল কার্য্যের কোন সংবাদ রাখেন না; নূতন নূতন সুবিধা ও সুযোগ হইলে তাঁহারা মনে করেন ঐ সকল সুবিধা ও সুযোগ আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

কাঁচরাপাড়ায় ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের একটী বৃহৎ কারখানা (Locomotive workshop) আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে জামালপুর এবং লিলুয়ায় ঐরূপ বৃহৎ কারখানা (workshop) আছে, এই সকল কারখানায় রেলগাড়ী প্রস্তুত, ইঞ্জিন মেরামত প্রভৃতি নানাপ্রকার গঠন ও মেরামত কার্য্য হইয়া থাকে। (Mechanical Engineering) ও Foreman এর কার্য্য হাতে কলমে শিক্ষা করিবার জন্য এই সকল কারখানায় শিক্ষানবিশ গ্রহণ করা হয়। পূর্ব্বে ফিরিঙ্গি যুবকদিগকেই শিক্ষানবিশ গ্রহণ করা হইত। এই কঠিন অন্ন সমস্যার দিনে দেশীয় যুবক-বৃন্দের (Mechanical Engineering ও Foreman এর কার্য্য শিক্ষা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা মহেন্দ্র চন্দ্র বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন এবং নিজ সঙ্কল্প অনুযায়ী চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ও অন্যান্য নেতৃবর্গের অবিরাম চেষ্টার ফলে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ হাতে কলমে (Mechanical Engineering ও অন্যান্য বিবিধ কষ্ট সাধ্য কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দেশবাসীর চেষ্টায় এবং গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষীয় ও অন্যান্য কলকারখানায় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের চেষ্টায় ও আনুকূল্যে দেশীয় যুবকগণ কাঁচড়াপাড়া

রেলওয়ে (workshop) জামালপুর রেলওয়ে workshop লিলুয়া রেলওয়ে workshop ও অন্যান্য রেলওয়ে Workshop Mechanical apprentice রূপে প্রবেশ লাভ করিয়া Mechanical Engineering শিক্ষা করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছেন এবং অনেকে এখনও ঐরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। রায় বাহাদুর মহেন্দ্র চন্দ্রের নাম এ বিষয়ে পথ প্রদর্শকগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এ বিষয় তাঁহার চেষ্টার এখনও বিরাম নাই। খনিজবিদ্যা শিক্ষার জন্য রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে দেশবাসী অনেক যুবক কয়লার খনি সমূহে হাতে কলমে কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন এবং অনেক যুবক শিক্ষা লাভের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খনির কার্য্যাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছে এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। খনিজ বিদ্যা শিক্ষার্থিগণের শিক্ষা সৌকার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট খনিজ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞগণের দ্বারায় বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্য ঐ অঞ্চলে স্থানে স্থানে বক্তৃতা দিবার কেন্দ্র (Lecture Centres) স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রকারে শিক্ষা দানের ব্যয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকে। রায় বাহাদুরের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইছাপুর Gun Factory ও অন্যান্য সরকারী, অর্দ্ধ সরকারী ও বে-সরকারী কল কারখানায় ও ভিন্ন ভিন্ন রেলওয়ে Workshopএ আজকাল আমাদের দেশবাসী যুবক কার্য্যশিক্ষার জন্য mechanical apprentice রূপে প্রবেশ লাভ করিতেছেন। রায় বাহাদুরই বহুদিন হইতে দেশবাসী যুবকদিগের ও তাহাদিগের অভিভাবকগণের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন এবং হাতে কলমে শিক্ষা লাভের বিশেষ আবশ্যকতা ও উপযোগিতা দেশবাসিগণকে বুঝাইয়া আসিতেছেন। তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা

নিষ্ফল হয় নাই। দেশের শিল্প সম্পদ বৃদ্ধি করা মহেন্দ্র চন্দ্রের জীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি কখনও স্বার্থত্যাগ ও অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি জানেন যে শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারাই আমাদের দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হইতে পারে এবং এ সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে গেলে পাশ্চাত্য দেশে গিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া ও পাশ্চাত্য কার্য্য প্রণালীতে অভিজ্ঞতা লাভ করা বিশেষ আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট বিশেষ-ভাবে সাহায্য দান না করিলে যুবকগণের পাশ্চাত্যদেশে গিয়া শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা লাভ করা অসম্ভব। রাজকোষ হইতে শিক্ষার্থী যুবকগণকে বৃত্তি দান না করিলে তাহাদের শিক্ষা প্রাপ্তির আর কোন উপায় নাই। মহেন্দ্র চন্দ্র এইরূপ বৃত্তিদানের বিশেষ পক্ষপাতী এবং সে জন্য তিনি অবিরাম চেষ্টা করিয়া আসি-তেছেন। আশানুরূপ না হইলেও গভর্ণমেণ্ট ঐ রূপ বৃত্তিদান করিতেছেন এবং শীঘ্রই ঐরূপ বৃত্তির সংখ্যা বাড়িবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এ বিষয়ে মহেন্দ্র চন্দ্রের দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা, অধ্যবসায় ও ত্যাগ স্বীকার বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

মহেন্দ্র চন্দ্র বার বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯২০ সালেও তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং তৎপরবর্ত্তী তিন বৎসর কালও তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ইংরাজি ১৯২০ সালে সমগ্র বাঙ্গালার সমুদয় সরকারী আপিস ও আদালত সমূহের সর্ব্বশ্রেণীর (Ministerial officers and menial) কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গত প্রস্তাব করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী কমিটি—Ministerial officers Salary Committee for Bengal—গঠিত হয় এবং তাহাতে দুই জন সিভিলিয়ান ও এক

জন বে-সরকারী সভ্য নির্ব্বাচিত হন। মহেন্দ্র চন্দ্রই ঐ বে-সরকারী সভ্যরূপে কমিটিতে স্থান প্রাপ্ত হন। বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্য সম্পাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। আমাদের দেশবাসীর অনেকের ভাগ্যেই কেরাণীগিরি ব্যতীত জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় বা সুযোগ হয় না; অথচ তাঁহাদের অধিকাংশই অতি অল্প বেতনভাগী। তাঁহার দেশবাসী কঠোর পরিশ্রমী, প্রতিপাল্য পরিবারবর্গদ্বারা ভারাক্রান্ত, অল্প বেতনভাগী কেরাণী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দের জন্য এবং তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য মহেন্দ্র চন্দ্রকে যে কেবল কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত তাহাই নহে, সমস্যাটীর সকল দিক দিয়া আলোচনা করিবার জন্যও ঐ কঠিন সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতি পদবিক্ষেপে কমিটির দুই জন সিভিলিয়ান সভ্যের সহিত দীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার যুক্তি সমূহ এরূপ অকাট্য হইত যে, কমিটির সিভিলিয়ান সভ্যদ্বয় অনেক বিষয়েই তাঁহার মতামত উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। মিত্র মহাশয়ের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ব বোধ ও তাঁহার দেশবাসীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। ফলে তিনি কমিটির সিভিলিয়ান সভ্যদ্বয়ের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। কমিটির উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী সিভিলিয়ান সভ্য দুই জন দেখিলেন যে রায় বাহাদুর মহেন্দ্র চন্দ্র কিছুতেই তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া তাঁহাদের প্রস্তাবিত বেতন বৃদ্ধির হার সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করিতে পারিলেন না ও তাঁহাদের রিপোর্টে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া দুই জনে স্বতন্ত্র রিপোর্ট লিখিয়া তাঁহাদের প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিলেন। মহেন্দ্র চন্দ্রও একখানি স্বতন্ত্র রিপোর্ট লিখিয়া

দাখিল করিলেন। এই রিপোর্ট অর্থাৎ note of Dissent এরূপ তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ যে, মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর ও বহু উচ্চ পদস্থ সিভিলিয়ান ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং দেশের নেতৃবর্গ প্রভৃতি কাহার নিকট হইতে সুখ্যাতি লাভে বঞ্চিত হয় নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই রিপোর্টের সম্যকভাবে আলোচনা হয় এবং মহেন্দ্র চন্দ্রের প্রস্তাবানুযায়ী সমগ্র বাঙ্গালার Ministerial officers ও menials গণের বেতন বৃদ্ধির হার মঞ্জুর হয়। Ministerial officers এবং menials দের দুর্ভাগ্যবশতঃ মহেন্দ্র চন্দ্রের ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাবানুযায়ী গভর্ণমেন্ট ঐরূপ বেতন বৃদ্ধির সকল প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করেন নাই। লোকমত ও ব্যবস্থাপক সভার মত উপেক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক বঙ্গদেশের সমস্ত সরকারী আপিস আদালতে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর সকল কর্ম্মচারীবৃন্দের যে পরিমাণে বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা যে কেবল মহেন্দ্র চন্দ্রের যত্ন, পরিশ্রম, সৎসাহস ও গভীর কর্ত্তব্যজ্ঞানের ফলেই হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিলে শুধু যে সত্যের অপলাপ করা হইবে তাহাই নহে, তাঁহার দেশবাসিগণ অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইবে। মহেন্দ্র চন্দ্রের note of Dissent যিনিই পাঠ করিয়াছেন তিনিই রায় বাহাদুরের তথ্য সংগ্রহের সাফল্যতা, স্পষ্টবাদিতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়াছেন ও তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মহেন্দ্র চন্দ্র তাঁহার রিপোর্টে পৃথকভাবে না লিখিলে এবং তাঁহার note of Dissent না লিখিলেও সিভিলিয়ান সভ্যদ্বয়ের সহিত একমত হইয়া তাঁহাদের রিপোর্টে স্বাক্ষর করিলে গভর্ণমেন্টের বিশেষ প্রীতিভাজন হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি একবারও নিজ কর্ত্তব্য বিমুখ হইবার কল্পনাও করেন নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল দেশহিতকর ও জনহিতকর প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া (by moving resolutions) প্রতিকারপ্রার্থী হইয়াছিলেন আমরা সেই সকল প্রস্তাবের কেবল কয়েকটীমাত্রেরই উল্লেখ করিতেছি এবং সেই কয়েকটী প্রস্তাবের ও ব্যবস্থাপক সভায় সেই প্রস্তাবগুলি আলোচনা করায় কোন ফল হইয়াছে কিনা তাহাও অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালাদেশ একবারে ধ্বংসের পথে উপনীত হইয়াছে এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় মহেন্দ্র চন্দ্র যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন, অন্য কোন সভ্য সেরূপভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিদিত নহি। কি বজেটের সমালোচনা কালে, কি অন্য সময়ে যখনই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তখনই ব্যবস্থাপক সভায় ও অন্যান্য সভা সম্মিলনে তিনি ম্যালেরিয়ার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার অবিরাম চেষ্টার ফলে গভর্ণমেণ্ট আর উদাসীন থাকিতে পারিতেছেন না। স্থানে স্থানে বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতিবিধান ও প্রতিকারের জন্য কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং কার্য্যের প্রসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কালাজ্বর ও বেরিবেরি দেশকে আরও ধ্বংসের মুখে লইয়া যাই-তেছে। ইহার আশু প্রতিকার হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই প্রতি-কার কল্পে মহেন্দ্রচন্দ্র কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এ বিষয়ে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব্বপ্রথমে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন এবং সেই সকল প্রস্তাব ও প্রতিকারের পন্থা আলোচনা করেন। তিনি যাহা বলিতেন

তাহা কোনদিনই উপেক্ষার বিষয় হয় নাই, কোন বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে তিনি অগ্রে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিতেন এবং সে জন্য তিনি পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন এবং সেই সকল প্রস্তাব সমর্থনের জন্য যেরূপভাবে আলোচনা করিতেন তাহা কখনই সারশূন্য রাজনৈতিক বক্তৃতা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাঁহার যুক্তি সমূহ অখণ্ডনীয় হইত এবং তাঁহার তথ্য নির্ণয় প্রণালী সর্ব্বদাই বিশেষজ্ঞগণের প্রশংসা লাভ করিত। কালাজ্বর, বেরিবেরি ও কুষ্ঠব্যাধি বিস্তারের প্রতিকার, শিশু মৃত্যুহারের হ্রাসকল্পে বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে পানীয় জল সরবরাহ জন্য, সর্ব্বত্র গো-শালা ও দুগ্ধশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া খাটি দুগ্ধ সরবরাহের জন্য, ঔষধ পথ্য-হীন দেশবাসীকে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ঔষধদানের জন্য, গ্রামে গ্রামে পূর্ব্বের ন্যায় গো-চারণের জমি নির্দ্ধারণের জন্য, বাঙ্গালা দেশে যে অসংখ্য মেলা হয় সেই সকল মেলার সুব্যবস্থা করিবার জন্য এবং অন্যান্য বহুবিধ দেশহিতকর ও জনহিতকর বিষয়ে মহেন্দ্রচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া আলোচনা করেন। সেই সকল আলোচনা পাঠ করিলে কেহই তাঁহার জ্ঞান ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার দ্বারা উপকৃত দেশবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে আমরা ইহাই আশা করিয়া থাকি।

বাঙ্গালা দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দেশের সর্ব্বত্র অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিরক্ষরগণকে শিক্ষা দান না করিলে বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। মহেন্দ্রচন্দ্র বহুদিন হইতে এই সমস্যা সমাধানের জন্য

অবিরাম চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ৬।৭ বৎসর কাল ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল অবহিত চিত্তে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে উপযুক্ত বেতন প্রদান করিবার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন এবং যখনই কোনরূপ সুযোগ ঘটিয়াছে তখনই ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সহস্র সহস্র ছাত্র উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই কলেজে স্থানাভাব বশতঃ উচ্চশিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে মহেন্দ্রচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই এবং শুধু সমস্যার আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রতিকারের পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে বনের ও বনভূমির অভাব নাই, সরকারী বনবিভাগও আছে এবং অনেক উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারীও আছেন। ফল কিন্তু আশানুরূপ হয় না। বনভূমির উন্নতি ও আয়বৃদ্ধিকল্পে এবং দেশীয় যুবকবৃন্দকে বনবিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে একটী উচ্চঅঙ্গের বনবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মহেন্দ্রচন্দ্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করেন এবং ঐ বিষয়ে সম্যক ভাবে আলোচনা করেন। বনবিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী যুবকগণকে বৃত্তি দান করিয়া ও অধিক সংখ্যায় বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেরাহুন বনবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইবার গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন।

মহেন্দ্রচন্দ্র হুগলিজেলার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের প্রতিনিধিরূপে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যরূপে স্থানপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি কখনই কেবলমাত্র তাঁহার জেলার অভিযোগের আলোচনা করিয়া

ও প্রতিকারপ্রার্থী হইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। সমগ্র বঙ্গের এবং বঙ্গবাসীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অভাব অভিযোগের কথাই তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবস্থাপক সভায় পর্য্যালোচনা করিতেন। তাঁহার চেষ্টা একবারেই নিষ্ফল হইত না। বৎসরের পর বৎসর তাঁহার বজেট আলোচনা পাঠ করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, তাঁহার ন্যায় দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগের কার্য্য প্রণালীর অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকেরই আছে। যিনি গত ৭ বৎসরের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিবেন তাঁহাকেই আমাদের কথার সমর্থন করিতে হইবে।

দেশে রাস্তাঘাটের অত্যন্ত অভাব। যাহাতে সর্ব্বত্র যাতায়াতের রাস্তা প্রস্তুত হয়, সে জন্য তিনি বিধিমতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

বঙ্গদেশে বিস্তৃত ভাবে খাল খননের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে প্রস্তাব করেন ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন তাহা প্রত্যেক দেশবাসীর ও দেশকর্ম্মীর বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। Irrigation ও Railway সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য।

বঙ্গদেশে যাহাতে একটী উচ্চ শ্রেণীর কৃষি বিদ্যালয় ও বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রমজীবি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকে মিত্র মহাশয় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। সরকারের ব্যয় লাঘব কল্পে, বিশেষতঃ পুলিশ বিভাগের অত্যধিক ব্যয় লাঘব কল্পে, তিনি নির্ভীকতার সহিত বর্ত্তমান ব্যয় প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এইরূপ প্রতিবাদের কিয়দংশ সুফল ফলিয়াছে। যথা,—(ক) সরকারী জরিপ কার্য্যের জন্য আর পূর্ব্বের ন্যায় অত্যধিক ব্যয় হইতেছে না।

(খ) মৎস্য বিভাগের ডাইরেক্টরের পদ উঠিয়া গিয়াছে।

(গ) সরকারী সংবাদদাতার (ডাইরেক্টর অফ ইন্‌ফরমেশন) ও অতিরিক্ত লিগ্যাল্‌ রিমেম্‌ব্রেন্সারের পদ উঠিয়া গিয়াছে।

শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সংখ্যক পরিদর্শনকারী নিয়োগ প্রথার সঙ্কোচ হইতেছে। স্বাস্থ্যবিভাগ, কৃষিবিভাগ ও শ্রমশিল্প বিভাগ অনেকটা সাবধানতার সহিত ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শিক্ষা বিভাগের সকল শ্রেণীর শিক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গের বেতন বৃদ্ধির জন্য তিনি সদাই বিশেষভাবে সচেষ্ট আছেন এবং তাঁহার চেষ্টাও অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। কানুনগো, সব রেজিষ্ট্রার, মুনসেফ, সব ডেপুটি কলেক্টার প্রভৃতির বেতন ও অন্যান্য সুবিধা সুযোগ বৃদ্ধির জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার সে চেষ্টা নিষ্ফল যায় নাই।

সালিসী দ্বারা শ্রমজীবি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর ধর্ম্মঘট মিটাইবার প্রস্তাব তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উত্থাপিত করেন। তাঁহার প্রস্তাবের ফল সম্পূর্ণ আশানুরূপ না হইলেও আদৌ নৈরাশ্যব্যঞ্জক হয় নাই। তাঁহার মত ধর্ম্মঘট মিটাইবার দক্ষতা অতি অল্প লোকেরই আছে। ধর্ম্মঘট-কারীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিই ইহার প্রধান কারণ।

খুলনা দুর্ভিক্ষের প্রকোপের কথা তিনি সর্ব্ব প্রথমেই গভর্ণমেণ্টের ও সাধারণের গোচরীভূত করেন এবং নিজেও অর্থ সাহায্য করেন। দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সে জন্য ইহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পুলিশ বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির সভ্যরূপে রায় বাহাদুর মিত্র মহাশয়ের রিপোর্ট ও ব্যয় হ্রাস করিবার প্রস্তাবগুলি গভীর গবেষণার ও নির্ভীকতার পরিচায়ক।

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সভা-পতিত্বে যে কমিটি নিযুক্ত হয়, মিত্র মহাশয় সেই কমিটিরও একজন

সভ্য ছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যগুলি তাঁহার দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সঠিক চিত্র ও তাঁহার দেশবাসিগণের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের বিশেষ পরিচায়ক।

১৯২০ সালে তমলুক অঞ্চলে যে জলপ্লাবন হয় করুণ হৃদয় মিত্র মহাশয় সেই সময়ে সভা সমিতি করিয়া অর্থ সাহায্য করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নাই এবং সেই সময় হইতেই বন্যার জলে দেশপ্লাবনের প্রতিরোধকল্পে বিশেষ সাবধানতা লইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে বার বার অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন।

ইং ১৯২৩ সনের আগষ্ট মাসে আইন পরিষদ সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত, ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভ্যগণ স্বদেশসেবী রাজ-নৈতিক বন্দিগণের মুক্তির জন্য ও অন্যান্য বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব করেন, রায় বাহাদুর মিত্র মহাশয় শুধুই সে গুলির সমর্থন করেন নাই, গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেও আদৌ পশ্চাৎপদ হন নাই।

১৯২২ সালে দ্বারকেশ্বর নদের বন্যায় আরামবাগ মহকুমার বহুস্থান জলপ্লাবিত হইয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাসীবর্গের দুর্গতির সীমা ছিল না। হুগলীর কংগ্রেস কর্ম্মিগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই জল প্লাবিত স্থানে উপস্থিত হইয়া দুঃস্থ, দরিদ্র, অনাহার-ক্লিষ্ট ও রুগ্ন নর-নারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু বহু অর্থ ভিন্ন এইরূপ সেবা কার্য্য হয় না। অর্থ কোথায়? রায় বাহাদুর মিত্র মহাশয় সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবকের উত্তম লইয়া অর্থ সংগ্রহে মাতিয়া গেলেন। তাঁহার সে সময়ের উৎসাহ ও পরিশ্রম যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই চমৎকৃত হইয়াছেন। নিজে সাহায্য করিয়া ও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তিনি কর্ম্মিগণকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন;

সুশৃঙ্খলে সাহায্যদান ও সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেল। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড একটি পয়সাও দিলেন না। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সাধারণের অর্থে (রোডসেসের) আয়ে পরিচালিত, অথচ সেই ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড জেলার এক অংশের অধিবাসিগণ অন্ন, আশ্রয় ও ঔষধপথ্যের অভাবে মরণ-পথে চলিয়াছে, দেখিয়াও একটি পয়সা সাহায্য করিল না। রায় বাহাদুর মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে শুধুই যে জল প্লাবিত স্থানের অধিবাসিগণ বাঁচিয়া গেল, তাহাই নহে। সেখানে (ডোঙ্গল, আরামবাগ) একটি আদর্শ স্থায়ী কর্ম্ম মন্দির স্থাপিত হইয়াছে যথা—(ক) দিবা ও নৈশ বিদ্যালয় (খ) বয়ন বিদ্যালয়, (গ) দাতব্য ঔষধালয় ও রুগ্নদের জন্য সেবা কুঠীর। সেখানে এখন এই কর্ম্ম মন্দিরে কর্ম্মিগণের চেষ্টায় ৫০০।৬০০ চরকা ও বহু সংখ্যক তাঁত চলিতেছে এবং খাঁটী খদ্দর প্রস্তুত হইতেছে। ঢাকা ব্যতীত আর কোথাও খাঁটী খদ্দর তৈয়ারী হইতেছিল না। ডোঙ্গল কর্ম্ম মন্দিরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তাঁতে যে খদ্দর হইতেছে, তাহা দেখিয়া বঙ্গের সুসন্তান, কর্ম্মবীর, কর্ম্মদেবীর উপাসক সার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় ঐ কর্ম্ম মন্দিরের অভিভাবক (Patron) হইয়াছেন ও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া খদ্দর প্রচারের সহায়তা করিতেছেন। কর্ম্মিগণ বলেন ডোঙ্গল কর্ম্ম মন্দির, রায় বাহাদুর মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে ও সাহায্যে স্থাপিত। উহার উপর অন্য কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে যে সমস্ত ষ্টীমার সুন্দর বনের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে, তত্রস্থ নদ নদীর জল কমিয়া গেলেও যাহাতে যাতায়াতের অসুবিধা না হয়, এই কারণে প্রধানতঃ ইংরাজ ব্যবসাদারগণের কার্য্যের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট একটী বৃহৎ খাল খননের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। এই খাল বরাহনগরের পূর্ব্ব দিক দিয়া আসিয়া ভাগীরথীতে মিলিত হইবে এবং ইহার জন্য বহু কোটী টাকা দেশের সাধারণ রাজস্ব

হইতে ব্যয়িত হইবে। অবস্থাভিজ্ঞ লোকের বিশ্বাস এত অধিক টাকা ব্যয় করিয়া এই বৃহৎ খাল খনন করা আদৌ সমীচীন নহে। রায় বাহাদুর প্রথম হইতে এই কথাটা গভর্ণমেন্টকে ও জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কি ইংরাজ, কি দেশবাসী, বহু লোকই রায় বাহাদুরের মতের সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছেন।

ইং ১৯২৩ সালের জুলাই ও আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় আইন পরিষদের যে অধিবেশন হয় তাহাতে কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তাব বে-সরকারী সভ্যগণ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হয়। জেলের বন্দিগণকে বেত মারিবার প্রথা আছে। এই কঠোর প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। রায় বাহাদুর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এই প্রস্তাবের সাতিশয় দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন ও ঐ প্রস্তাব কাউন্সিল কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। রাজ-নৈতিক বন্দীদিগের মুক্তিদান ও রাজ-নৈতিক বন্দিগণ, যাঁহারা কারামুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে, কাউন্সিলে দেশবাসীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া প্রবেশ করিবার অধিকার দান করিবার জন্য দুইটী প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। কেনিয়ার ভারতবাসিগণের অধিকার সমস্যার সমাধানে পক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হইতেছে। বিলাতে শিল্প প্রদর্শনী হইবে। তাহার আনুসঙ্গিক কলিকাতায় একটী প্রদর্শনী হইবে। রাজকোষ হইতে তাহাতে পুনরায় অর্থ সাহায্যে দেশবাসীর অসম্মতি জানাইয়া আর একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। কেনিয়া সমস্যা সমাধানে যে পক্ষপাতিত্ব দেখান হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদকল্পেই এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। এই সমস্ত প্রস্তাবেই রায় বাহাদুর গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী-গণের পক্ষে ভোট দেন। দুঃখের বিষয় দেশ প্রতিনিধিগণের অনেকেই দেশ মত ও লোক মতের বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্টের স্বপক্ষে ভোট দেন। ফলে সেই জন্য এই তিনটী অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

রায় বাহাদুর হুগলী জেলার পোষ্ট আপিস সমূহের কর্ম্মচারী (Postal Union) সমিতির সভাপতি। তিনি এই কার্য্যে সময় দানে আদৌ কুণ্ঠিত হন না।

রায় বাহাদুর মিত্র মহাশয় আদর্শ হিন্দু ও পরম ভক্তিমান পুরুষ। তিনি সাধক রাম প্রসাদের কীর্ত্তি গাথা আরও প্রচারের জন্য রাম প্রসাদ সম্মিলনী স্থাপিত করিয়াছেন এবং তিনিই ইহার সভাপতি।

নিম্নে ইঁহাদের বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল :—
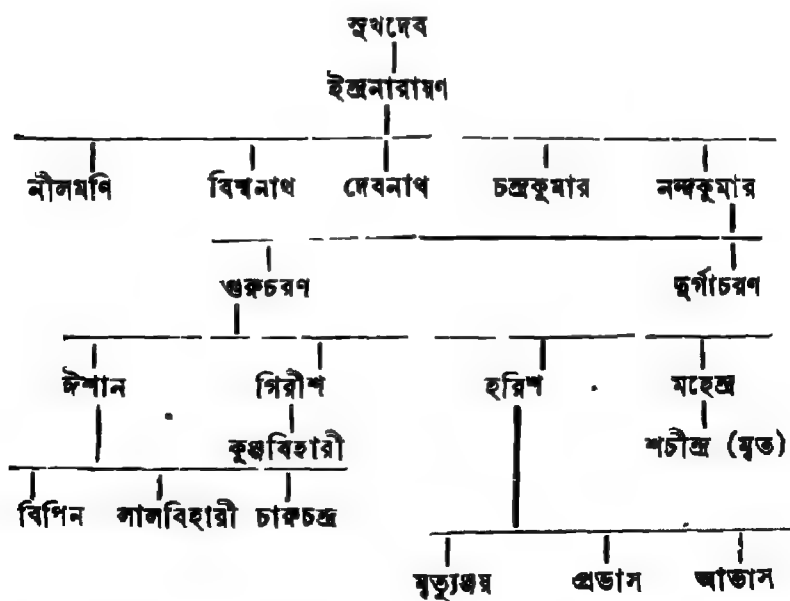
স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

৺তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস হুগলি জেলার অন্তর্গত বন্দিপুর গ্রামে ছিল। তাঁহার পিতা ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া হুগলি জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে বাস করেন। এই কোন্নগর গ্রামেই তারাপ্রসন্নের শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে কিছুদিন মাতুলালয়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

তারাপ্রসন্নের পিতা ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না। তাঁহার পুত্রদিগকে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দিবার বাসনা বলবতী হওয়ায় তিনি তারাপ্রসন্নকে উত্তরপাড়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই খানেই তারাপ্রসন্ন দেশপূজ্য আদর্শ শিক্ষক ৺রামতনু লাহিড়ীর নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। তাঁহার জীবনের উপর ৺রামতনু লাহিড়ীর শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তারাপ্রসন্ন যে ভবিষ্যৎ জীবনে সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন, ৺রামতনু লাহিড়ীর আদর্শ তাহার অন্যতম কারণ।

প্রবীণ বয়সে, যখন তারাপ্রসন্ন হুগলিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সভাপতি হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি ৺রামতনু লাহিড়ীকে শিক্ষকগণের মধ্যে অতি উচ্চস্থান দিয়াছিলেন।

৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চারি পুত্র ছিল। তারাপ্রসন্ন তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। মধ্যম ৺গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন

কলিকাতায় সওদাগরি অফিসে কার্য্য করেন। কিন্তু ঐ কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার একবার কঠিন পীড়া হওয়ায় তারাপ্রসন্ন তাঁহাকে আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেন এবং আজীবন গুরুপ্রসন্নকে অসীম স্নেহের সহিত লালন পালন করেন। তারাপ্রসন্নের তৃতীয় সহোদর ৺রমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় অল্পবয়সেই স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে শ্রীহট্ট জেলার জজ হইয়াছিলেন।

১৮৪০ খৃঃ অঃ হুগলি জেলার অন্তর্গত বন্দিপুর গ্রামে তারাপ্রসন্নের জন্ম হয়। ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বন্দিপুর গ্রাম হইতে কোন্নগর গ্রামে উঠিয়া আসায় তারাপ্রসন্নকে উত্তরপাড়া স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতে হয়। শৈশব কালেই তারাপ্রসন্নের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উত্তরপাড়া স্কুল হইতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কলেজে পড়িবার সময় হইতে তিনি আর তাঁহার পিতার নিকট হইতে এক পয়সাও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ছাত্রবৃত্তি হইতেই তাঁহার পড়ার খরচ চলিয়া যাইত। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই তিনি যথাক্রমে বি, এ, এবং বি, এল পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বি, এল, পরীক্ষায় তারাপ্রসন্ন অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এল পরীক্ষার সূত্রপাত হয়। মাননীয় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চীফ্ জষ্টিস ৺স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র, কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ৺রায় কালিকা দাস দত্ত বাহাদুর, ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺সূর্য্য নারায়ণ সিংহ, কৃষ্ণনগরের ভূতপূর্ব্ব ব্যবহারাজীব ৺যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তারাপ্রসন্ন কিছুকাল

স্বর্গীয় ‍ ‍র প্রসন্ন প ‍ য়ের বর্দ্ধম ‍ নর বসতবাটী

বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিউড়ি সহরের কোনও একটী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অল্পদিন পরেই তিনি শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিয়া মুন্সেফী গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা তারাপ্রসন্নের জীবন পরাধীন চাকুরীতে নিবদ্ধ থাকিবার জন্য গঠিত হয় নাই। তৎকালে মুনসেফগণের সর্ব্ব নিম্নস্তরের বেতন ১০০৲ একশত টাকা ধার্য্য ছিল। এক বৎসর কাল ঐ কার্য্য করিবার পর তারাপ্রসন্ন একটী মোকদ্দমায় যে রায় দেন তাহার সহিত আপীল আদালতের মতের পার্থক্য হওয়ায় তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। যে ব্যবসায়ে তিনি ভবিষ্যজ্জীবনে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেন সেই ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হয়। তিনি শীঘ্রই সিউড়িতে ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা, অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্য শীঘ্রই তাঁহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সিউড়ির একজন খ্যাতনামা উকীল হইয়া উঠেন। তারাপ্রসন্ন মুন্সেফীপদ পরিত্যাগ করায় তাঁহার পিতা প্রথমতঃ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তারাপ্রসন্নের ওকালতির সুনাম ছড়াইয়া পড়ায় তিনি পরে পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

১৮৭৭ সালে বর্দ্ধমানের বিখ্যাত দত্তকপুত্র গ্রহণ মামলা উপলক্ষে তারাপ্রসন্ন বর্দ্ধমানে আসেন এবং ঐ সময় হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি বর্দ্ধমান সহরেই ওকালতি করিতে থাকেন। উপরিলিখিত দত্তক গ্রহণ মোকদ্দমায় খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার উড্রফ্ সাহেব মুক্তকণ্ঠে ৺তারা-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আইনে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন। তারাপ্রসন্ন অল্পদিনের মধ্যেই বর্দ্ধমান আদালতের অবিসম্বাদী নেতা হইয়া উঠেন। তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ওকালতির বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার

সমকক্ষ আর কোন উকিল বর্দ্ধমান আদালত অলঙ্কৃত করেন নাই। আজিও উকিল ও মক্কেলগণ তাঁহার অভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে তারাপ্রসন্ন একটী মোকদ্দমা উপলক্ষে পুরুলিয়ায় গমন করেন এবং ১৯১৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি ঐ মোকদ্দমার পরিচালনা করিয়া সওয়াল জবাব শেষ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে শেষ জীবনে কিছুদিন ওকালতি ছাড়িয়া বিদ্যাচর্চ্চায় শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনে বিশ্রাম দিবেন নাই। মৃত্যুই তাঁহাকে চিরবিশ্রাম আনিয়া দেয়। পরদিন ১৫ই জানুয়ারী (১৩২০ সালের ২রা মাঘ তারিখে) বৃহস্পতিবারে প্রাতঃকালে ছয় ঘটিকার সময় সহসা তিনি বুকে অসহ্য বেদনা অনুভব করেন এবং বসিয়া পড়েন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁহার অমল আত্মা দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অমরলোকে চলিয়া যায়; সে সময় তিনি পুরুলিয়ার ডাক বাঙ্গালাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আত্মীয় পরিজন কেহই সে সময়ে তাঁহার নিকট ছিল না, কেবলমাত্র তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ও পাচক সঙ্গে ছিল। তারাপ্রসন্নের অসুখের সংবাদ পাইবামাত্রই পুরুলিয়ার চিকিৎসকমণ্ডলী আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কিন্তু তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তারাপ্রসন্ন অমর ধামে চলিয়া যান। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া Heart failureএ মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। পুরুলিয়ার উকিল বাবু গুণেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ ভদ্রলোকদিগের যত্নে তাঁহার দেহ Special train এ বর্দ্ধমানে নীত হয় এবং সেখানে তাঁহার পুত্র শ্রীমান দেবপ্রসন্ন শেষকৃত্য সমাপন করিবার পর ঐ Special trainএ তাঁহার দেহ কোন্নগরে নীত হয় এবং সেখানে গঙ্গাতীরে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যাদি সম্পন্ন হয়।

তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। তিনি

দীর্ঘকায়, সুতনু এবং বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার সকল কার্য্যই নিয়মিত-ভাবে এবং যথাসময়ে করিবার অভ্যাস ছিল। প্রত্যহ প্রত্যুষে ৫টার, সময় তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর তিনি আধঘণ্টা প্রাণায়াম করিতেন, তাহার পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি আধঘণ্টাকাল ডাম্বেল ভাজিতেন এবং তাহার পর অন্ততঃ চার মাইল পথ পদব্রজে বেড়াইয়া আসিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাতেও, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, তিনি চার মাইল হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসিতেন। শারীরিক পরিশ্রম এবং নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা তিনি ৭৩ বৎসর বয়সেও যুবকের ন্যায় নীরোগ ও বলিষ্ঠ ছিলেন।

তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিবারবর্গের প্রতি অতিশয় স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার মধ্যম সহোদর ৺গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারবর্গের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তারাপ্রসন্নই বহন করিতেন। তাঁহার তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ সহোদরকে তারাপ্রসন্ন পুত্রের ন্যায় স্নেহে লালন পালন করিয়াছিলেন। তারাপ্রসন্নের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল একালে বড় আর দেখা যায় না। তৃতীয় সহোদর রমাপ্রসন্ন অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তিনি জীবনে বড়ই শোক পাইয়াছিলেন। তিনটী গুরুতর শোক তিনি কোনদিন জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ তাঁহার তৃতীয় সহোদরের অকাল মৃত্যু, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার প্রথমা পত্নীর দেহত্যাগ এবং তৃতীয়তঃ তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা একমাত্র কন্যার বালবৈধব্য। তাঁহার মাতা পিতার কথা বলিতে বলিতে তিনি প্রবীণ বয়সেও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। ওকালতির কার্য্যে তারাপ্রসন্ন অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকিলেও সাহিত্যচর্চ্চায় বিরত ছিলেন না। তিনি কতকগুলি অতি উচ্চভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সঙ্গীতগুলি তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

"তারাগীতি" নামক পুস্তিকায় ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকার একাদশ সঙ্গীতে তাঁহার পারিবারিক শোক নিজের ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন,—

"কোথায় রয়েছ পিতা, প্রাণদাতা জ্ঞানদাতা,
মায়ার মূরতি মাতা লুকায়েছ কিসের ভিতর।
সাবিত্রী সম বনিতা, সহোদর ও জামাতা,
দুঃখিনী মম দুহিতা, চেয়ে দেখ না মা একবার॥
কাতর হয়েছে মন, ভাবি আমি অনুক্ষণ,
কোথা পাব দরশন প্রিয়জন বদন সুন্দর।
হেরি যদি একবার, রাখিব আঁখি ভিতর,
অন্তরেরই অন্তর দিব না হইতে পুনঃ আর॥"

তারাপ্রসন্নের অন্তঃকরণ অতি কোমল ছিল। বাহিরে তিনি সময়ে সময়ে রুক্ষভাষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতি উদার ও নির্ম্মল ছিল। তিনি অনেক লোককে অনেক দান করিতেন কিন্তু কেহ কিছুমাত্র জানিতে পারিত না।

শৈশবকালে দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি দরিদ্র বিদ্যার্থী বালকদিগকে চিরদিন স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি প্রতি বৎসর পাঁচটী দরিদ্র বালককে তাঁহার বাটীতে আহার বাসস্থান দিয়া তাহাদের বিদ্যার্জ্জনের সহায়তা করিতেন। তাঁহার পুত্র ঐ নিয়ম অদ্যাপি বজায় রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে তিনি অতিশয় আদর করিতেন এবং তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে ভালবাসিতেন। প্রায় একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি বার্ষিক 'বিদায়' দিতেন। তাঁহার পুত্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের "বিদায়" অদ্যাপি বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহার স্বগ্রাম কোন্নগরে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপনের

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

জন্য তারাপ্রসন্নবাবু বার হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৩২০ সালে শ্রাবণ মাসে বর্দ্ধমানে প্রবল বন্যা হয় এবং অনেক দরিদ্র লোকের ভিঠা বাড়ী ভাসিয়া যায়। তিনি ঐ সকল বন্যাপীড়িত লোকের সাহায্যের জন্য চারি হাজার টাকা দান করেন। তিনি প্রায় প্রতি বৎসরই দরিদ্র দুঃখীদিগকে শীতকালে কম্বল বিতরণ করিতেন। তিনি যে উকিল-দিগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তারাপ্রসন্ন যে মোকদ্দমার ভার লইতেন তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য ঐকান্তিক যত্ন করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য কেহ দেখে নাই।

তিনি একবার আসানসোল রেলধর্ম্মঘটকারী আসামীদিগের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। লর্ড সিংহ (তদানীন্তন স্যার এস, পি, সিংহ) ঐ মোকদ্দমায় গভর্ণমেণ্ট পক্ষে এডভোকেট জেনারেল স্বরূপ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। লর্ড সিংহ ঐ মোকদ্দমায় তারাপ্রসন্নের আইন জ্ঞানের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরপ্রেমে তারাপ্রসন্নের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তিনি বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ পূজা ভালবাসিতেন না। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে তিনি ঈশ্বরের চিন্তা করিতেন।

তারাপ্রসন্ন সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। সঙ্গীতজ্ঞ লোকের নিকট তিনি অবসর সময়ে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার রচিত একটী অতি সুন্দর জগদ্ধাত্রী স্তোত্র "তারাগীতি" নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়াও—এপারের টাকা কড়ির প্রভূত আস্বাদ পাইয়াও তিনি যে পরপারের কড়ি সংগ্রহ করিতে ভুলেন নাই, তাহা তারাপ্রসন্নের রচিত গীতিগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই তিনি প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন,

"অবোধ সন্তানে, সে অন্তিমদিনে নির্মম হয়ে মাগো, যেন ফেলে পালায়ো না"

তারাপ্রসন্ন পাঁচ কন্যা এবং একপুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বর্দ্ধমান বিভাগে প্রথমস্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ১৫৲ পনর টাকা হিসাবে ছাত্রবৃত্তি পান। তিনি এখন এম. এ এবং আইন পড়িতেছেন। ১৩৩০ সালে শ্রীমান দেবপ্রসন্নের সহিত তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ৺সত্যকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। তারাপ্রসন্নের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাতা জ্যেষ্ঠা কন্যা বালবিধবা। তাঁহার দ্বিতীয় কন্যার সহিত রাঁচির উকিল ৺নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র "গীতার" টীকাকার এবং ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার তৃতীয়া কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের উকিল ৺যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র "মেঘদূতের" টীকাকার এবং ব্যবহারাজীব ৺ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বাণীবিনোদ মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার চতুর্থী কন্যার সহিত কুড়িগ্রাম নিবাসী ৺গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার সহিত রাঁচির উকিল ৺নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র রাঁচি মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ের পরিণয় হইয়াছে।

তারাপ্রসন্ন বাবুর চারি জামতাই বিদ্বান্ এবং খ্যাতনামা উকিল। তারাপ্রসন্ন বাবুর মধ্যম সহোদর গুরুপ্রসন্ন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র কোন্নগরে পৈতৃক বাড়ীতে এবং মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র সিউড়িতে বাস

করিতেছেন। গুরুপ্রসন্নের জামাতা আলিপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক কন্যার সহিত প্রফেসর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী এম, এ, পি, আর, এস মহাশয়ের পরিণয় হইয়াছে। তারাপ্রসন্নের তৃতীয় সহোদর রমাপ্রসন্নের একমাত্র দৌহিত্রির সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ডাঃ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে।

তারাপ্রসন্নের কনিষ্ঠ সহোদর হরিপ্রসন্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অন্যতম উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। হরিপ্রসন্নের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় Incorporated accountantship পড়িতেছেন।

বংশ পরিচয়।
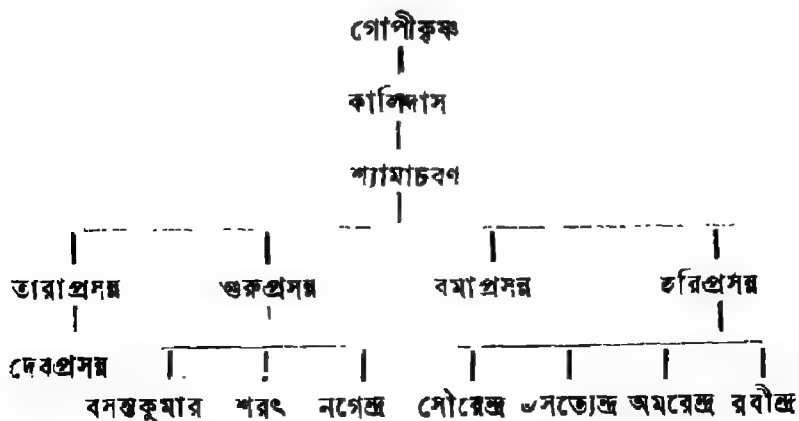
খাঁন বাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হাসান।

বাঙ্গালার রেজেষ্টারী বিভাগে খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হাসানের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ তিনি প্রথম সাব-রেজেষ্টার এবং তিনি স্পেশাল সাব-রেজিষ্টার হইতে রেজিষ্ট্রেসন আফিসের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। সৈয়দ আউলাদ হাসানের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলায়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের বিস্তৃত জায়গীর ছিল এবং সেই জায়গীর তাঁহারা মোগল ও পাঠান সম্রাট্‌দের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এই বংশ হজরৎ সাহ সৈয়দ জালাল বোখারী হইতে উৎপন্ন। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কেননা মোগলেরা বোখারী* লুণ্ঠন করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের মধ্যে অনেকে বিশেষ বিদ্বান ও শিক্ষিত লোক ছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম মোল্লা সৈয়দ হাদি একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, বহুদূর হইতে ছাত্রগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আসিত। খাঁ বাহাদুরের পিতা পরলোকগত হাকিম সৈয়দ আবুবহাসান অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া লক্ষ্মৌ গমন করেন; লক্ষ্মৌ তখন বিদ্যানুশীলনের জন্য ভারতের মধ্যে প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। তিনি লক্ষ্মৌ কলেজে হাকিমী মতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। লক্ষ্মৌ কলেজে পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষা লাভের পর তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। কিছুদিন গৃহে অবস্থান করিবার পর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

শীঘ্রই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবত তিনি কলিকাতা নগরীতে হাকিমী চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কলিকাতার মুসলমান সমাজেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

আমাদের এই জীবনীর নায়ক খাঁন-বাহাদুর সৈয়দ আউলাদ হাসান ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন সমস্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বালকগণকে প্রথমে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় প্রবিষ্ট হন। মাদ্রাসাতেই তিনি প্রধানতঃ ইংরাজী শি[illegible] করেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সবরেজিষ্টার রূপে গবর্ণমেণ্ট চা[illegible]তে প্রবেশ করেন এবং সাঁওতাল পরগণা জেলার বুড়ি নামক স্থানে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে অনেক চাঁদা তুলিয়া তিনি একটী হাসপাতাল ও একটী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতাল ও স্কুল অদ্যাপি বিদ্যমান আছে [illegible] এ[illegible] হাসপাতালটি সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া অধ্যুষিত স্থানে [illegible] এবং ধাত্রী [illegible] সমস্ত পরিশ্রম যান তাঁহার [illegible] পাইয়া থাকে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতালদিগের মধ্যে গণনা হাঙ্গাম (Census riots) উ[illegible] হইলে খাঁন বাহাদুরের প্রভাবে বুড়ী অঞ্চলের সাঁওতালেরা শান্ত ভাবে থাকে। কেবলমাত্র বুড়ি অঞ্চলেই কোন হাঙ্গামা হয় না, কাজেই তথায় মানুষ গণনা কার্য্য বেশ শান্ত ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

বুড়ী হইতে তিনি ঢাকা জেলার শ্রীনগরে বদলী হন। এখানে

তিনি মুসলমান বালকদিগের জন্য চারিটি মকতব প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা অঞ্চলের মধ্যে এই মক্তব চারিটীই সর্ব্বপ্রথমে জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকার স্পেশাল সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। একজন সবরেজিষ্ট্রার এই সর্ব্বপ্রথমে স্পেশাল সব রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হন। ইঁহার পূর্ব্বে বাহির হইতে লোক আনিয়া স্পেশাল রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত করা হইত। তিনি এই পদে দীর্ঘ আঠার বৎসর কাল নিযুক্ত ছিলেন এবং সরকার ও জন সাধারণের বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন সম্মানিত (Honorary) ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি বিচারাসনে একাকী বসিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। তিনি জেলা বোর্ডের সভ্য, মিউনিসিপাল কমিশনার, হাসপাতালের কার্য্য নির্ব্বাহক ও মাদ্রাসা এবং মক্তব কমিটির সভ্যরূপে দেশের অনেক কাজ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রযত্নে মাদ্রাসা শিক্ষাসংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের প্রথম ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের জন্য নূতন রেজিষ্ট্রেশন আইন সংগ্রহ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হন।

তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সরকার ১৯০৭ সালে তাঁহাকে খাঁন বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাকে সনদ দিবার সময় তদানীন্তন ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার বলিয়াছিলেন যে, আপনি দীর্ঘকাল রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে যে কার্য্য করিয়াছেন এবং আপনার জন্ম ও চরিত্রগত যে সম্মান আছে, তাহাতে আপনি এই সম্মান লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আপনি স্বীয় সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যখনই কোন গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে

আপনি তাহা শান্ত করিয়াছেন। আপনি সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সর্ব্বদাই সৎপরামর্শ দান করিয়াছেন এবং সেই পরামর্শে আমি অনেক সময় উপকৃত হইয়াছি।

. পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইলে খাঁন বাহাদুর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অবসর লইয়াও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তিনি এখনও অনেক অবৈতনিক কাজ করিতেছেন এবং অনেক জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। হিন্দু ও মুসলমানের একতা সম্পাদন বিষয়ে তিনি বরাবরই অগ্রণী। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে। অনেক হিন্দু যুবার তিনি জীবিকা ও উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

তিনি ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে বড়ই ভালবাসিতেন এবং অনেক প্রাচীন বিষয় তিনি গবেষণাও করিয়া থাকেন। ঢাকার ইতিহাসে তাঁহাকে সকলেই প্রামাণিক বলিয়া মনে করে। "ঢাকার প্রাচীনত্ব" ও "প্রাচীন ঢাকা" সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা চিরদিন সাহিত্য সমাজে আদৃত হইবে। তাঁহার "ঢাকার প্রাচীনত্ব" (Antiquities of Dacca) প্রবন্ধ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের নিকটও সমাদৃত। তিনি সম্প্রতি ঢাকা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। লর্ড কারমাইকেল ঢাকায় বক্তৃতাকালে তাঁহাকে একাধিকবার ঢাকার আধুনিক ঐতিহাসিক বলিয়া উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকাগারে ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলাদেশের সুন্দর সুন্দর ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজি আছে। "ঢাকা রিভিউ" পত্রে তিনি প্রায়ই ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

খাঁন বাহাদুর গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর একজন সভ্য। শুধু ইহাই নহে; তিনি বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী, বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষৎ, ঢাকা সাহিত্য সমাজ, আঞ্জুমান-ই-তোরাক্কী-ই-উর্দু, নিখিল ভারতীয় মুসলমান লীগ, বাঙ্গালা প্রাদেশিক মুসলমান লীগ, জাতীয় মুসলমান সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা কমিটি প্রভৃতির সভ্য।

দেওয়ান মহম্মদ আছফ।

দুহালিয়া রাজবংশ।

দুহালিয়া রাজবংশের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে চামতলার প্রাচীন রাজবংশীয় নন্দ রাজার বিবাহের বৃত্তান্ত উল্লেখ করা অত্যাবশ্যকীয় বটে। দুহালিয়ার রাজা পুরুষোত্তম রায় মনসবদারের পদ্মিনী কন্যা চন্দ্রকলা রাণীকে চামতলার নন্দ রাজার নিকট বিবাহ দেন। সেই সময়ে যেমন দুহালিয়ার রাজাদের রাজ্যসীমা দক্ষিণ দিকে অতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তেমনি চামতলার নন্দ রাজা উত্তর দিকে পাহাড়কলার মাকুলাভূমি, দক্ষিণে ক্ষেত্রভূমি পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারে আনিয়াছিলেন। সমশ্রেণীর স্বাধীন নরপতি অথচ উপযুক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুপুরুষ দেখিয়া রাজা পুরুষোত্তম অম্লান বদনে নন্দ রাজার সঙ্গে আপনার কন্যা রাজকুমারী চন্দ্রকলার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হন। তিনি যৌতুক স্বরূপ পুটীপলী মৌজা আপন কন্যার বিবাহে নন্দ রাজাকে দান করেন। ঐ পাতবা মৌজার সংশ্লিষ্টে পরিশেষে ধনপুর গ্রাম, চন্দ্রকলা গ্রাম, চন্দ্রকলা বিল (সুরমা নদীর) চন্দ্রকলার বাক নামকরণ হইয়াছে। এই বিবাহের বৃত্তান্ত তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ সেখ কাজি নামধেয় অনৈক কবি কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ লিপিবদ্ধ পুস্তিকা কীটদষ্ট অবস্থায় চামতলা নিবাসী আমান রজা চৌধুরী মরহুমের গৃহে রক্ষিত আছে; সেই পুস্তিকাদি হইতে দুহালিয়ার রাজবংশীয় জমিদার শ্রীযুত দেওয়ান মোহম্মদ আছফ সাহেব তাঁহার কতক অংশ লিখিয়া আনিয়াছিলেন; নিম্নে তাহার বৃত্তান্ত কতক উদ্ধৃত করা গেল :—

তবে পাছে দুহালিয়া রাজ্যের অধিকারী।
দলে বলে মহত্ত্ব আছিলা ছত্রধারী॥
তান ঘরে কন্যা এক গুণে অতিশয়।
বিবাহ করিলা তথ্য দেখিয়া বিষয়॥
রাজযোগ্য ব্যবহার যতেক আছিলা।
দামান্দ কন্যারে সেই দিয়া সম্ভাষিলা॥
দাস দাসী ধনজন যে উচিত আছে।
পুটী পই গাও তবে জে জে দিলা পাছে॥
বিয়া করি ধন্য রাজা সানন্দিত মন।
অধিক প্রতাপ ধনী বিদিত ভুবন॥

বেলগাছি চৌধুরী বংশ।

ভারতে মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে একজন পশ্চিম দেশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান কাজীরূপে যশোহরে আগমন করেন। তাঁহারই সুযোগ্য বংশধর নাজির তরিকউল্লা বেলগাছি চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। উক্ত নাজির সাহেবের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত নাজিরগঞ্জ নামক বন্দর আজ পর্য্যন্তও পাবনা জিলায় বিদ্যমান আছে। বিস্তীর্ণ জমিদারী রাখিয়া পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র চৌধুরী করিমবক্স জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হন। ইনি সঙ্গীতশাস্ত্রে অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার তুল্য সেতারবাদক তৎকালে বঙ্গদেশে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হাকিমী চিকিৎসা শাস্ত্রেও তিনি সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে রুগ্ন ও পীড়িত লোকদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দান করিয়া আপন জ্ঞানের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। তিনি সাতিশয় দানশীল ছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণরাশি প্রজাসাধারণের উপকারার্থেই নিয়োজিত হইয়াছিল। চৌধুরী করিম বক্সের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র চৌধুরী ফয়েজবক্স সাহেবের হস্তে জমিদারীর ভার ন্যস্ত হয়।

তিনি পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া জনসমাজে যাহাতে শিক্ষার বহুল প্রচলন হয়, তজ্জন্য সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে বহু মক্তব, পাঠশালা, ছাত্রবৃত্তি ও মধ্য ইংরাজি স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত প্রজারঞ্জক জমিদার এদেশে কমই দৃষ্ট হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর গুণমুগ্ধ প্রজাবৃন্দ তাঁহার শুভ স্মৃতি রক্ষার্থে বেলগাছিতে ফয়েজবক্স এম, ই, স্কুল প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন। তিনি ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য এবং স্থানীয় মহকুমার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

তাঁহার পুত্র চৌধুরী আলিমজ্জমান বি, এ, এম, এল, এ, বর্ত্তমানে বেলগাছি চৌধুরী বংশের মুখোজ্জ্বলকারী স্বনামধন্য পুরুষ। ১২৭৩ সালের ৯ই আষাঢ় তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল ইঁহার আরবি, পর্শি প্রভৃতি নানাবিধ সুশিক্ষায় ব্যয়িত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে হুগলি কলেজ হইতে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানের মধ্যে খুব কম লোকই সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় এরূপ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। কিছুকাল আইন অধ্যয়নের পর অকস্মাৎ তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অতঃপর তিনি স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং নানারূপ সদনুষ্ঠানের দ্বারা স্বদেশবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। বঙ্গভঙ্গের সময়, সেই স্বদেশী যুগে, যখন সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনের ঘোর বিপক্ষ ছিল, তখন তিনিই শুধু বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে 'স্বদেশী' সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পূর্ব্ব হইতেই তিনি কংগ্রেস ও মোস্লেম লিগের একজন সুযোগ্য সদস্য ছিলেন এবং স্বীয় সুমার্জ্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রভাবে সর্ব্বসমাজেই সমাদৃত হন। ফরিদপুরের মসজিদ, রাজবাড়ীর মোস্লেম বোর্ডিং ও পাংসা হাই স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মূলে তাঁহারই কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত ছিল। তিনি একজন সুবিজ্ঞ দেশ পর্য্যটক। তিনি সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর এবং প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

একাদিক্রমে ৩০ বৎসর যাবৎ তিনি ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সদস্য আছেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে ঢাকা বিভাগের মুসলমান

খাঁন বাহাদুর মৌলভী আলিমাজ্জামান চৌধুরী বি-এ, এম-এল-এ

নির্ব্বাচনী কেন্দ্র হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি এতদূর জনপ্রিয় যে, তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সভ্য নির্ব্বাচিত হইলে নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া অভিনন্দন ও উপঢৌকনাদি প্রদানপূর্ব্বক জনসাধারণ তাঁহার নির্ব্বাচনে আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। ২২ বৎসর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিবার পর তিনি অবসর গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, কার্য্যে যোগদান না করিয়াও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অবস্থান করিতে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি অনেকবার গোয়ালন্দ লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যানের কার্য্যও করিয়াছেন।

তিনি শায়েস্তাবাদের সুপ্রসিদ্ধ জজ স্বর্গীয় নবাব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের পৌত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার এখনও সন্তান সন্ততি নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৌধুরী ইউসোফ আলেমও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে চৌধুরী আলিমজ্জমানের মত জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, জনপ্রিয়, সুশিক্ষিত, পরোপকারী ও কর্ম্মীপুরুষ বিরল।

দেওয়ানবাড়ীর মজুমদার বংশ

পৈত্রিক বাসস্থান মালদহ জেলার অন্তর্গত শিবগঞ্জ পুস্করিয়া গ্রামে দেওয়ানবাড়ীর জমিদারগণের আদিপুরুষ ৺নৃসিংহ মজুমদারের জন্ম হয়। নৃসিংহের বয়স যে সময় মাত্র ৪ বৎসর ঐ সময়ে তাঁহার পিতা ৺রাজকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করেন। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে নিরুপায় হইয়া বালক নৃসিংহকে লইয়া ধৈর্য্যমণি মুরশিদাবাদের অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামে নিজ সহোদর ভ্রাতা ৺গুরুপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার অভিভাবকত্বে বাস করিতে থাকেন। ঐ স্থানেই নৃসিংহের বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হয়। নৃসিংহের তীক্ষবুদ্ধির প্রশংসা ছিল, কিন্তু তদপেক্ষা প্রশংসা ছিল—তাঁহার অধ্যবসায়ের। তিনি যে পিতৃহীন তাহা যেন তিনি ঐ অল্পবয়সেই বুঝিতে পারিতেন এবং এই জন্য অতি অল্প সময়েই আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ ও ইংরাজী ভাষায় সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। নিজ অবস্থার উন্নতি প্রয়াসে অতঃপর নৃসিংহ মুরশিদাবাদ কালেক্টরীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। নৃসিংহ যে পদে নিযুক্ত হন কিছুদিন পরে ঐ পদ উঠিয়া যাওয়ায় তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে রংপুরে আইসেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই সাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে সমধিক সম্মান থাকায় ইনি পুনরায় চাকুরী করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮২১ সালে রংপুর কালেক্টরীর রেকর্ড-কিপার পদে নিযুক্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য-পরায়ণতায় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নৃসিংহ অতি অল্পকাল

মধ্যেই মীর মুন্সী ও পরিশেষে ১৮২৭ সালে উক্ত কালেক্টরীর সেরেস্তাদার পদে উন্নীত হন এবং ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতার ও যশের সহিত কার্য্য করিয়া পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। তৎকালে কালেক্টরীর সেরেস্তাদারকে লোকে দেওয়ান বলিত, এজন্য তিনি সাধারণের নিকট দেওয়ানজী বলিয়া পরিচিত ছিলেন; এই দেওয়ানজী উপাধি হইতেই তাঁহার বাড়ী সাধারণতঃ দেওয়ান বাড়ী নামে সুপরিচিত।

৺নৃসিংহ মজুমদার মহাশয় অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। অতিথি সৎকার ও দানের জন্য ইঁহার খ্যাতি দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও অতিথি সেবার উদ্দেশ্যে তিনি রংপুরের বাটীতে ৺রাধাবল্লভজী বিগ্রহ স্থাপন এবং নিত্য পূজা ও ভোগাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত উক্ত সেবার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।

বিদ্যোৎসাহী বলিয়া নৃসিংহ মজুমদার মহাশয়ের খ্যাতি ছিল; যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তৎকালে রংপুরে তাদৃশ বিদ্বান ব্যক্তির সমাগম কমই হইত,কিন্তু যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের ও স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী,বিদ্যালয় ও অন্যান্য সাহিত্য সমিতির তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৺নৃসিংহ মজুমদার মহাশয় ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বহুতর ভূসম্পত্তি করিতে পারিতেন। তখন বিষয় সম্পত্তির মূল্য অতি অল্প ছিল এবং তাহার সুযোগও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। উপার্জ্জনের অধিকাংশই ধর্ম্মকার্য্য ও সাধারণ হিতকরকার্য্যে ব্যয় করিয়া শেষ জীবনে মাত্র তিনি স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য কিছু সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন।

৺নৃসিংহ মজুমদার মহাশয় ক্রমে দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রী নদীয়া জেলার মেহেরপুর সব ডিভিসনের অন্তর্গত হরেকৃষ্ণপুর

গ্রামনিবাসী ৺বিজয়কৃষ্ণ বংশী মহাশয়ের কন্যা রামমণি। দ্বিতীয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত কেশেখোলা বা টেপরী গ্রামনিবাসী ৺কৃষ্ণনাথ নাগ মহাশয়ের কন্যা প্রেমময়ী। ৺মজুমদার মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত দুর্গাপ্রসাদ বিবাহিত ও অপর তিনপুত্র হরিপ্রসাদ, রাধাপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্র গুরুপ্রসাদ আরবী, পারসী ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য উপযুক্ত পুত্রগণের এবং পরিশেষে গুরুপ্রসাদের ন্যায় কৃতবিদ্য পুত্রের অকাল মৃত্যুতে মজুমদার মহাশয় মুহ্যমান হইয়া পড়েন এবং উহার কিছুদিন পরে ১৮৫৭ সালে (১২৬৪ বাং) তিনি স্বীয় জন্মস্থান ও মাতুলালয় দেখিবার জন্য নৌকাযোগে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে ভাগীরথী-বক্ষে বালসাট গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়। ৺মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কোনও সন্তান জন্মে নাই।

স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার অনুমতিবলে প্রেমময়ী প্রথমতঃ রাধা-গোবিন্দ নামক একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু এই পুত্রও বাল্যেই পরলোকগমন করায় পুনরায় নদীয়া জেলার তেবড়ী গ্রাম নিবাসী ৺হর-লাল বিশ্বাস মহাশয়ের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র রাধারমণকে দত্তক গ্রহণ করেন ও তাহাকে রংপুরে লইয়া আইসেন। রাধারমণের যখন বয়স ৮ বৎসর তখন মাতা প্রেমময়ীর মৃত্যু হয়। ঐ সময় রাধারমণ নাবালক থাকাতে এষ্টেট জেলার জজ সাহেব বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে থাকে। মাতা প্রেমময়ীর মৃত্যুর পর পরলোকগত ভ্রাতা ৺দুর্গাপ্রসাদের পত্নী গুণমঞ্জরী এষ্টেটের উছি নিযুক্ত হন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে ইনিও পরলোক গমন করায় রাধারমণের জ্ঞাতি ভ্রাতা নিকুঞ্জবিহারী মজুমদার ও তাঁহার পর মেসো ব্রজগোপাল মজুমদার মহাশয় ক্রমান্বয়ে অবৈতনিক

রাধাবল্লব বিগ্রহ

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মজুমদার

শ্রীমতী কুসুমকুমারী মজুমদার

উচিৎ নিযুক্ত হন, কিন্তু ইঁহাদিগের কার্য্য সন্তোষজনক না হওয়ায় জজ্-সাহেব বাহাদুর তাঁহাদিগকে পর পর অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। অবশেষে কৃষ্ণপ্রসাদ চাকী মহাশয় বেতনভোগী উচিৎ নিযুক্ত হন। ইঁহার সময়ে এষ্টেটের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। কিছুদিন পর রাধারমণ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৮৫ সালে এষ্টেট নিজহস্তে গ্রহণ করেন।

রংপুর জিলা স্কুলেই রাধারমণের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং ঐ স্কুল হইতে ইং ১৮৮৭ সালে প্রবেশিকা পাশ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্ এ পড়িতে যান। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী শরৎসুন্দরীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে পাঠত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর বিষয় কার্য্যের অনুরোধে তিনি রংপুরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

রাধারমণ বাল্যকাল হইতেই ধীর, বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও সদালাপী। তাঁহার সহিত একবার যিনি আলাপাদি করিয়াছেন তিনিই তাঁহার ব্যবহারে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। পাঠ্যাবস্থায়ও তাঁহাকে নিজ বৈষয়িক কার্য্যের জন্য সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত, তথাপি আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। রংপুরের তদানীন্তন জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সকলেই রাধারমণকে সম্মান করিতেন ও ভাল-বাসিতেন। রংপুরে [illegible] অব্যবহিত পরে ইং ১৮৯৪ সালে তৎ-কালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] ন, হ্যারিস সাহেব রাধারমণকে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর মনোনীত করেন। জনসাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগের ইহাই তাঁহার প্রথম কার্য্য। নিজ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং দক্ষতার জন্য তাঁহাকে বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইয়াছিল। তিনি যে যে কার্য্য করিয়াছেন তদ্বিবরণ (ক) তপশীলের চুম্বকে দেওয়া হইল। এই সমুদয় সাধারণ হিতকর কার্য্যে তাঁহাকে বহু সময় বিনিয়োগ করিতে

হইলেও তিনি নিজ এষ্টেটের উন্নতির প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার সুশৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতার ফলে পৈত্রিক সম্পত্তি বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাধারমণ দেশহিতৈষী, জনপ্রিয় ও বিদ্যোৎসাহী। বিদ্যার্থী বহু আত্মীয় ও নিঃসম্পর্কীত ব্যক্তি তাঁহার গৃহে পুত্রবৎ যত্নে পালিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে। স্থলবিশেষে কাহারও যাবতীয় ব্যয়ভারই ইনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। রাধারমণের দান আড়ম্বর শূন্য। তাঁহার নিকট কেহ কোনও প্রার্থনা জানাইয়া অসন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিত না। প্রার্থকের সন্তোষ উৎপাদক দান আজকাল কিঞ্চিৎ অসম্ভব। কিন্তু রাধারমণের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার বিনয় নম্র মিষ্ট ব্যবহারে অল্প পাইলেও প্রার্থী সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট হইত। তাঁহার শ্রদ্ধার দান সর্ব্বদা সুপ্রচুর না হইলেও "বিদুরের খুদ" মনে করিয়া সকলেই তাহা গ্রহণ করিত।

নৃসিংহ মজুমদার মহাশয়ের সময়ে দেওয়ান বাড়ীর যে গৌরব ছিল রাধারমণের সময়ে সে গৌরব বর্দ্ধিত ভিন্ন ক্ষুন্ন হয় নাই। আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও রাধারমণ ঐ শিক্ষায় সাধারণ কুফলগুলি যত্ন সহকারে পরিহার করিয়াছেন। তিনি কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য—এমন কি ধুমপান পর্য্যন্ত করেন না। তাঁহার আদর্শ চরিত্র গুণে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন। দেবদ্বিজেও তাঁহার অচলা ভক্তি। নিজ পারিবারিক বিগ্রহের সেবা পূজা হইবার পূর্ব্বে তিনি কখনও আহার করেন না। রংপুরে রাধারমণ মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন জমীদার বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার এই রুচি প্রতিকার্য্যে পরিস্ফুট থাকিলেও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়—তাঁহার ঠাকুরবাড়ীর বৈশাখ মাসের ফুলসাজে। কেমন করিয়া ৺ঠাকুরকে সাজাইলে, কোথায় কোন ফুলটী দিলে শোভন হইবে তাহার জন্য রাধা-

রমণ নিজে এই একমাস কাল বিশেষ ব্যস্ত থাকেন। বিগ্রহকে নিজ হাতে না সাজাইলেও তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও নির্দ্দেশ অনুসারে পূজক ৺ঠাকুরকে ফুলসাজে সাজাইয়া দেয়। ঠাকুরের সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার ফুল দিয়া তৈয়ার হয়, সিংহাসন পর্য্যন্ত ফুল দিয়া সাজান হয়, সে এক অপরূপ দৃশ্য! দেওয়ানবাড়ীর বৈশাখ মাসের সাজসজ্জা ও সংকীর্ত্তন রংপুরের একটী দর্শনীয় বিষয়।

রংপুর জেলার অন্তর্গত রহমতপুর গ্রামনিবাসী ৺জগন্নাথ রুদ্র মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শরৎ সুন্দরী রাধারমণের প্রথমা স্ত্রী। ইঁহার গর্ভে তিনটী মাত্র কন্যা সন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী সৌদামিনী পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ মজুমদার পরিবারের শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা. মধ্যম শ্রীমতী বীণাপাণি বগুড়ার অন্তর্গত শিববাটী গ্রামের শ্রীমান্ গিরীন্দ্র লাল রায় মুন্সেফের সহিত উদ্বাহ সূত্রে আবদ্ধ হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পবয়সেই বীণাপাণি বিধবা হইয়াছেন। কনিষ্ঠা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বাল্যকালেই অবিবাহিতা অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসে শরৎ সুন্দরী প্লীহা ও জ্বররোগে লোকান্তরিত হওয়ার পর, রাধারমণ নদীয়ার অন্তঃপাতী চৌৎপুর গ্রামনিবাসী রংপুরের প্রতিষ্ঠাবান উকীল ৺মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কুসুম কুমারীকে দ্বিতীয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

১২৯৯ সালে ইঁহার গর্ভে দেওয়ানবাড়ীর ভাবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী শ্রীমান ফণিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। ফণিভূষণ রঙ্গপুর জিলাস্কুলেই পাঠারম্ভ করেন এবং ইংরাজী ১৯১০ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ফণিভূষণের উচ্চতর পাঠের জন্য অতঃপর বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথমতঃ কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে আই এ পড়িতে

আরম্ভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের অনুরোধে তাঁহাকে কুচবিহার ত্যাগ করিতে হয় এবং বঙ্গবাসী কলেজের এক্স ষ্টুডেণ্ট স্বরূপে নিজ বাড়ীতে অধ্যয়ন করিয়া আই এ পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং পরে কলিকাতায় গিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে একাকী কলিকাতার ন্যায় সহরে রাখা নিরাপদ নহে, অথচ সপরিবার তাঁহার জন্য নিজ বাড়ী ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস-করাও বহুব্যয় এবং কষ্ট সাধ্য এজন্য ফণিভূষণকে উচ্চতম বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া পিতামাতার ঐকান্তিক অভিপ্রেত হইলেও তাঁহারা কোন ক্রমেই আর সপরিবারে ভিন্ন স্থানে থাকিয়া পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অথবা তাঁহাকে একমাত্র পুত্র বিবেচনায় নয়নের অন্তরালে বিদেশে রাখিতে পারেন নাই। এই সমুদয় কারণে শ্রীমানের কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজেরও প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীমান ফণিভূষণ অতঃপর রঙ্গপুর কলেজেই বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করেন। পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে ফণিভূষণ ১৯১৯ ইং সালের সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে শঙ্কটাপন্ন কাতর হইয়া পড়েন। বহু চেষ্টায় এবং ভগবৎ অনুগ্রহে শ্রীমান সে যাত্রা রক্ষা পান। চিকিৎসকগণ শ্রীমানের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ বৎসর তাঁহাকে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন। শ্রীমান কিন্তু নিরস্ত না থাকিয়া পরীক্ষা দিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এইরূপে বিফল মনোরথ হইয়া অতঃপর ফণিভূষণ পাঠত্যাগ ও নিজ বৈষয়িক কার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত নিমতিতা গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সাধনরাণী শ্রীমান্ ফণিভূষণের সহধর্ম্মিণী।

শ্রীমতী সবিতারাণী মজুমদার।

ফণিভূষণের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ বেণীভূষণের এবং কনিষ্ঠ মণিভূষণের বয়ঃক্রম এক্ষণে যথাক্রমে ৭ ও ৫ বৎসর। বালকদ্বয়ের সুন্দর, সুগঠিত দেহে তাদৃশ পার্থক্য লক্ষিত না হইলেও তাহাদের স্বভাবগত পার্থক্য এই বয়সেই যেন সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জ্যেষ্ঠ ক্ষমতাপ্রিয় ও সরল ; কনিষ্ঠ সদাপ্রফুল্ল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন।

(ক) তপশীল।

১। রঙ্গপুর সদর লোকাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের মেম্বর—ইং ১৮৯৪ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত।

২। রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, ইং ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত।

৩। রঙ্গপুর মিউনিসিপ্যালিটীর করদাতাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কমিসনার—ইং ১৮৯৪ হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত।

৪। রঙ্গপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান—ইং ১৯০৪ হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত।

৫। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট (তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার সহ)—ইং ১৮৯৪ হইতে ১৯০৩ পর্য্যন্ত।

একক বিচার আসন গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার সহ—ইং ১৯০৪ হইতে ১৯০৭ পর্য্যন্ত।

৬। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বে-সরকারী জেল ভিজিটার—

৭। রঙ্গপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক ১৮৯৩ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত।

৮। রঙ্গপুর জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত স্থানীয় কারমাইকেল গভর্ণিং বডির মেম্বর।

৯। উত্তরবঙ্গ জমিদার সভার নির্ব্বাচিত ভাইস প্রেসিডেণ্ট।

১০। রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক।

১১। রঙ্গপুর ইন্সটিটিউটের নির্ব্বাচিত ভাইস প্রেসিডেণ্ট।

১২। রঙ্গপুর ধর্ম্মসভার সম্পাদক অনূ্যন ১৬ বৎসর কাল।

১৩। রঙ্গপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির মেম্বর।

শ্রীমান বেণুভূষণ মজু   ও   শ্রীমান মণিভূষণ ম   দার

মজিলপুরের দত্তবংশ।

কলিকাতার প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর থানার অধীনে মজিলপুর নামে একটী গ্রাম আছে। গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখদিগের বাস আছে। কথিত আছে, বহু পূর্ব্বে এই স্থান দিয়া ভাগীরথি প্রবাহিতা ছিলেন, পরে হুগলী নদী প্রবলা হইলে গঙ্গা ক্রমশঃ ক্ষীণস্রোতা হইয়া যায় ও স্থানে স্থানে মজিয়া যাইয়া জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়ে। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব যখন উৎকলে গমন করেন তখন তিনি এই গঙ্গা দিয়া যাইয়া গঙ্গার মোহনাতে অবস্থিত ছত্রভোগ (বর্ত্তমান খাড়ী) গ্রামে তিন রাত্রি অবস্থান করেন। এই ছত্রভোগ বা খাড়ী মজিলপুর হইতে ৩।৪ ক্রোশ মাত্র। এই মজিলপুর গ্রাম, সুন্দর বনের অন্তর্গত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। এখনও এই গ্রামের সন্নিকটে প্রতাপাদিত্য মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজী দেবের মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন মহাসমারোহে ধুমধাটে অভিষিক্ত হয়েন, তখন ধুমঘাট সহরে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে নানা স্থান হইতে আনাইয়া বসবাস করান। তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় দত্ত বংশীয় চন্দ্রকেতু দত্তকে কোনা গ্রাম হইতে আনাইয়া তাঁহার সরকারে মুন্সীগিরি চাকরী দেন। তখন কোনার সমাজ খুব প্রসিদ্ধ ছিল। গৌড়াধিপতি বিজয়সেন, মহারাজ দেবদত্ত প্রভৃতি অষ্টঘর কায়স্থকে বট, কোনা, রায়না প্রভৃতি আটখানি গ্রামের শাসন প্রদান করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মুন্সীদিগের রাজসভায় বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বোধ হয় চন্দ্রকেতু দত্তেরও বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম ছিল। শুনা যায়, চন্দ্রকেতুর একটি ছোট খাট সভা ছিল—সেই

সভার সভাপণ্ডিত ছিলেন—বাৎস্যগোত্রীয় শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা ও তাঁহার যজ্ঞ পুরোহিত ছিলেন, শ্রীগোপালপাণ্ডা। উভয়েই তাঁহার প্রিয়বন্ধু ছিলেন। মুন্সীগিরি করিয়া চন্দ্রকেতু অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইলে, মোগলবাহিনী প্রতাপাদিত্যের নগর সকল লুণ্ঠন ও তাঁহার কর্ম্মচারী-দিগকে ধৃত করিতে আরম্ভ করিলে, চন্দ্রকেতু তাঁহার দুইবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা ও গোপাল পাণ্ডার সহিত পলায়ন করিয়া মজিলপুরে আসিয়া বসবাস করেন। তাহার পর ক্রমে তিনি তাঁহার অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা সুন্দরবনের আবাদ বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। চন্দ্রকেতু দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার এক পুত্র বিশ্বেশ্বর মজিলপুর ত্যাগ করিয়া ডায়মণ্ডহারবার থানার অন্তর্গত সরিষা গ্রামে বাস করিতে থাকেন। অপর পুত্র রমানাথ মজিলপুরেই বাস করিতে থাকেন। রমানাথ তিন পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জয়রামের রামচন্দ্র ও ঘনশ্যাম এই দুই পুত্র ছিল। রাম-চন্দ্র পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও মহাসমারোহে রাসযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দুইটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মহাসমারোহে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপিও এই মন্দির দত্ত বাবুদিগের বাটীর সম্মুখে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার সজ্জন সুলভ কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। রামচন্দ্র মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধের বহু দ্রব্য সম্ভার আনয়ন করিবার জন্য মজিল-পুরের প্রান্ত দিয়া একটি খাল কাটিয়া দেন। এই খালটি আজও তাঁহার নামানুসারে "বুড়ার খাল" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। খালটি এক্ষণে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র দত্তের দুই পুত্র ছিল—হরিনারায়ণ ও আত্মারাম। আত্মারাম দত্ত জমীদারী ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসা ও বাণিজ্য করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ তখন

শাসনকর্ত্তা। তখন তিনি জমীদারদিগের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। সুন্দরবনের আবাদ সকলের বন্দোবস্তের সময় আত্মারাম তাঁহার বিস্তর সাহায্য করেন, এই সকল কারণে তিনি আত্মারামকে পরম প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। প্রবাদ আছে যে, আত্মারাম পুরাতন বাটী ত্যাগ করিয়া নূতন বাটী প্রস্তুত করিয়া উঠিয়া যাইলে, তিনি তথায় লর্ড কর্ণওয়ালিসকে অভ্যর্থনা করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আগমন পথে কাশ্মিরী শাল সকল বিছাইয়া দেন। আত্মারামের চারি পুত্র ছিল—লক্ষ্মীনারায়ণ, শিবনারায়ণ, রামলোচন ও শ্রীকৃষ্ণ। লক্ষ্মীনারায়ণ ও শিবনারায়ণ অপুত্রক। রামলোচনের দুই পুত্র শ্যামচাঁদ ও কৃষ্ণকান্ত। শ্রীকৃষ্ণের তিন পুত্র ছিল, গোপালচন্দ্র, রামমোহন ও যাদবরাম। আত্মারামের সন্তান সন্ততি বড় উচ্ছৃঋল প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিষয় আশয়ের পর্য্যবেক্ষণ ভাল করিয়া হইত না, রাজস্ব বাকী পড়িয়া যাইত; এইরূপে রাজস্ব বাকী পড়িতে থাকায় অনেক সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। আত্মারাম দত্তের এখন বংশ নাই।

আত্মারামের ভ্রাতা হরিনারায়ণ দত্তের চারি পুত্র ছিল—রাধাকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, রামতনু ও গঙ্গানারায়ণ। তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ বহু ব্যয়ে বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীগোপালজীউর মূর্ত্তি আনাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিগ্রহের জন্য বৃহৎ ঠাকুর বাটী ও দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া সমারোহ সহকারে ঠাকুরের পর্ব্বাদি নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সময়ে ভীষণ ঝড়ে সমস্ত দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়, সহস্র সহস্র লোক গৃহশূন্য ও নিরাশ্রয় হয়, ফসল সমস্ত নষ্ট হইয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হয়। রাধাকৃষ্ণ নিরন্ন, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণকে ৭।৮ মাস কাল অকাতরে অন্নব্যঞ্জন বিতরণ করিয়াছিলেন। মধ্যম প্রাণকৃষ্ণও দরিদ্রের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; প্রতিদিন তিনি গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিয়া কাহার কি অভাব তাহা জানিয়া লইতেন এবং সেই

অভাব পূর্ণ করিয়া দিতেন। সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষে শত শত নরনারী অনশনে দিন কাটাইতেছে, আর তিনি অন্নাহার করিবেন, ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না; তিনি অন্নত্যাগ করিলেন। দশবৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হইল। পরে সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুনরায় অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দিবসে এই ক্ষুদ্র গ্রামের জনগণ অভুক্ত ছিল। কনিষ্ঠ রামতনু অগ্রজদিগের উপর বিষয় আশয়ের ভার দিয়া বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তিনি নিমক মহালের দারোগা ছিলেন। তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ৺ দুর্গাপূজার জন্য বৃহৎ দালান নির্ম্মাণ করেন।

রাধাকৃষ্ণের চারিপুত্র—কালিদাস, নীলমাধব, গৌরীকান্ত ও বনমালী কালিদাসও পিতার ন্যায় পরোপকারী ও সজ্জন বৎসল ছিলেন। তাঁহার সময়েও একবার বন্যা হয়, তিনিও পিতার ন্যায় অন্নব্যঞ্জন নিরন্ন লোকদিগকে বিতরণ করেন। কালিদাসের তিন পুত্র—গোপালদাস, হরিদাস ও প্রসন্ন। নীলমাধব অপুত্রক ছিলেন, তিনি ভুবনমোহিনী নাম্নী কন্যাকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। ভুবনমোহিনীর কন্যা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি গিরীন্দ্র মোহিনী। প্রাণকৃষ্ণের ছয় পুত্র—হরগোবিন্দ, যদুনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ, রামধন, চন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণধন। হরগোবিন্দের পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর, তাঁহার পুত্র নগেন্দ্র ও নগেন্দ্রের পুত্র জিতেন্দ্র এখন বর্ত্তমান। কৃষ্ণধনের পুত্র শ্রীনাথ ও তারক। তারক অপুত্রক, তিনি কলিকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীগোপালবসু মল্লিকের সহিত তাঁহার এক মাত্র কন্যা সুব্রতকুমারীর বিবাহ দেন।

রামতনুর দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষে দুই পুত্র জন্মে, রাজনারায়ণ ও রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন। রাজনারায়ণ দত্তের স্ত্রী তাঁহার পতির সহিত সহমৃতা হয়েন। রাজনারায়ণের পুত্র হরমোহন। হরমোহনের দুই পুত্র—হেমনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। হরমোহন বাবু পৈতৃক

বাটী ত্যাগ করিয়া মজিলপুরের অন্যত্র বাগানবাটী প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রেরা নাবালক থাকায় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করে ও পুত্রদিগকে ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের শিক্ষাধীনে রাখেন। হেমনাথ অপুত্রক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ চারি পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। এই চারিপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রকাশ অপুত্রক অবস্থায় সন্তানাদি না রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন কালিদাস, তারা ও বিদ্যা প্রভৃতি তিন পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

রামতনুর দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে; শ্রীনারায়ণ ও মহেন্দ্র নারায়ণ। শ্রীনারায়ণ অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তিনি প্রত্যহ স্বগ্রামবাসীদিগের সংবাদ না লইয়া জলগ্রহণ করিতেন না। মহেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত পরোপকারী ও লোকবৎসল ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বজনবর্গের সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী ছিলেন, তাঁহার সজ্জনতায় মুগ্ধ হইয়া লোকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিত। তাঁহার উপর লোকের এত অধিক বিশ্বাস ছিল যে, যাহার যাহা কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হইত তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিত। এমন কি এ অঞ্চলের অন্য জমীদারগণ তাঁহার নিকট তাঁহাদের আদায়ি খাজনা জমা রাখিতেন। স্বর্গীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও দ্বারকানাথ মিত্র তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। লোকের খোজ খবর লইতে, নিজের ও পরের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। মহেন্দ্রনারায়ণ, তাঁহার চারি পুত্র যোগেন্দ্র নারায়ণ, ভূপেন্দ্র নারায়ণ, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ ও নরেন্দ্র নারায়ণকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ও দানপরায়ণ ছিলেন। বঙ্গের বিখ্যাত লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও জগদীশচন্দ্র রায় তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিম বাবু বারুইপুরে অবস্থান কালে প্রায়ই যোগেন্দ্র বাবুর বাটীতে যাইতেন।

দত্ত বাবুদিগের জমিদারী বরাবর এজমালীতে ছিল, বংশের যিনি জ্যেষ্ঠ হইতেন তিনি কর্ত্তা হইয়া খাজনাদি আদায় করিয়া দেবসেবা, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট টাকা সরিকগণকে অংশানুযায়ী বিভাগ করিয়া দিতেন। এই এজমালীর আয় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ছিল।

যোগেন্দ্রের অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ভূপেন্দ্র বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করেন। ইনি অতি মেধাবী, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ও তেজস্বী ছিলেন। প্রজা আইন ও জমিদারী সংক্রান্ত আইনে তিনি এত অভিজ্ঞ ছিলেন যে, অনেক জমিদার তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আসিত। তিনি জমিদারী সভা ও অন্যান্য অনেক সভা সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁহার নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার গুণে ইহাঁদের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তিনি নিজ গুণে সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। গত ১৩২২ সালের ৬ই কার্ত্তিক তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন।

নরেন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। তিনি একটী ক্ষুদ্র হাসপাতাল গৃহ নির্ম্মাণ করেন ও রোগী দিগের শুশ্রূষার জন্য দশ হাজার টাকা গভর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

জ্ঞানেন্দ্র অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের এটর্ণি ছিলেন; তাঁহার উপর লোকের অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার নিজ আইন ব্যবসায়ে যথেষ্ট উপার্জ্জন ছিল এবং তিনি এই স্বোপার্জ্জিত অর্থে বহু দীন দরিদ্র এবং নিঃস্ব আত্মীয়গণকে প্রতিপালন করিতেন। গ্রামের সমস্ত হিতকর কার্য্যে তাঁহার যোগদান ছিল এবং তিনি অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। তিনি নিজ উপার্জ্জনে খড়দহ গ্রামের উপর একটী সুরম্য বাগান বাটী ও সিমুলতলায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য একটী সুবৃহৎ আবাস

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ দত্ত

স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত।

নির্ম্মাণ করেন এবং তৎপরে তাঁহার স্বর্গীয় পিতামাতার উদ্দেশ্যে ৺শিব স্থাপনার জন্য ৺ কাশীধামে একটী মনোরম বাটী ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তৎকালীন গ্রামস্থ প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বজনবর্গকে সেখানে লইয়া গিয়া মহাসমারোহে ৺শিব স্থাপনা করেন। ৫১ বৎসর বয়সে তিনি দুই কন্যা ও দুই পুত্র সত্যেন্দ্র ও সৌরীন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা চোরবাগানের মিত্র বংশীয় প্রসিদ্ধ ধনী গুণেন্দ্রনাথ মিত্র এবং কনিষ্ঠ স্বনামখ্যাত কলিকাতার ডাক্তার ৺যোগেন্দ্র নাথ ঘোষের পুত্র, ডাক্তার সতীশচন্দ্র ঘোষ। সত্যেন্দ্র চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। বিখ্যাত চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট চিত্রবিদ্যা শিখিয়া বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করেন। সত্যেন্দ্র দুই পুত্র সুধীন্দ্র ও শচীন্দ্রকে রাখিয়া অতি অল্প বয়সে লোকান্তর গমন করেন। সৌরীন্দ্র হাইকোর্টের এটর্ণি। ইহার এক পুত্র সরোজেন্দ্র।

যোগেন্দ্রের এক পুত্র যতীন্দ্র। ইনি অতি সজ্জন ও সাধু প্রকৃতির লোক; মিষ্টভাষী ও প্রিয়ংবদ। ইহার তিন পুত্র, মুনীন্দ্র, শৈলেন্দ্র ও ফণীন্দ্র।

ভূপেন্দ্র নারায়ণের এক মাত্র পুত্র নৃপেন্দ্র ইনি দেবাদেশে শ্রীশ্রীসীতা, রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান জিউর শ্বেত প্রস্তরের নয়নাভিরাম বিগ্রহ মূর্ত্তি চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি হাইকোর্টের এটর্ণি। ইহাঁর এক পুত্র ধীরেন্দ্র।

গোপালদাস দত্ত ভবানীপুরের স্তর রমেশচন্দ্র মিত্রের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সাত পুত্র বিরাজকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, নৃত্যগোপাল, নন্দগোপাল, সদয়গোপাল, লালগোপাল ও রামগোপাল। বিরাজকৃষ্ণের তিন পুত্র—ননীগোপাল, মহেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর। ননীগোপাল হাইকোর্টের এটর্ণি। নন্দগোপাল এখানকার মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্। ইহাঁর তিন পুত্র সত্যহরি, ভবনাথ ও পূর্ণানন্দ।

নৃত্যগোপাল অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম সত্বাধিকারী ৺মতিলাল ঘোষের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। নৃত্যগোপাল এখন মৃত। ইঁহার তিন পুত্র সত্যগোপাল, পরমানন্দ ও অতুলানন্দ। লালগোপালের তিন পুত্র, রাধিকা. কালীকিঙ্কর ও দেব। রামগোপালের পাঁচ পুত্র।

স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত।

স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত মহাশয় মজিলপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে সন ১২৩৯ সালের ৪ঠা শ্রাবণ জন্মগ্রহণ এবং ১৩১৯ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখে পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা এবং অনেকগুলি পৌত্র ও দৌহিত্র রাখিয়া ৮২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বর্গারোহণ করেন। এই অক্লান্ত কর্ম্মীর জীবন নিয়তই কর্ম্মময় ছিল। তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও "জয়নগর ইন্‌স্‌টিটিউসন" নামধেয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী এবং অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্বদেশের উন্নতিকল্পে সকল আন্দোলনেই যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি সমান উৎসাহে নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে স্বগ্রামে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহযোগিতায় জয়নগরে ১৮৭৮ সালে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি বহু ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়া এবং কলিকাতা হইতে সুযোগ্য শিক্ষক আনাইয়া নিজ বাটীতে স্থান দান করিয়াছিলেন। বহু নিঃসহায় দরিদ্র ছাত্র তাঁহার বাটীতে সস্নেহ আশ্রয় পাইয়া আপনাপন জীবনে জ্ঞান ও অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ লাভে সমর্থ হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃঃ তিনি স্বগ্রামে "টাউন কমিটী" সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভাই পরবর্ত্তীকালে জয়নগর মিউনিসিপ্যালিটীতে পরিণত হয়। যখন এ প্রদেশের লোকের মনে স্বায়ত্ত শাসনের কল্পনা পর্য্যন্তও ছিল না, সেই সময়ে এইরূপে তিনি স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তি স্থাপনা করেন।

তিনি যে কেবলমাত্র ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি এ প্রদেশের টোল ও চতুষ্পাঠী সমূহে সংস্কৃত শিক্ষাদানেরও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে জয়নগর মজিলপুর এবং নিকটস্থ গ্রাম সমূহে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উদ্ভব হয়। তিনি প্রাচীন প্রেসিডেন্সি কলেজের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের একান্ত অনুরক্ত হইলেও আচার ব্যবহারে কখনও সাহেবীয়ানার প্রশ্রয় দিতেন না। দরিদ্রের দুঃখ বিমোচন ও শিক্ষাদানের সহায়তায় তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন এবং তাঁহার সেই দান সময়ে সময়ে তাঁহার আর্থিক অবস্থাকেও অতিক্রম করিত। তিনি অমিত-বিত্তশালী ছিলেন না; কিন্তু "অন্তরে সদিচ্ছা থাকিলে ঈশ্বর সহায় হন' এই নীতিবাক্যের তিনি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষের আক্রমণজনিত হাহাকারে যখন দেশ পূর্ণ হয়, ১৮৮৯ খৃঃ বন্যা-পীড়িত গৃহহারা অন্নহীন আর্ত্তের করুণ ক্রন্দনের মর্ম্মস্পর্শী রোল যখন দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল, তখন এ প্রদেশের এই মহাত্মাই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া সাশ্রুলোচনে নিরাশ্রয় ও অন্নহীনগণের জন্য আশ্রয় ও অন্নের ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার এই উচ্চ দানশীলতার কার্য্যে তিনি রাজপুরুষ গণের নিকট হইতে ধন্যবাদপূর্ণ বহু প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ও বুভুক্ষুর অন্নদান-জনিত যে আত্মতৃপ্তি ও যে পুণ্য তিনি লাভ করিয়া গিয়াছেন, ইহসংসারের কোন সম্পদ তাহার তুল্য হইতে পারে না। তিনি অমিত বলশালী ও সাহসী ছিলেন। তাঁহার দান সর্ব্বতোমুখী ছিল। স্থানীয় হিতৈষিণী সভার জন্য তিনি দুই বিঘা জমি দান করেন। সম্প্রতি কিছুকাল হইতে তিনি একটী আদর্শ সাধারণ (Public) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্কল্প করেন। তাহারই ফলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই "জয়নগর মজিলপুর ট্রেণীং স্কুল" স্থাপিত হয়।

বহু বাধা অতিক্রম করিয়া আজ এই বিদ্যালয়টী যে কর্ত্তৃপক্ষের শ্রেষ্ঠ প্রশংসা লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহা হরিদাস বাবু ও তাঁহার পুত্রগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয়ের ফল। তাঁহারই চেষ্টায় "মজিলপুর পত্রিকা" নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকা কিছুদিন এ প্রদেশে চলিয়াছিল। আজ তিনি পার্থিব নিন্দাস্তুতির অতীতস্থানে গমন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজ জীবনে দেশভক্তি ও সেবাব্রতের যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি এ দেশবাসী ইতর, ভদ্র ও দরিদ্রগণের হৃদয়ে চিরজাগরুক থাকিবেন।

স্বর্গীয় বিপিন কৃষ্ণ দত্ত।

স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত মহাশয়ের ২য় পুত্র ৺বিপিন কৃষ্ণ দত্ত ১২৬৪ সালের ১৫ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩২৪ সালের ১০ই আষাঢ় পরলোক-গমন করেন। বিপিন বাবু সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। অস্ত্রোপচার ও ধাত্রী বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন না; রোগক্লিষ্ট দরিদ্রগণের রোগ-যাতনা দূর করাই তিনি জীবনের মুখ্য ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধনী জমিদার পুত্র হইয়াও শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় প্রতিদিন দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পদব্রজে দরিদ্র রোগ-কাতরদিগের ভবনে ভবনে পর্য্যটন করিয়া, তাহাদিগকে ঔষধ এবং কোন কোন স্থলে পথ্য পর্য্যন্ত দান করিতেন। তাঁহার উপস্থিতিতে, তাঁহার মধুর সান্ত্বনায় রোগী রোগের যন্ত্রণা বিস্মৃত হইত। নিঃস্ব রোগীর আহ্বানে তাঁহার দ্বার ও ভাণ্ডার চিরমুক্ত ছিল। আহ্বান আসিলেই তিনি সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি না মানিয়া, সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরেও রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতেন। প্রসবকাল রমণীগণের পক্ষে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। ধাত্রী বিদ্যাবিশারদ বিপিন বাবুর হস্তার্পণে সুপ্রসবের সমস্ত বাধা বিঘ্ন যেন দৈবশক্তি প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে
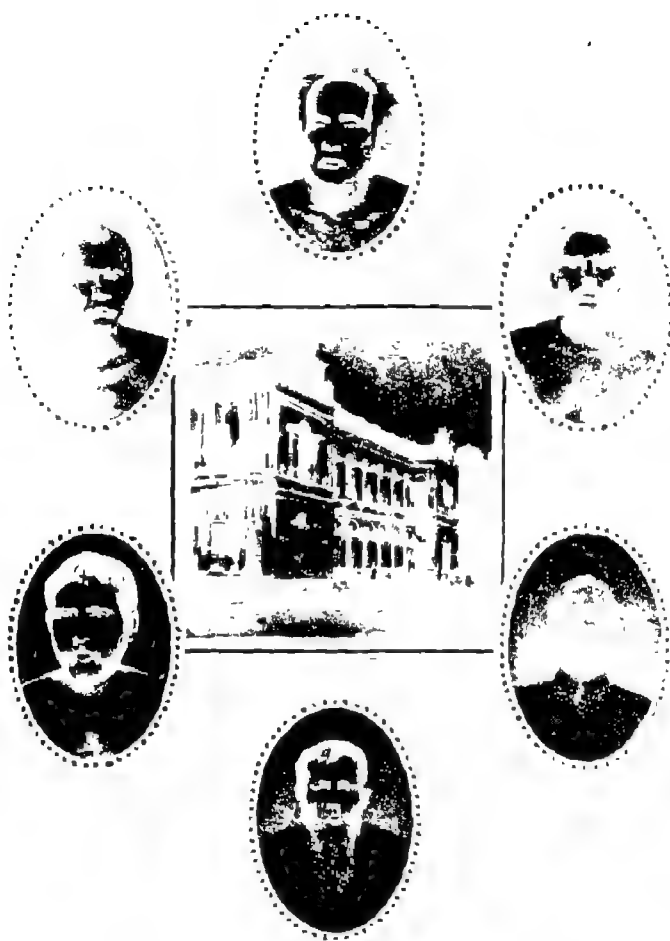
১। স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত, ২। শ্রীউদয়কৃষ্ণ দত্ত, ৩। ৺বিপিন কৃষ্ণ দত্ত, ৪। ৺বিনয় কৃষ্ণ দত্ত, ৫। ৺রমণ কৃষ্ণ দত্ত, ৬। ৺অময় কৃষ্ণ দত্ত।

অন্তর্হিত হইত। তাই এ প্রদেশের ইতর, ভদ্র রমণীগণ জীবনদাতা পিতা জ্ঞানে বিপিনবাবুকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি দান করিতেন। তাঁহার পরলোক গমনে এপ্রদেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায় সত্য সত্যই যেন পিতৃহারা হইয়াছে। আজ তিনি যে লোকেই অবস্থান করুন না কেন, এ প্রদেশের নিঃস্ব নরনারীর হৃদয় লোকে তিনি উজ্জ্বল দেবমূর্ত্তিতে সততই বিরাজমান আছেন। বিপিনকৃষ্ণের পুত্রের নাম শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ।

স্বর্গীয় বিনয়কৃষ্ণ দত্ত।

স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত মহাশয়ের ৩য় পুত্র ৺বিনয়কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ১৩২৪ সালের ২৬শে শ্রাবণ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কলেজের পাঠ সমাপন করিয়া ইনি পুণা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি সংসারে বীতরাগ হইয়া চলিয়া যান এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী অবস্থায় সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কিন্তু কর্ম্মবীরের সংসারাশ্রম একেবারে পরিত্যাগ বিধাতার বিধান নহে। তিনি আবার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবৃষ্ট হইলেন। দেশে আসিয়া তিনি বহুজনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অতীব তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থানকালে তিনি দৃঢ়চিত্ত তেজস্বী সন্ন্যাসিগণের সংসর্গে থাকিয়া যে তেজ ও ন্যায়নিষ্ঠা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই তেজ, সেই ন্যায়নিষ্ঠা আমৃত্যু তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান ছিল। তাঁহার ন্যায় কর্ম্ম-কুশল, অক্লান্ত পরিশ্রমী, অতুল অধ্যবসায়ী এবং অমিত প্রতিভাশালী ব্যক্তি এ প্রদেশে একান্তই বিরল। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা যতই কেন জটিল হউক না, সুসম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যানরূপে তিনি এ প্রদেশের বহু লোকহিতকর কার্য্য করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তিনি সততই বদ্ধপরিকর ছিলেন। কোন প্রলোভনেই তিনি অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন

নাই। তিনি অন্যায়ের নিকট বজ্র কঠিন এবং ন্যায়ের নিকট কুসুম-কোমল ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কখনও কপটতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রবলের অত্যাচারে উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের তিনি পরম আশ্রয় ও অবলম্বন ছিলেন। আশ্রিত বাৎসল্য তাঁহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি তাঁহার আশ্রিতাচার সুখ দুঃখের চিন্তা হইতে বিরত হন নাই। জে, এম, ট্রেণীং স্কুলের স্থাপনা তাঁহার জীবনের অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি। অক্লান্ত পরিশ্রমে হাতে গড়া এই বিদ্যালয়টী তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই তাঁহার শেষ জীবনের ব্রত হইয়াছিল। ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে এবং অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। সন্ন্যাসী অবস্থায় তিনি দেওঘর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে এবং পরে জে, এম, ট্রেণীং স্কুলে অবৈতনিকরূপে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি সংস্কৃতে ও ইংরাজীতে দুইখানি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি বহুদিন জে, এম, ট্রেণীং স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এ প্রদেশের একজন শ্রেষ্ঠ, অকপট, আশ্রিতবৎসল, ন্যায়নিষ্ঠ কর্ম্মীর অবসান হইয়াছে। বিনয়কৃষ্ণের পুত্র শ্রীসুধীরকৃষ্ণ, শ্রীসুনীলকৃষ্ণ, শ্রীসুরাজকৃষ্ণ ও শ্রীসুদেবকৃষ্ণ।

স্বর্গীয় রমণকৃষ্ণ দত্ত।

৺রমণকৃষ্ণ দত্ত স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র। ইনি ১৩২৪ সালের ১লা বৈশাখ পরলোক গমন করেন। রমণ বাবু ধীর, বিনয়ী, মিষ্টভাষী এবং একজন সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এমন অমায়িক ছিলেন যে যিনি একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তিনি তাঁহার অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। রমণবাবু মান্দ্রাজ এগ্রিকালচারাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে এবং ডায়মণ্ডহারবার লোকালবোর্ডের যথাক্রমে শিক্ষা বিভাগের ও সাধারণ বিভাগের কার্য্যকরী সমিতির একজন শক্তিশালী সদস্য ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় কাক দ্বীপ,

বেলপুকুর প্রভৃতি স্থানে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত অনেকগুলি উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতরূপে তাঁহার অনন্য সাধারণ যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উচ্চ প্রশংসাপত্র এবং কারাগার পরিদর্শকের উচ্চ পদ প্রদান করেন। ইদানীং গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডায়মণ্ডহারবারের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মান লাভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর জে, এম, ট্রেনীং স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি স্থানীয় হিতৈষিণী সভার ট্রাষ্টী এবং রেট পেয়ার্স য়্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল।

৺ অমরকৃষ্ণ দত্ত।

৺ অমরকৃষ্ণ দত্ত স্বর্গীয় হরিদাস দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৩২৬ সালের ৪ঠা শ্রাবণ পরলোক গমন করেন। ইনি একজন বিষয়-কর্ম্ম নিপুণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। জমীদারী কার্য্য তত্ত্বাবধানে তাঁহার প্রভূত যোগ্যতা দৃষ্ট হইত। ইনি, অগ্রজ ৺ বিপিন বাবুর সহিত একযোগে জে, এম, ট্রেণীং স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য তিন বিঘা নিষ্কর জমী দান করেন।

মজিলপুরের দত্ত বাবুরা বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে জমী দান করিয়া বসবাস করান। ইহাদের বাটীতে জন্মাষ্টমী, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। দুর্গোৎসবে ও চৈত্রমাসে কাঙ্গালীদিগকে লুচি, চিঁড়া, দধি প্রভৃতি দান করা হয়।

গ্রামবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। তাঁহাদিগকে সকলেই শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখে।

কয়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন গোরাইনদীর উত্তর-তীরে কয়া গ্রাম অবস্থিত। এখানে যে চট্টোপাধ্যায় বংশের বাস ইহাঁরা আদিসুর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ মিশ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর ঠাকুরের সন্তান। ইহাঁদের খড়দা মেল। ইহাঁদের পূর্ব্ব নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত নলুয়া গ্রামে ছিল। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ কয়ার মজুমদার বংশে বিবাহ করিয়া সেই হইতে এই স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁরা বহুদিনের পুরাতন এবং সম্ভ্রান্ত বংশ।

ইহাঁদিগের এখন হইতে উর্দ্ধতম সপ্তম পুরুষের নাম শুকদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পুত্র কিনুকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পুত্র রামকিঙ্কর, রামকিঙ্করের পুত্র গৌরমোহন। এই গৌরমোহনের মৃত্যুতে তাঁহার পত্নী স্বামীর চিতারোহণে সহমরণ লাভ করিয়া সতীধর্ম্ম পালনে নিজেকে এবং স্বামীর বংশকে গৌরবান্বিত ও চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের পুত্র ৺রামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় একজন অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক বংশমর্য্যাদা নানাপ্রকারে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি সুদীর্ঘ গৌরাঙ্গাকৃতি পুরুষ ছিলেন। তিনি অসাধারণ শারীরিক এবং মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন. নানাসদ্‌গুণান্বিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং সমাজ নেতা ছিলেন, তিনি সংসারে দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা এবং ক্রিয়া-কলাপ অতি স্বচ্ছন্দতার সহিত নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজগ্রাম হইতে পুরী পর্য্যন্ত সস্ত্রীক হাঁটিয়া জগন্নাথ দর্শন ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন; ব্যাঘ্র মুখ হইতে ধৃত গো-বৎস ছিনাইয়া আনিয়াছিলেন, একবার পল্টন চলিতে থাকাকালে তাহাদিগের মধ্যে ৩ জনকে গ্রাম্য মেয়েদিগের প্রতি আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আরও
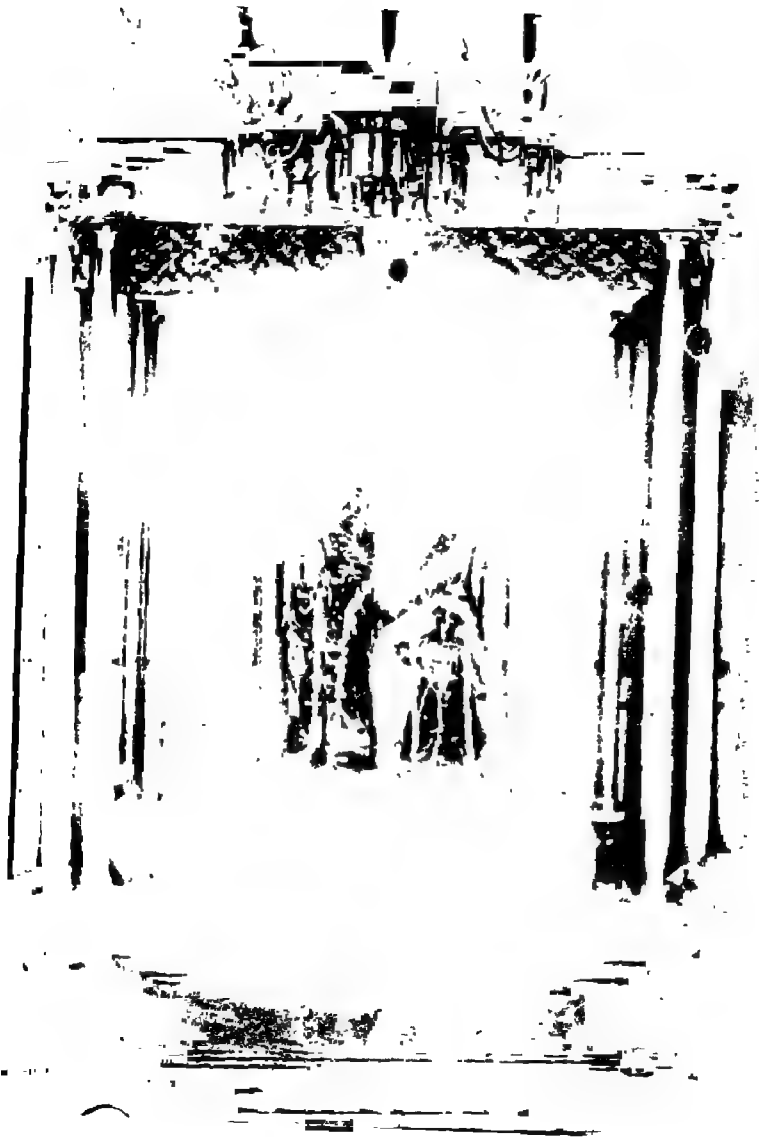
দক্ষিণেশ্বরের রাধাশ্যাম মূর্ত্তি

নানাপ্রকারে স্বীয় শক্তি, বীর্য্যের ও পরোপকারের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি জমিদার না হইলেও সামান্য মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক হইয়াও তাঁহার ইঙ্গিতে সমুদয় কার্য্য পরিচালিত হইত। তাঁহার শাসন ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং বংশের সম্মান ও গৌরববর্দ্ধন করিতেছে। ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৯৭ সালে পত্নী, কন্যা, পৌত্রগণ ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নৈহাটীতে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াও তিনি আজও লোকমুখে জীবিত রহিয়াছেন। তিনি যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও তাঁহার পুণ্য স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত রহিয়াছে। তাঁহার পত্নী চাঁদমণি দেবী স্বামীর মৃত্যুতে বহুদিনের সাহচর্য্য হারাইয়া শোকে বিকলমনা হইয়া যান এবং স্বামীর মৃত্যুর ৩ বৎসর পর তাঁহারও ৯৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

রামসুন্দরের দুই পুত্র মধুসূদন এবং যদুনাথ। প্রথম পুত্র মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমোহরে ৺রাজমোহন চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় কন্যা বামাসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই বামাসুন্দরী এবং দুই কন্যা শরতশশী দেবী ও শ্রীমতী জয়-কালী দেবী ও পাঁচ পুত্র জীবিত রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অপর পুত্র যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি কুষ্টিয়া, বনগ্রাম ও বাগেরহাটে দেওয়ানী আদালতের সেরিস্তাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার বাসায় থাকিয়া অনেক নিঃস্ব ছাত্র প্রতিপালিত হইয়াছে; তিনি দরিদ্রকে অকাতরে অন্নবস্ত্র দান করিয়াছেন। তিনি অতীব দয়াদাক্ষিণ্যসম্পন্ন এবং সকলের ভক্তির পাত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর ছয়মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি স্বয়ং হিন্দু হইয়াও কুষ্টিয়ার ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য ভূমি দান করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়া-ছিলেন। যে সময়ে দেশে স্ত্রী শিক্ষার আদৌ প্রচলন হয় নাই, তিনি তৎকালে স্বীয় গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ বালিকা

বিদ্যালয় আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে ও তাঁহার শিক্ষিত উচ্চ মনের পরিচয় দিতেছে। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' "বামা বোধিনী পত্রিকা' 'বঙ্গ দর্শন' 'আর্য্যদর্শন' প্রভৃতি তৎকালের প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি তিনি লইতেন এবং পারিবারিক শিক্ষার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার পত্নী ব্রহ্মময়ী দেবী এবং কন্যা বিধুমুখী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ঐ কন্যার পৌত্র দুইটী জীবিত আছে।

মধুসূদনের পুত্রদিগের মধ্যে প্রথম বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পাবনা জেলার অধীন পোতাজিয়া গ্রামে ৺কৃষ্ণবিহারী অধিকারীর কন্যা শ্রীমতী দেবরাণী দেবীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ বি এল পাশ করিয়া তিনি নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় শক্তি ও প্রতিভা বলে একজন খ্যাতনামা উকিল হন। ইনি এই স্থানের (নদীয়ার) গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন ও স্থানীয় কলেজের আইন অধ্যাপক ছিলেন। নদীয়া মহারাজার ও জেলার অন্যান্য অধিকাংশ জমিদারগণের তিনি উকিল ছিলেন। একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় এবং কল্পনায় তাঁহার মক্কেল রামগোপাল চেৎলাঙ্গিয়ার মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নীর নিকট হইতে অর্থ লইয়া কৃষ্ণনগরে টাউন হল নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি এইরূপে স্বীয় উন্নতি এবং দেশোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে না হইতে ১৩১৫ সালের আষাঢ় মাসে ৫১ বৎসর মাত্র বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ডাক্তার লুকিস্ প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্বীয় ওকালতী ব্যবসা ও নানা অবৈতনিক পদের কার্য্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল ভগ্ন হইয়া যাওয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। বসন্তকুমার জীবনে অনেক পরোপকার করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্রদিগকে অর্থ এবং বস্ত্র দান করিয়া, গ্রামে পিতামহ প্রতিষ্ঠিত দুর্গোৎসব মহা ধুমধামের সহিত

সম্পন্ন করিয়া এবং সেই উপলক্ষে চতুস্পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকদিগের মধ্যে অকাতরে অন্ন বিতরণ করিয়া স্বীয় নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় নিজ গ্রামে ডাক্তারী করেন, দ্বিতীয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট খ্যাতির সহিত এম্ এস্ সি পাশ করিয়া স্বদেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং তৃতীয় নির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার; ৪র্থ শিবপদ চট্টোপাধ্যায় আই এ পাশ করিয়া এখনও পড়িতেছেন। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী মৃণালকুমারী দেবীর চাকদহের নিকট গৌড়পাড়া নিবাসী ৺ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমুনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। মুনীন্দ্রনাথ রাণাঘাটের উকীল। মধুসূদনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার অন্তর্গত গোয়াল গ্রামে ৺ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী পটেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে L. M. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯০ খ্রীঃ হইতে কলিকাতা শোভাবাজারে ডাক্তারি করিতেছেন। তিনি জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের সকল কর্ম্মে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে এক্ষণে একরূপ অবসর লইয়াছেন। তিনি একজন বিচক্ষণ এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক। দেশের পীড়া এবং বিপদ্‌গ্রস্ত অনেক লোককে তিনি কলিকাতায় নিজ বাসাতে আশ্রয় দান করিয়া নিজ চিকিৎসায় জীবন অবধি দান করিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতার বাসা অদ্যাপিও কলিকাতা প্রবাসী অনেক আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়স্থান। তাঁহার দুই পুত্র; শ্রীঅমূল্য কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-বি এবং শ্রীঅজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, দু'জনাই ডাক্তার হইয়াছেন। তাঁহার এক কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণী দেবীর হুগলী কামালপুর নিবাসী শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র শ্রীপাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এর সহিত বিবাহ হইয়াছে।

মধুসূদনের তৃতীয় পুত্র শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১২৭২ সালের আশ্বিনে ঝড়ের রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ঐ ঝড়ে অনেক ঘরবাড়ী পড়িয়া গেলেও এই চট্টোপাধ্যায় বাটীতে মণ্ডপস্থিত দুর্গা প্রতিমার কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই এবং তাঁহার কৃপায় ঐ সদ্যপ্রসূত শিশুও আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়া 'দুর্গাপ্রসন্ন' নাম পাইয়াছিল। তিনি গুপ্তিপাড়া নিবাসী ৺রাম নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা জ্ঞানদা দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি এক্ষণে মুর্শিদাবাদ লালবাগে মোক্তারি করিয়া থাকেন ও তথায় কাশিমবাজারের মহারাজা, লালগোলার মহারাজা প্রভৃতি অনেক জমিদারের কার্য্যে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। গঙ্গাতীরে বাস করা হেতু ইহাঁদিগের মাতা বামাসুন্দরী দেবী ও পিতৃষসা সোনামণি দেবী সকলেই ইহার নিকট বাস করিতেন। পিতৃষসা সোনামণি দেবী সন ১৩০৯ সালে এবং মাতা বামাসুন্দরী পুত্র-পৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হইয়া ১৩১৯ সালে এই স্থানেই সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। ১৩২১ সালে ইহাঁর পত্নী জ্ঞানদা দেবীর মৃত্যু হয়। ইহাঁর ন্যায় আত্মীয় প্রতিপালক এবং সকল কর্ম্মে ব্যয় করিতে মুক্তহস্ত ব্যক্তি আজি কালিকার দিনে কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রথম পুত্র শ্রীমনীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল উকিল এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় বি কম পরীক্ষা দিয়াছেন। ইহাঁর কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর উত্তরপাড়ানিবাসী ৺নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসুধানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল এর সহিত বিবাহ হইয়াছে। মধুসূদনের ৪র্থ পুত্র শ্রীঅনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায় কালনা নিবাসী ৺দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের সদর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন; এক্ষণে বাটীতে নিজ গ্রামে থাকেন। শৈশব হইতেই অশ্বারোহণে, বন্দুক চালনে ও ব্যায়ামাদিতে ইনি খুব পারদর্শী। ইনি ভাল ভাল কুকুর, ঘোড়া এবং গরু পুষিয়া আসিয়াছেন

এবং অদ্যাপি নিজ হস্তে গো-সেবা করিয়া থাকেন। গ্রাম ও বাড়ীর উন্নতির জন্য ইনি সর্ব্বদা সচেষ্ট। ইঁহারই চেষ্টাতে নিজ বাড়ীতে যে পুষ্করিণী হইয়াছে তাহাতে বহু লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে। গ্রামে প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে এবং এই বৃহৎ পরিবারের উপস্থিত ক্রিয়া কলাপ সমুদয় কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিতে ইনিই একমাত্র ব্যক্তি। ইনি খুব সুশিক্ষিত এবং ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, কুষ্টিয়ার উকিল।

মধুসূদনের কনিষ্ঠ পুত্র ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। ইনি নদীয়ার অধীন সুবর্ণপুর গ্রামের ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দৌহিত্রী সুধাময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি ১৯০৩ সালে ওকালতি আরম্ভ করিয়া পরে হাইকোর্টের উকিল হন। ১৯০৪ খ্রীঃ অঃ যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, ঐ আন্দোলনের ইনি একজন মূল কর্ম্মী এবং স্বদেশের নীরব সেবক। স্বদেশিকতার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ইনি দারুণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন। ওকালতি কার্য্যে যখন কেবল উন্নতি আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে অকস্মাৎ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নিজ ভাগিনেয় স্বনামধন্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেকের সহিত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রাজনৈতিক বন্দিস্বরূপে ছ'মাস কাল ইঁহাকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের নির্জ্জন কারাবাসে বাস করিতে হয় এবং বিচারে প্রমাণ অভাবে শেষে ১৯১০ সালের জুন মাসে মুক্তিলাভ করেন। ইঁহার মুক্তিলাভের পর প্রেসিডেন্সি জেলের রাজনৈতিক আসামীদিগের প্রতি জেল নিয়মের কঠোরতার যে অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল, ইনিই তাহার মূলীভূত কারণ। যতীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় পরে বালেশ্বরের অন্তর্গত কোপতিপোদায় পুলিশের সহিত যুদ্ধে নিজ প্রাণ বলিদান দিয়াছিলেন। ললিতকুমার কিছুদিন কৃষ্ণনগর কলেজের ল লেক্‌চারার ছিলেন এবং বঙ্গীয় নদীয়া শাখার সাহিত্য পরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক। সাহিত্যে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে। ইনি "Short memoir of late Babu Basanta Kumar Chatterjee.' ও "সুধাস্মৃতি" নামক পুস্তক প্রনয়ণ করিয়াছেন এবং অনেক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। সচ্চরিত্রতা, অমায়িকতা, পরদুঃখকাতরতা ও উদারতার জন্য ইনি সকলের প্রিয়। কৃষ্ণনগরের মৃতদেহ তথা হইতে ৮৷৯ মাইল দূর নবদ্বীপে লইয়া সৎকার করিতে হয়। ঐ মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার বিশেষ অসুবিধা ছিল। ইনি এখানে উকিল হইবার পর কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এখানে প্রথম শববাহী নৌকার প্রচলন করেন। কৃষ্ণনগরের "শান্তি" নামক শববাহী নৌকা ইহাঁরই চেষ্টার ফল এবং ঐ "শান্তি" নৌকা-রোহণেই গত ১৩২৫ সালের ২৭শে কার্ত্তিক তারিখে ইহাঁর স্ত্রী সুধাময়ী দেবীর মৃতদেহ নবদ্বীপের জাহ্নবীকূলে পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইয়াছে। স্ত্রী বিয়োগের পর ইনি আর বিবাহ করেন নাই। ইহাঁর দুই কন্যা "তারা" এবং "ছায়া"। প্রথম শ্রীমতী তারা দেবীর সহিত হাইকোর্টের জজ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-ল্‌এর সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইহাঁর দুই পুত্র—শ্রীমোহিত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুহৃদ কুমার চট্টোপাধ্যায়; ইহারা দুই ভ্রাতা এখনও অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইহাঁরা নিজ নিজ কর্ম্মস্থানে বাড়ী ঘর করিলেও দেশের পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করেন নাই। প্রতি বৎসর পূজার ছুটিতে সকল ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ উপেক্ষা করিয়াও এই পৈতৃক পল্লী-ভবনে সকলে একত্রে মিলিত হইয়া থাকেন এবং আজিও পিতৃ-পিতামহের

সেই পুরাতন একান্নবর্ত্তী পরিবারের সজীব ছায়ায় আসিয়া ও তাহার ক্রিয়া কলাপাদি সাধ্যমত বজায় রাখিয়া সকলে আনন্দ পাইয়া থাকেন। পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব, সুশিক্ষা, মার্জ্জিত রুচি, আচার ব্যবহার, বন্ধুত্ব, সহৃদয়তা, পরোপকার প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের জন্য কয়ার এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার সর্ব্বজন বিদিত।

৺মতিলাল সাহা।

হাওড়া জেলার জগতবল্লভপুর নিবাসী ৺মতিলাল সাহা মহাশয় জাতিতে বৈশ্য। ইঁহাদের আদি নিবাস ভাগলপুর, তথা হইতে ইঁহার পিতা ৺পান্নালাল সাহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জগতবল্লভপুরে আসিয়া শ্বশুরালয়ে বসবাস করেন ; ইঁহারা খাণ্ডেলওয়ালা বেনিয়া। ১৮৮৪ সালের ২৪শে জুন বাঙ্গালা ১২৯২ সালের ১২ আষাঢ় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মতিলাল বাবুর মাতামহ ৺বিশ্বনাথ সাহা। ইঁহার পিতা জগতবল্লভপুরে আসিয়া ক্রমে ক্রমে ভূসম্পত্তি বাড়াইয়া একজন জমিদারে পরিণত হন। ইঁহারা অনেক ব্রাহ্মণকে অনেক ব্রহ্মোত্তর এবং দেবদেবীর উদ্দেশ্যে অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন। পূজা, পার্ব্বণ প্রভৃতি ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের আমল হইতে প্রচলিত। প্রতি বৎসর ইঁহাদের বাটীতে রথ দোল প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে হইয়া থাকে। মতিলাল বাবুর শ্বশুর মহাশয় ৺শ্রীকান্ত রায়। যশোহর জেলার শ্যামকুণ্ড গ্রামে উঁহার বাসস্থান ছিল। ইনিও একজন বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী ছিলেন। কোন্ সময়ে যে শ্রীকান্ত রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশে আগমন করে তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে কিম্বদন্তী এইরূপ যে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় ইঁহারা নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

শৈশবে মতিবাবু জগতবল্লভপুর হাইস্কুলে প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া চাকুরীর চেষ্টায় পিতা মাতা ও অন্য এক সহোদর সহিত প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসেন। প্রথমে তিনি প্রসিদ্ধ এটর্ণী বাবু প্রিয়নাথ সেনের অফিসে কাজ করেন। তাঁহার কার্য্য তৎপরতা দর্শনে প্রিয়বাবু তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিছুদিন এখানে কাজ করিবার পর তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর ক্যাসিয়ার হইয়া কিছুদিন-

স্বর্গীয় এম্, এল্, সাহা

কাজ করেন। তিনি যখন উক্ত গ্রামোফোন কোম্পানীর ক্যাসিয়ার হন, তখন উক্ত কোম্পানী সবে মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন ক্যাসিয়ারীর পদে কার্য্য করিবার পর স্বাধীনভাবে কাজ করিবার জন্য তাঁহার প্রবল বাসনা হইল। তিনি উক্ত কোম্পানীর এজেন্সী লইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে চাঁদনীর সমক্ষে একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথমে গ্রামোফোন বেঁচিয়া তাঁহার যাহা লাভ হইতে লাগিল, তিনি তাহা হিতবাদী অফিসে জমা দিয়া হিতবাদীতে গ্রামোফোনের বিজ্ঞাপন দিতে সুরু করেন। ক্রমে ব্যবসায়ে সততার জন্য তাঁহার উপর ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন। দিন দিন তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি কালক্রমে কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রামোফোন ব্যবসায়ীতে পরিণত হন। বর্ত্তমানে তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীমান্ চণ্ডীচরণ সাহা উত্তরোত্তর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারতা সাধন করিতেছেন। মূলধন না লইয়া কেবল অসাধারণ অধ্যবসায় বলে কি করিয়া ব্যবসায় করিতে হয়, মতিলাল বাবু তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। মতিলাল বাবু মহৎ চরিত্র ও সদাশয়তার জন্য জনসাধারণের নিকট অতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতিভাজন ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম ও পরোপকারার্থে যথেষ্ট ব্যয় করিতেন এবং সে কথা কাহাকেও জানাইতেন না। ধনী হইলেও তাঁহার বেশভূষা, চাল চলন অতি সাদাসিদা ছিল।

মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া যে স্কুলে তিনি শৈশবে অধ্যয়ন করিতেন, তাহার উন্নতিকল্পে এবং জাতীয় শিক্ষার প্রসারতাকল্পে মহাত্মা গান্ধীর হস্তে তিনি ক্ষমতাতিরিক্ত টাকা দান করেন। তিনি অক্ষম, অসমর্থ আত্মীয় স্বজনকে ও বন্ধু বান্ধবগণকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেন। কর্ম্মচারী-দিগের প্রতি তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন এবং সকল সময়েই তাহাদিগকে বেতনাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিতেন।

তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া কেহ ধারণাই করিতে পারিতেন না যে, তিনি বাঙ্গালী নহেন। তিনি সকল বিষয়ে বাঙ্গালী হইলেও জাতীয় আচার ব্যবহার কিন্তু ত্যাগ করেন নাই। আজও তাঁহাদের পরিবারে মাছ মাংসের চলন নাই এবং আতপ তণ্ডুল ভিন্ন অন্য চাউল খান না। মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের চরণ দাস বাবাজীর উপযুক্ত শিষ্য রামদাস বাবাজীর নিকট তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৯২১ সালের ১৮ই জুলাই, বাঙ্গলা ১৩২৮ সালের ২রা শ্রাবণ সোমবার তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর।

ইনি সন ১২৮৩ সাল ১৯শে শ্রাবণ বুধবার নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট সবডিভিসনের অন্তর্ভূক্ত গাংনাপুর গ্রামের কর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺ দ্বারকানাথ কর পার্শিভাষায় ও অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং হিসাব পরিদর্শনের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ও বহুকাল পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর রাজ-বাটীতে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উভয় ভ্রাতাই কর মহাশয়ের জমাখরচ জ্ঞানের প্রশংসা ও সমাদর করিতেন। উপেন্দ্রবাবুও সেই সূত্রে বাল্য জীবনের বিদ্যাভ্যাস ঠাকুর রাজাদের বাড়ীতে থাকিয়াই করিয়াছিলেন।

গাংনাপুরের কর বংশ সুবিখ্যাত। দেব সেবার, দেবত্র ভূমিদান প্রভৃতির নিদর্শন এই বংশের প্রভূত আছে।

আগরপাড়ার সন্নিকটবর্ত্তী পানিহাটীর কর বংশ ও ইঁহারা একই মূল হইতে উদ্ভূত এবং পরস্পর জ্ঞাতি। উপেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বপুরুষগণ পানিহাটী হইতে গাংনাপুর গ্রামে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করেন এবং বহু গোষ্ঠী সম্পন্ন হইয়া সমৃদ্ধির সহিত বসবাস করিতে থাকেন। উপেন্দ্র বাবুর বাল্য জীবনেও ১০।১২ ঘর কর গাংনাপুরে ছিলেন; কিন্তু এখন উক্ত বংশ প্রায় লোপ হইতে চলিল।

উপেন্দ্রবাবুর পিতা অতিশয় তেজস্বী, ধর্ম্মভীরু এবং অধ্যবসায়-শীল ছিলেন। অল্প বয়সে বিবাহের বিরোধী মত প্রযুক্ত ইনি ৫৯ বৎসর বয়সে যশোহর জেলা বনগ্রামের নিকট সুন্দরপুর গ্রামের

৺ মদনমোহন বসুর একমাত্র কন্যা চন্দ্ররেখা দেবীকে বিবাহ করেন; কিন্তু শ্বশুরালয় অপেক্ষা বনগ্রামের নিকট চালকী গ্রামে মামা শ্বশুরালয়েই কর মহাশয়ের যাতায়াত বেশী ছিল। ইহারা চালকি গ্রামের বিখ্যাত পালিত বংশ। উপেন্দ্র বাবুর মাতামহীর পিতা ৺ভোলানাথ পালিত বিশেষ সন্ততিবৎসল ছিলেন. অথচ কোন পুত্রসন্তান ছিল না। কাজেই মাতামহীকে প্রায়ই পিত্রালয়ে থাকিতে হইত এবং উপেন্দ্র বাবু চালকী গ্রামকেই বহুকাল যাবৎ মাতুল আশ্রয় বলিয়া জানিতেন। এমন কি ইনি চালকী গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হন।

ই, বি, রেলওয়ের রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম যে শাখা আছে উহাতে গোপালনগর ও বনগাঁ ষ্টেশনের মাঝামাঝি যায়গায় চালকী গ্রাম অবস্থিত।

উপেন্দ্র বাবুর পৈত্রিক বাসস্থান গাংনাপুর গ্রামে একটী ষ্টেসন আছে। রাণাঘাটের পরেই গাংনাপুর ষ্টেসন অবস্থিত। যশোহর হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তা আছে, তাহা চালকী গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বনগ্রাম ঘুরিয়া এই পাকা রাস্তা দিয়া গাংনাপুর গ্রামে মোটরে যাওয়া যায়, উপেন্দ্রবাবু সেইজন্য ঐরূপে যাইবার সময় চালকীগ্রামে জন্ম স্থানটী দেখিয়া যান।

চালকীর পালিত বংশ এখন প্রায় নির্ম্মূল। ২।১ ঘর যাঁহারা আছেন, অন্যত্র বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এখন সেস্থান প্রায় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

উপেন্দ্রবাবুর মাতা অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন এবং তাঁহার বিষয় বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। পিতার অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও মাতার হিসাবী বিষয় বুদ্ধি দুইই পুত্র উপেন্দ্রনাথ পাইয়াছেন।

ইহাঁরা চারি ভগিনী ও দুই ভ্রাতা। উপেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ উদাসীন। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা ভগিনী নিঃসন্তান হইয়া উপেন্দ্রবাবুর

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কর

পরিবার ভুক্তা, মধ্যমা ভগিনীর একটী পুত্র রাধাগোবিন্দ বাবু গাংনাপুরে বাস করেন এবং কর কোম্পানীর রেল ডিপার্টমেণ্টে ক্যাশিয়ারের কার্য্য করেন। তৃতীয় ভগিনী কিছুকাল পূর্ব্বে এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সেই পুত্র উপেন্দ্র বাবুর পরিবারভুক্ত।

বাসস্থান গাংনাপুর গ্রামে তৎকালে কোন বিদ্যালয় ছিল না। কাজেই উপেন্দ্রবাবুর পার্শ্ববর্ত্তী কোড়াবাড়ী গ্রামে নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ হয় এবং ইং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে নিম্ন প্রাথমিক (lower primary) পরীক্ষায় নদীয়া জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২৲ বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

তৎকালে ইঁহার পিতা রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজা বাহাদুরের দয়া দাক্ষিণ্য দেশবিখ্যাত। তিনি কার্য্যকারকদিগের আত্মীয় ছাত্রবর্গকে পঠদ্দশায় নিজ বাটীতে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। উপেন্দ্র বাবুও রাজা বাহাদুরের বাটীতে আহার ও কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রবৃত্তি বিভাগে বিনা বেতনের সুবিধা না পরিত্যাগ করিয়া উক্ত স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন এবং ১৬ দিন পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হন। ৩য় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একেবারে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত (Double promotion) হইয়া ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে ছাত্রবৃত্তি (Middle vernacular) পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

তৎপরে গবর্ণমেণ্টের হিন্দু স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে বিনা বেতনে ভর্ত্তি হইয়া ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে প্রবেশিকা (Entrance equivalant to Matriculation) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি (মাসিক ২০৲) লাভ করেন। ঐ পরীক্ষাতে উপেন্দ্রবাবু অঙ্ক বিদ্যাতে প্রথম হইয়াছিলেন এবং প্রায় পূর্ণ নম্বর পাইয়াছিলেন।

তদনন্তর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে এফ এ

(বর্ত্তমান I. Sc.) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ২৫৲ বৃত্তি এবং অঙ্ক শাস্ত্রে প্রথম হওয়ায় ডফ্ সাহেবের ১৫৲ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অঙ্কশাস্ত্রে ১২০ নম্বরের মধ্যে তিনি ১১৮ নম্বর পাইয়াছিলেন।

পরীক্ষার পর ৩ মাস অবকাশ কালে স্বগ্রামে একটী পোষ্ট আফিস ও একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বি, এ পরীক্ষার ৩ মাস পূর্ব্বে ইঁহার পিতার মস্তিষ্কের ব্যাধি হয় এবং তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় অনেক সময় নষ্ট হওয়ায় পড়া শুনার বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত সত্ত্বেও ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনার (Double honours) সহ উত্তীর্ণ হন।

ঐ সময়ে ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে মাঘ মাসে ইঁহার প্রথম বিবাহ হয়। কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটস্থ বিখ্যাত কাশীনাথ ঘোষ মহাশয়ের বংশধর স্বনাম-ধন্য বেঙ্গলী ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার স্থাপয়িতা ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মধ্যমা কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন।

বি,এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই পিতার ব্যাধিতে আর্থিক অসুবিধা বশতঃ এম,এ পড়িবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র উপায়ক্ষম হইবার জন্য শিব-পুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দ্বিতীয় মান শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন ও মাসিক২০৲বৃত্তি পান এবং ১৯০০খৃঃ অব্দে F.E. পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পঠদ্দশায় ১৯০১ খৃঃ ২৪ মে ইঁহার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হয় এবং ঐ সময়ে স্বগ্রামের পাঠশালাটীকে মধ্য ইংরাজী স্কুলে উন্নীত করেন। তিনি নিজের বৃত্তি হইতে ঐ স্কুলের মাসিক সাহায্য করিতেন।

ঐ সময়ে ১৯০১ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে প্রাইভেটে বিজ্ঞান শাস্ত্রে এম্ এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ইলেকট্রিক

ইঞ্জিনিয়ারিং এর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য মাসিক ১০০৲ রিসার্চ্চ বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

ইনি ১৯০২ খৃঃঅব্দে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং অঙ্ক শাস্ত্রেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দুইটী সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ইঞ্জিনিয়ারিংএর (প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেণিং) হাতে কলমে শিখিবার ব্যবস্থার জন্য ৫০৲ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, রিসার্চ্চের বৃত্তি পরিত্যাগ করেন। এক বৎসরে ঐ শিক্ষা শেষ করিয়া কর্ম্মোপযোগী হন।

গবর্ণমেণ্টের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদ বিলি করিবার নূতন নিয়ম ঐ বৎসরে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঐ নিয়ম অনুসারে সেই পরীক্ষায় প্রথম হইয়াও কর্ম্মকার শালার নম্বর কম থাকায় সরকারের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটে।

এখন দেখা যাইতেছে, ঐ ব্যাঘাত উপেন্দ্র বাবুর পক্ষে এবং দেশের পক্ষেও শুভ ফলদায়ক হইয়াছে ; নতুবা উঁহাকে গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ব্যতীত বর্ত্তমান উপেন্দ্র নাথ করের আকারে আমরা দেখিতে পাইতাম না ; দেশের কাজেও আমরা তাঁহাকে পাইতাম না।

এই সময়ে ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দের চৈত্র মাসে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়।

গবর্ণমেণ্টের নিম্নতর কোন চাকরি গ্রহণ না করিয়া ১৯০৪ খ্রী অব্দের এপ্রেল মাসে উপেন্দ্র বাবু ইন্দোর (হোলকার) গবর্ণমেণ্টের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্টের চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় এফ্ এ এ কাউনি মহোদয় তখন হোলকার গবর্ণমেণ্টের চিফ এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন এবং অল্প দিনেই উপেন্দ্র বাবুর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারের (Divisional Engineer equivalent to executive engineer) পদে উন্নীত করেন। ঐ কালে উপেন্দ্র বাবু সমস্ত হোল্কার রাজ্যের পূর্ত্ত বিভাগের

নিয়ম কানুন দর প্রভৃতি নূতন আকারে লিপিবদ্ধ করেন। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার কাউর্ন সাহেব উহা সমস্ত রাজ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

হোলকার রাজ্যে উপেন্দ্র বাবুর চাকরীর কাল অধিক দিন নহে, প্রায় ৩ বৎসর। তন্মধ্যে উপেন্দ্র বাবু বিস্তর রাস্তা ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে টুকোগঞ্জ প্রাসাদ সর্ব্বপ্রধান ও বিখ্যাত। ইহাতে উপেন্দ্র বাবুর প্রভুত যশ উপার্জ্জন হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমশীল কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও উপেন্দ্র বাবু গবেষণা (research) এর কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। লৌহ ও সিমেন্টের সংমিশ্রণে কৃত্রিম প্রস্তর তৈয়ারির বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া ইনি একটী re-in forced concreteএর পুন তৈয়ার করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এইটী ২য় re-in forced concrete এর কার্য্য। এই পুল খুব মজবুত হইয়াছে। এই গবেষণার ফলে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বড় আকারের re-in forced concrete এর কার্য্য গয়ার কলের জলের আধার দেখিতে পাইতেছি।

উপেন্দ্র বাবুর কার্য্য কালে বর্ত্তমান ভারতের সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ প্রিন্স অব ওয়েলস্ রূপে ইন্দোর পরিদর্শন করিতে যান। তদুপলক্ষে অভ্যর্থনা আয়োজনের সুচারু বন্দোবস্ত দ্বারা উপেন্দ্র বাবু যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি উপার্জ্জন করেন। তৎকালীন গবর্ণর জেনেরেলের এজেণ্ট (Agent to the govorner general of india Major Daly) এবং ইন্দোর ষ্টেটের রেসিডেণ্ট বোসাঙ্কে সাহেব বিশেষ প্রশংসা করেন ও উপেন্দ্র বাবুর গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

কিন্তু স্বাধীনচেতা কর্ম্মবীরকে দাসত্ব শৃঙ্খলে কয়দিন বাঁধিয়া রাখা যায়? উপরিতন মহাপুরুষদিগের অনুগ্রহ ও প্রীতি লাভ করিয়াও এবং রাজ্যময় সুনাম, সম্মান, যশ সৌরভ ও আর্থিক আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও উপেন্দ্র বাবু ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে চাকরিতে ইস্তাফা দিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন ও কর কোম্পানি নাম দিয়া কণ্টাক্টরের কার্য্য সুরু করেন।

ইতিমধ্যে একবার ১৯০৩ সালের প্রারম্ভে ছুটী লইয়া দেশে আসেন এবং মাতৃদেবীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। নৈহাটীর স্বনামখ্যাত জমিদার ৺ প্রসন্ন চন্দ্র ঘোষ মজুমদার মহাশয়ের প্রথম পুত্র রাখাল চন্দ্র ঘোষ মজুমদারের প্রথমা কন্যা, সৌভাগ্যবতী হেমলিনী দেবীই ইঁহার দ্বিতীয় পত্নী।

চাকরি পরিত্যাগ করিয়া উপেন্দ্র বাবুর দারুণ অর্থ কষ্ট উপস্থিত হয় ; কারণ চাকরি অবস্থায় ইনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। নিজের দানবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া দেশের গরিব, দুঃখী, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা উঁহাকে নিজের অভাব জানাইলে অকাতরে সাহায্য পাঠাইতেন।

অদ্ভুতকর্ম্মা, অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকে অর্থ কষ্টে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি সংসার প্রতিপালন এবং কণ্ট্রাক্টের কার্য্য চালাইবার মুল ধনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেও ঐ সময়ে ভাল ভাল চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

ভাটপাড়া রিলায়ান্স পাট কলের ১, ২৫০০০ টাকায় কার্য্যের কণ্ট্রাক্ট কর কোম্পানি ফারমের প্রথম কার্য্য। কিন্তু মূল ধন মাত্র ৪০০৲ চারি শত টাকা। আমাদের দেশের লোক মনে করে বিনা পুঁজিতে কোন ব্যবসা হয় না। ইহার ভ্রমাত্মকতা উপেন্দ্র বাবু স্বায় কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন যে বিস্তৃত কারবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়লার খনি, ইটের কুরুক্ষেত্র, রেলওয়ে কার্য্য পরিচালন ও ৭০ লক্ষ টাকার কণ্ট্রাক্টের কার্য্য সুচারুরূপে সুনামের সহিত চলিতে দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়, তাহার মূলধন আদিতে চারিশত টাকা মাত্র। মানুষের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মূল্য আমরা যাহা মনে করি তদপেক্ষা ঢের বেশী।

বন্ধু বান্ধবের নিকট সামান্য সামান্য ঋণ গ্রহণ করিয়া প্রথম কার্য্য চালাইবার সময় কাঁচরাপাড়া রেলের বাড়ী ও গাংনাপুর ষ্টেসন বাড়ী

এই দুইটী সামান্য কণ্ট্রাক্ট উপেন্দ্র বাবু গ্রহণ করেন এবং দারুণ ক্লেশ, উদ্বেগ ও পরিশ্রম দ্বারা পর পর ঐ কার্য্যগুলি সমাধা করেন।

কিন্তু প্রথম কার্য্যে দশ হাজার টাকা লোকসান হইল। সাধারণ চরিত্রের লোক ঐ ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না—অভিভূত হইয়া পড়ে! নিজের মূলধন নাই বলিলেই হয়, বন্ধু বান্ধবের নিকট সম্মান বিনিময়ে ঋণের মূলধন হইতে এত বেশী লোকসান সহ্য করিয়া কয়জনে স্থির থাকিতে পারে? পরন্তু অটল অধ্যবসায়ী কর্ম্মবীর উপেন্দ্র নাথের কথা স্বতন্ত্র। তিনি এই লোকসান কাহাকেও জানিতে দিলেন না, ধীরভাবে নিজে মনে মনে সহ্য করিয়া কার্য্য চালাইতে লাগিলেন; দ্বিতীয় কার্য্যে লাভ লোকসান কিছুই হইল না, তৃতীয় কার্য্যে গাংনাপুর ষ্টেসন বাড়ীতে সামান্য লাভ হইল। কিন্তু এই লাভ লোকসানের মধ্য দিয়া কর কোম্পানির ফারম গড়িয়া উঠিল।

রিলায়ান্স পাট কলের কার্য্য দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কাকিনাড়া পাট কলের মালিক জার্ডিন স্কিনারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গুণগ্রাহী ক্লার্ক সাহেব উপেন্দ্র বাবুকে নিজে ডাকাইয়া কামারহাটী পাটকলের কার্য্য দেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কর কোম্পানি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। আজ বিশ বৎসর ধরিয়া কর কোম্পানীর মালিক ও অধ্যক্ষ উপেন্দ্র বাবু ঐ নামে বিস্তর বৃহৎ এবং কঠিন ও নানা প্রকারের কার্য্য নানাস্থানে করিয়াছেন। যথা :—

১। জলের কল—নৈহাটী. উত্তরপাড়া, কৃষ্ণনগর, শিবপুর, গয়া। গয়ার জল রাখিবার আধার সিমেণ্ট ও লোহার সংমিশ্রণে প্রস্তুত। এত বৃহৎ এই ধরণের কার্য্য ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রথম।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় খাবার জলের জন্য পলতায় ৫০ লক্ষ টাকায় কার্য্য করিতেছেন।

২। পয়ঃপ্রণালী—বারাসত, বরান গর, কামারহাটী, গয়া, মুঙ্গের, জমশেদপুর (টাটা লোহার কারখানাতে), কাটোয়া, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী।

৩। ডকের কার্য্য :—গার্ডেনরীচে ম্যাকনীল কোম্পানীর স্লিপওয়ে। ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম।

৪। অট্টালিকা :—(১) টাটা লোহার কারখানার বিস্তর বাটী, তন্মধ্যে টাটা ইন্‌ষ্টিটিউট ও ডিরেক্টরবর্গের বাসগৃহ সর্ব্বপ্রধান উল্লেখ-যোগ্য। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার কার্য্য।

(২) শিক্ষা বিভাগীয় এবং সাধারণের কার্য্যোপযোগী যথা :—পাবনা কলেজ, কোন্নগর স্কুল, নৈহাটী মিউনিসিপ্যাল অফিস, কলেজ ষ্ট্রীট বাজার।

(৩) ই, বি, রেলওয়ে :—কাঁচরাপাড়া বাসগৃহ, গাংনাপুর ষ্টেশন, বালিগঞ্জ বাসগৃহ ইত্যাদি।

(৪) গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্ত বিভাগীয় :—যথা গয়া পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস, চুয়াডাঙ্গা পুলিস অফিস, মুঙ্গের সেণ্ট্রাল জেল, জমসেদপুর পোষ্ট অফিস, পুলিসবাটী, সুকিয়া ষ্ট্রীট পুলিস বাটী, হিজলি (খড়্গপুর) জেলা বাটী, সার্ভে অফিস, মেডিকল কলেজের চক্ষু হাসপাতাল, ইত্যাদি।

(৫) ব্যক্তিগতবাটী :—যথা রাজা প্যারীমোহন মুখুয্যের উত্তরপাড়া প্রাসাদ, ডেভিড সেস্থন কোম্পানীর সাততালা বাড়ী, ভূপেন্দ্রনাথ বসুর অফিসবাড়ী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতার বাড়ী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৬) পাটকল সংক্রান্ত :—(ক) হাউসেন ব্রাদার্সের রিলায়ান্স পাট কলের বড় গুদাম, (খ) জার্ডিন স্কিনারের কামারহাটী পাট কলের কল, গুদাম, বাড়ী প্রভৃতি, (গ) স, ওয়ালেশের হুগলী ক্রাউয়ার মিলের ম্যানেজারের বাসবাটী, (ঘ) র‍্যাণ্ড ইউলের বজবজ নোথিয়ান পাট-কলের বাসবাটী, (ঙ) কাশীপুর লক্ষ্মী প্রেস, (চ) বেরি কোম্পানীর নদীয়া

পাটকলের গুদাম, বাসবাটী ইত্যাদি) গৌরীপুরের বাসবাটী প্রভৃতি,—(ছ) তিলকচাঁদ কোম্পানীর কুঠী। ইত্যাদি। (জ) ম্যাকিনন মেকেঞ্জির শ্রীরামপুরের মেঘনা পাটকলের বাসবাটী ও জগদ্দল পাটকলের বাসবাটী ইত্যাদি।

এতাবৎ প্রায় তিন ক্রোর টাকার কণ্ট্রাক্টের কার্য্য কর কোম্পানি সম্পন্ন করিয়াছেন।

উপেন্দ্র বাবুর উদ্যম কেবল কণ্ট্রাক্ট কার্য্যে শেষ হয় নাই। বিল্ডিং কার্য্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য ইট ও টালি তৈয়ারি করিবার একটী যৌথ কারবার—

(১) করস্ ব্রিকস্ এণ্ড টালিস্ নামে ১৯২০ খৃঃ অব্দে দশ লক্ষ টাকার শেয়ার মূলধনে স্থাপিত করেন। ইছাপুর কোতরং. বানিতে ইহারা ইট ও টালি তৈয়ার করিতেছেন; এই ইট অন্য সকল ইটের অপেক্ষা গাঁথনির পক্ষে সুবিধাজনক ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে ও ইহার দর বাজারের ইট অপেক্ষা হাজার প্রতি ১৲ বেশী দরে বিক্রয় হইতেছে।

এই কোম্পানীর অংশীদারগণ প্রথম বৎসরে শতকরা ১৫৲ ডিভিডেণ্ড পাইয়াছিলেন এবং তৎপরে প্রতিবৎসর ৯৲ হারে ডিভিডেণ্ড পাইতেছেন।

ইট পোড়াইবার জন্য উপযোগী কয়লা সময়মত পাইবার ব্যবস্থা, অন্য কয়লা ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর না রাখিয়া উপেন্দ্র বাবু একটী বৃহৎ কয়লার খনি করিয়াছেন। দেশবিখ্যাত শিবপুর নন্দী স্তরের কয়লা পাওয়া গিয়াছে। এই কয়লার খনি, ব্রিক কোম্পানীর নিজস্ব সম্পত্তি।

(২) খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিবার জন্য উপেন্দ্র বাবু একটী ছোট যৌথ কারবার করস্ মাইনিং সিণ্ডিকেট নামে খুলিয়াছেন।

এই কোম্পানির অংশীদারগণ প্রতি বৎসর শতকরা দশটাকা ডিভিডেণ্ড পাইতেছেন।

সম্প্রতি বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন কার্য্যে কর কোম্পানির হাত পড়িয়াছে। রেলওয়ে পরিচালন কার্য্য ভারতবাসীর নাই বলিলেই হয় এবং ঐ কার্য্যে ভারতবাসী সফলতা লাভ করিয়াছেন এমন একটীও উদাহরণ নাই। কিন্তু যশোহর ঝিনাইদহ রেলওয়ে হাতে লইয়াই কর-কোম্পানি প্রথম ছয় মাসেই শতকরা বার্ষিক ৭৲ সাত টাকা হারে ডিভিডেণ্ড দিয়াছেন। এবারেও এক বৎসরে শতকরা ১১½ সাড়ে এগার টাকা লাভ হইয়াছে।

যশোহর ঝিনাইদহ লাইন বাঙ্গালী ক্ষেত্রমোহন দে তৈয়ারি করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে পরস্পর কলহের ফলে লাইনটী সাহেব ম্যাকলাউড এর হাতে যায়। ম্যাকলাউড কোম্পানি গত ১০ বৎসর ধরিয়া কিছুই লাভ করিতে পারিতেছিলেন না; বরং প্রত্যেক বৎসর লোকসান হইতেছিল। ঋণ পরিশোধের উপায় না পাইয়া উঁহারা রেল-কোম্পানিকে ক্রীত করিয়া দেন।

দেশের মান্যগণ্য ব্যক্তিগণের অনুরোধে ও স্বনামধন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উৎসাহে উপেন্দ্র বাবু ঝিনাইদহ রেলওয়ে সিণ্ডিকেট নামে একটী কোম্পানি গঠন করিয়া উহা ক্রয় করেন এবং প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিউরেন্স সোসাইটীর সাহায্যে ও দেশবন্ধুর সোৎসাহ আনুকূল্যে কোম্পানিকে পরিপুষ্ট করিয়া সুন্দরভাবে যশের সহিত কার্য্য পরিচালনা দ্বারা লাইনটীকে লাভজনক করিয়া তুলিয়াছেন। রেলওয়ে পরিচালনা কার্য্যে বাঙ্গালীর পক্ষে সফলতার নিদর্শন এই প্রথম।

কর-কোম্পানির কার্য্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—

১। খাঁটী বাঙ্গালীর হাতে প্রথম জলের কল। যথা, নৈহাটী কলের জলের কার্য্য।

২। ভারতের প্রথম বড় লৌহ সিমেন্ট সংমিশ্রন কার্য্য যথা—গয়ার কলের জলের আধার।

৩। কলিকাতার প্রথম সাততালা বাটী। যথা ডেভিড সেসুন কোম্পানির অফিস বাটী।

৪। ভারতের বৃহত্তম স্লিপওয়ে (ডকের কার্য্য) যথা—গার্ডেন রীচ স্লিপ ওয়ে।

৫। ভারতীয় লোকের পক্ষে রেলওয়ে কার্য্য পরিচালনার সফলতা। যথা—যশোহর ঝিনাইদহ রেলওয়ে।

উপেন্দ্র বাবুর কর্ম্মজীবনে সাধারণের উপকারপ্রদ কার্য্যও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর ছুটীতে স্বগ্রামে গাংনাপুর যাইয়া শিক্ষা বিস্তারের জন্ত একটী নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন করেন এবং নিজে প্রথমতঃ শিক্ষকতা করিয়া উহাকে আয়জনক করিয়া একটী শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে এফ্ এ পরীক্ষার পর ছুটীতে যাইয়া একটী পোষ্ট অফিস স্থাপন করেন ও গ্রামের জঙ্গল কাটিয়া গ্রামের মধ্যে একটী কাঁচা রাস্তা তৈয়ার করেন। গ্রামের লোক সাধারণতঃ নিঃস্ব বলিয়া একমাত্র বাল্যবন্ধু ও সহকর্ম্মী অবস্থাপন্ন পঞ্চানন ঘোষাল মহাশয়েরও অর্থ সাহায্যে ও নিজের বৃত্তির সাহায্যে পাঠশালা, গৃহ নির্ম্মাণ এবং অন্তান্ত সাধারণ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

১৮৯৮ খৃঃ অব্দে বি এ, পরীক্ষার পর অবকাশকালে বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে উন্নীত ও কতকগুলি নূতন রাস্তা প্রস্তুত করেন।

১৯০১ খৃঃ অব্দে উক্ত পাঠশালা মধ্য ইংরাজী স্কুলে (Middle

English School) পরিণত হয় এবং ১৯০৫ সালে উহার পাকা বাড়ী উপেন্দ্র বাবু নিজ ব্যয়ে করিয়া দেন।

গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবা বুজান, খাবারের জলের জন্য খুব বড় পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি সাধারণের উপকারার্থ করাইয়া দেন।

গ্রামের কায়স্থ ব্রাহ্মণের বাস কমিয়া যাওয়ায় অনেক গৃহস্থকে নিজ ব্যয়ে বাড়ী ঘর তৈয়ার করাইয়া দিয়া বসবাস করান, পাকা রাস্তা করা প্রভৃতি শনৈঃ শনৈঃ হইতে থাকে।

পরে ১৯২৩ খৃঃ অব্দে গাংনাপুর ও নিকটবর্ত্তী ২০ খানি গ্রাম লইয়া একটী পল্লীহিতৈষিণী সমিতি গঠনপূর্ব্বক রাস্তা, পানীয় জলের কল, ইঁদারা, তুলার চাষ, চরকার সূতা তৈয়ারি এবং একটী বুনন শিক্ষার স্কুল করিয়া তাহাতে কাপড় বুনান প্রভৃতি করিয়া স্বপল্লী ও পার্শ্বস্থ পল্লী সমূহের উন্নতি করিতেছেন।

১৯২৪ খৃঃ অব্দে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় গাংনাপুরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত পল্লীতেই একটী বা ততোধিক ইঁদারা করাইয়া দিয়াছেন। দেখা যায়, দেশপ্রেমিকতাই উপেন্দ্র বাবুর উন্নতির সোপান।

উপেন্দ্র বাবু দেশহিতকর কার্য্যের প্রধান কার্য্যকারক ; তদীয় উপযুক্ত শিষ্য মাঝেরগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ। ইঁহাকে উপেন্দ্র বাবু বাল্যকাল হইতে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং কর-কোম্পানির অফিসের কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। স্বদেশব্রত মন্ত্রে দীক্ষিত প্রভাস বাবু উপযুক্ত ভাবেই দেশের হিতকর কার্য্যে শিক্ষাদাতা উপেন্দ্র বাবুর মতই চালাইতেছেন।

কর-কোম্পানীর Firm এর কর্ম্ম কর্ত্তা এখন উপেন্দ্র বাবুর উপযুক্ত জামাতা শ্রীযুক্ত সুবোধ কৃষ্ণ বসু রায় বি, ই। ইনিও ইঞ্জিনিয়ার এবং এই ৯ বৎসরকাল উপেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য চালাইয়া বিশেষ কর্ম্মক্ষম ও

পারদর্শী হইয়াছেন। তিনি এখন ফার্ম্মের চতুর্থাংশ অংশীদার। আশা করা যায়, উপেন্দ্র বাবুর অবর্ত্তমানে তৎস্থাপিত উন্নতিশীল ফার্ম্মটীর যশ ও উন্নতিশীলতা অক্ষুন্ন থাকিবে।

রাজীবপুরের ঘোষ বংশ।

চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমার অধীন রাজীবপুরের ঘোষ বংশের আদিপুরুষ মকরন্দ ঘোষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ হরিদাস ঘোষ রাজীবপুরে আগমন করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বংশের ত্রয়োবিংশ পুরুষ ঈশান চন্দ্র ঘোষ ঐ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বাস করিয়া পরলোক গমন করেন। ইনিই রাজীবপুর হাইস্কুলের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান, পরে ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দর ঘোষ মহাশয় জ্যেষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টীর উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। ইনি দীর্ঘ কাল গভর্ণমেণ্টের অধীনে নানাস্থানে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ইঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় সর্ব্ব সাধারণের টীকা গ্রহণের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। রাজীবপুর গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত রাস্তাই এই রামসুন্দর ঘোষ মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত ঈশান চন্দ্রের ছয় পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কালীভূষণ, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ, তৃতীয় কামিনীকুমার, চতুর্থ অন্নদা প্রসাদ, পঞ্চম মতিলাল ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ হীরালাল ঘোষ ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ কালী ভূষণ খৃষ্টীয় ১৮৪৩ সালে উক্ত রাজীবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া কলিকাতা হেয়ার স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কমিসেরিয়েট বিভাগে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রধান সহকারীর পদে ত্রিশ বৎসর কাল দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৯৪ অব্দের ১লা জানুয়ারী

রায় বাহাদুর

স্বর্গীয় কালিভূষণ ঘোষ।

তারিখে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল রাজীবপুর গ্রামে অতিবাহিত করিয়া খৃষ্টীয় ১৯১২ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সদস্য এবং বারাসত বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, কলিকাতা নগরে শিক্ষালাভ করিয়া কমিসেরিয়েট বিভাগে যোগ্যতার সহিত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল কার্য্য করিয়া ১৮৯২ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে "রায় সাহেব" উপাধি লাভ করেন, ইনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মিরাট নগরে য়্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুল এবং ১৮৯৭ অব্দে নাইনিতাল সহরে ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৩ অব্দে উক্ত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি রাজীবপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারই যত্নে রাজীবপুর হাই স্কুলটী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

চতুর্থ অন্নদা প্রসাদ ঘোষ কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজ বাস গ্রামে সুখ্যাতির সহিত চিকিৎসা করিতে করিতে অকালে পরলোক গমন করেন।

পঞ্চম মতিলাল ঘোষ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ইনিও কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করিয়া মিলিটারী একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটী এক্জামিনারের পদ গ্রহণ করেন এবং প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে "রায় সাহেব" উপাধির সহিত অবসর গ্রহণ করেন।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ হীরালাল ঘোষ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি দৌলৎপুর কলেজের ডিমনেষ্ট্রেটারের পদে কার্য্য করিবার সময় উক্ত কলেজের উপরিভাগে স্থাপিত টাওয়ার ক্লকটী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় ইনিও অকালে দেহ ত্যাগ করেন।

কালী ভূষণ ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম লাভ করিয়া কলিকাতা নগরে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইনি প্রায় চব্বিশ বৎসর কাল বারাসত লোকাল বোর্ডের এবং দ্বাদশ বর্ষ কাল চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত আছেন, ; তন্মধ্যে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অস্থায়ীভাবে উক্ত জেলাবোর্ডের চেয়ার-ম্যানের পদে নিযুক্ত হন এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য করিয়া সাধারণের নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর কাল বারাসত মহকুমার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করিয়া আসিতে-ছেন। রাজীবপুর ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের পদে কার্য্য করিবার সময় ইঁহারই যত্নে উক্ত গ্রামের জলনিকাসী পথ ও পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হয় ; তজ্জন্য ১৯২০।২১ সালের সরকারি রিপোর্টে রাজীবপুর ইউনিয়ন কামটি বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল ; ইহার অর্থ সাহায্যে ও যত্নে রাজীবপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হাইস্কুলে পরিণত হইবার পথে অগ্রসর হয় এবং প্রায় বিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইনি স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থে "কালীভূষণ হিন্দুহোষ্টেল" নামক সুন্দর ছাত্র নিবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণের ও স্কুলের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন এবং ঐ ছাত্রা-বাসের সম্মুখে একটী বৃহৎ জলাশয় খনন করাইতেছেন। ইনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের ও চব্বিশ পরগণা জেলার কৃষি সমিতির এবং অন্যান্য দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানের সভ্যের পদও লাভ করিয়াছেন। উল্লিখিত নানা প্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে ইঁহার যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া গভর্ণমেণ্ট ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত করেন। সুরেন্দ্র বাবুর দুই পুত্র পরেশ ও যোগেশ। পরেশ বাবু ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিক্যালচারেল এসোসিয়েসনের একজন মনোনীত সদস্য।

নিম্নে ইঁহাদের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল :—

রায় সাহেব শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বংশ তালিকা।

হরিদাস ঘোষ
যাদবিন্দু
জনার্দ্দন
রাধাকান্ত
জানকীবল্লভ
রামগোবিন্দ
রামচরণ
সাফল্যরাম
কন্যা: স্বা: রামকান্ত বসু নি: রাজীবপুর
গঙ্গানারায়ণ
দর্পনারায়ণ
ঈশান
শিবনারায়ণ
কৈলাশ
কালীভূষণ
শ্রীকৃষ্ণ
কামিনীকুমার
অন্নদা
মতিলাল
হীরালাল
রায়বাহাদুর
রায়সাহেব
দ্বিজেন্দ্র
রমেশ
রায়সাহেব
সুশীল
সুরেন্দ্র
নগেন্দ্র
ভবেশ
অপূর্ব্ব
প্রভাতকিরণ
স্যারসাহেব
রমাপ্রসাদ
চন্দ্রমাধব
শিশির
পরেশ
মনমোহন
যোগেশ
আনন্দমোহন

রমানাথ
হরি
বনমালা
ননীগোপাল
শচীন্দ্র
খগেন্দ্র
ফণীন্দ্র
অবনী
সুবোধ
সন্তোষ
প্রফুল্ল
উপেন্দ্র
বিভূতি
অম্বিকা
ললিত
কিশোরী
অমূল্য
মুরারি
মদনমোহন
শ্যামসুন্দর
সুধাংশু
শশাঙ্ক
সুরেন্দ্র

ডাঃ এম্, এন্, ব্যানার্জ্জী সি আই ই।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সি আই ই।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (ডাঃ এম, এন, ব্যানার্জ্জি) নদীয়া জেলার সুবর্ণপুর গ্রামে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্যস্কুলে তাঁহার বাল্যশিক্ষা। দশবৎসর বয়সে ঐ স্কুল হইতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি লইয়া কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করেন। সেখানে দুই বৎসরে কেবল (ফাষ্ট বুক অফ রিডিং (First Book of Reading) ও সেকেণ্ড বুক অফ রিডিং (Second Book of Reading) শিক্ষা করেন, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতি পূর্ব্বেই শিখিয়াছিলেন। সময় অনর্থক যাইতেছে দেখিয়া তিনি হুগলি কলেজে গিয়া এক শ্রেণী উপরে ভর্ত্তি হন ও সেখানে এক বৎসর থাকিয়া পুনরায় হেয়ার স্কুলে আসিয়া দুই শ্রেণী উপরে ভর্ত্তি হইলেন। এইরূপে ৯ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৬ বৎসরে এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন। মাতৃভাষা আগে শিখিয়া পরে ইংরাজি শিক্ষা করা এবং মাতৃভাষায় /ব্যাকরণ, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া পুনরায় ইংরাজিতে সেই সকল আলোচনা করা অতি সহজ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বদাই মনে হইত কোন স্কুলে বাঙ্গালা না শিখাইয়া ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করা উচিৎ নয়। সম্প্রতি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার যেরূপ নূতন নিয়ম প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা এই মতানুযায়ী এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে যে ছাত্রদিগের বিশেষ মঙ্গল হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় হেয়ার স্কুলের প্রথম ও সমস্ত প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান পান। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ, এ দিয়া

সেণ্ট ভিয়ার কলেজে বি. এ পড়িতে যান। ফাদার লাফোর বক্তৃতা শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা করিবার অভিলাষই সেণ্টেজেভিয়ারে যাওয়ার কারণ। বি, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া বিজ্ঞানে, এম, এ পড়িতে আরম্ভ করেন। সেই সময় ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজে বিজ্ঞানের লেকচারারের পদে নিযুক্ত হইয়া এক বৎসর সেই কার্য্যও করেন। এই সময়ে Physiology primer বলিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করেন। Physiology ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য মেডিকেল কলেজে লেকচার শুনিতে যান ও ক্রমে ডাক্তারি পড়িবার ইচ্ছা এত প্রবল হয় যে, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়িয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। ২॥ বৎসর সেখানে পড়িয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

তিনি কলিকাতায় যখন বি, এ. পড়িতেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ "আর্য্যদর্শন" নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকায় জাতীয় ভাব উত্তেজক প্রবন্ধগুলি সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ লিখিতেন ও সকলে আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। মহেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার এক প্রকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি তিনি নিজে লিখিতেন। বিলাত যাইবার সময়ও সেখানে গিয়া কিছুদিন "বিলাত যাত্রীর পত্র" অনেকগুলি লিখিয়াছিলেন, অনেক শিক্ষিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক আর্য্যদর্শন সম্পাদকের নিকট আসিতেন, তাঁহাদের সহিত বিজ্ঞান. রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া মহেন্দ্রনাথ মানসিক উৎকর্ষ লাভ করেন ও তাঁহার চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়।

তিনি যেদিন বিলাত যাত্রা করেন, তাঁহার মাতা জানিতেন না। মাতার ভয়ানক অমত ছিল বলিয়া গোপনে সমস্ত আয়োজন করিয়া ও জাহাজে উঠিবার কিছু পূর্ব্বে ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথকে বলিয়া জাহাজে উঠেন। যে ছয় বৎসর বিলাতে ছিলেন, মাতার মনে কষ্টের সীমা ছিল না;

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া সে কষ্ট নিবারণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং মা-। যতদিন বাঁচিয়াছিলেন তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়া তাঁহার সকল ইচ্ছা পুর্ণ করিয়া তাঁহাকে মনের সুখে রাখিয়াছিলেন ; তাহাতে মহেন্দ্রনাথ আপনাকে ভাগ্যবান ও পরম সুখী মনে করেন।

বিলাতে প্রথমে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারি মাস ও পরে লণ্ডনে (Kings College) কিংস কলেজে অধ্যয়ন করেন, কিংস কলেজে স্বয়ং লর্ড লিষ্টারের নিকট পচন নিবারক (antiseptic) অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা করেন। সেই সময় অর্থের স্বাচ্ছল্য না থাকায় তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। সে সকল অতিক্রম করিয়া এক মনে ও এক উদ্দেশ্যে কলেজ ও হাসপাতালের পাঠ শেষ করিয়া ২॥ বৎসরে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অল্পদিন পরেই লণ্ডনের (Royal Free Hospital) রয়াল ফ্রি হাসপাতাল (Resident Medical officer) রেসিডেণ্ট মেডিকেল অফিসার এর পদে নিযুক্ত হন। ২ বৎসর জুনিয়ার রেসিডেণ্ট (Junior Resident) থাকিয়া শেষ বৎসরে সিনিয়র রেসিডেণ্ট (Senior Resident) হইয়াছিলেন। তিন বৎসর রয়াল ফ্রি হাসপাতালের (Royal Free Hospital) সকল বিভাগে কার্য্য করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং ইহার ফল তিনি ভবিষ্যতে কলিকাতায় চিকিৎসা করিবার সময় পদে পদে অনুভব করিতেন। এই তিন বৎসর হাসপাতালের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার সাধারণ কার্য্যে যোগ দিতেন। বিলাত প্রবাসী ভারতবাসীদের লণ্ডনে একটী ইণ্ডিয়ান সোসাইটী (Indian Society) ছিল। তিনি ও বম্বের আর ডি শেঠ্‌না ঐ দুই সোসাইটীর সহযোগী সম্পাদক এবং রাজা রামপাল সিং সভাপতি ছিলেন। প্রতি মাসে সভা হইত ও অনেক বিষয়ের আলোচনা হইত। সম্পাদকের কার্য্য অধিকাংশই তাঁহাকে করিতে হইত। লালমোহন ঘোষ যখন পারলামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন, তখন এই ইণ্ডিয়ান

সোসাইটী একটি সাধারণ অধিবেশনের অনুষ্ঠান করেন। উইলসিস রুমে এই সভা হয়। ইহাতে অনেক লোক আসিয়াছিলেন এবং জন ব্রাইট্ ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। লালমোহনের বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল ও সকলেই প্রশংসা করিয়াছিল। গ্লাড্‌ষ্টোন যখন প্রধান মন্ত্রী তখন তাঁহাকে এই সোসাইটী হইতে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। সোসাইটীর সমস্ত সদস্যগণ ডাউনিং ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে সভাসদ ও সভাপতি রাজা রামপাল সিংহ অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। সদস্যদিগের নানারূপ ভারতবর্ষীয় পরিচ্ছদ দেখিবার জন্য ডাউনিং ষ্ট্রীটে অনেক লোক জমিয়াছিল। অনেকে রেড ইণ্ডিয়ান (Red Indian) দেখিবার আশায় আসিয়া সুন্দর ভারতবাসীর পোষাক দেখিয়া চমকিত হয়। তাহার পর দিন সমস্ত সচিত্র পত্রিকায় সদস্যগণের ছবি বাহির হয়। ইলবার্ট বিল সম্বন্ধেও দুই একটী সভা হয়। এক রাত্রিতে হোবর্ণ রেষ্টুরেণ্টে (Holborn Resturant) সভাপতি রাজা রামপাল এক প্রীতিভোজন দেন। সোসাইটীতে সমস্ত সদস্য ও বাহিরের অনেক লোক নিমন্ত্রিত হয়। সেই রাত্রিতে টেলিগ্রাম আসিল লর্ড রিপণ রণে ভঙ্গ দিয়াছেন। লালমোহন ঘোষ দুঃখের সহিত অনেক কথা বলিলেন। শেষ বলিলেন, "I cannot value the chastity of a woman who keeps it till the eleventh hour but sells it at the twelfth"—Fawcett M. P. ফসেটকে সকলে পার্লামেণ্টের ভারতবর্ষীয় সদস্য বলিত, তিনি যখন পরলোক গমন করেন, তখন ইণ্ডিয়ান সোসাইটী একটী ফসেট শোক সভা—(Memorial Meeting) করিয়া ফসেট (Fawcett) ভারতবর্ষের জন্য পার্লামেণ্টে (Parliament) যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি সম্পাদক থাকিতে আরও অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় এবং সে সকল কার্য্যের তিনিই প্রধান অভিনেতা ছিলেন। সে সময় ইংলণ্ডে

ভারতবাসীরা সর্ব্বত্রই আদরে গৃহীত হইতেন। তখন ভারতবাসীর প্রতি ইংলণ্ডবাসীর এখনকার মত বীতরাগ ছিল না।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মহেন্দ্রনাথ ১৮৮৬ সাল হইতে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। নিজে স্বাধীনভাবে বসিয়া চিকিৎসা করিলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত মনে করিয়া ইণ্ডিয়া অফিসের (India office) সার জোসেফ ফেয়ার ও অন্য একজন সদস্যের চিঠি লইয়া বঙ্গের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের সহিত দেখা করেন। ছোটলাট তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি ছয় মাস চিকিৎসা করিয়া সুবিধা না হয় ত পুনরায় দেখা করিবেন বলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই কতকগুলি লোককে কঠিন রোগ হইতে আরাম করিতে সক্ষম হন এবং সেই জন্য ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার ব্যবসায়ের সুবিধা হইল, কাজেই চাকরী লইলেন না। তিনি প্রথম হইতেই এ দেশের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা ও হাসপাতাল দেখা শুনা (Hospital management) বিলাতের মত নয় ইহা অনুভব করেন। বিলাতে কোন মেডিকেল কলেজ স্কুল, বা হাসপাতাল গবর্ণমেণ্টের নয় এবং সে সকলের অধ্যাপক, চিকিৎসক, অস্ত্র চিকিৎসক বা কর্ম্মচারী কেহই গবর্ণমেণ্টের লোক নহেন। সেখানে মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল বহুসংখ্যক, আর এদেশে সে সকলের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহারও প্রায় সকলই গবর্ণমেণ্টের এবং সে সকলের শিক্ষক ও কর্ম্মচারী সবই গবর্ণমেণ্টের। ইংলণ্ড ও বাঙ্গালা দেশের লোক সংখ্যা প্রায় সমান, সে দেশের তুলনায় বাঙ্গালা দেশ রোগে পরিপূর্ণ, অথচ এখানে চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প ও হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা আরও অল্প। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য শত ছাত্র আবেদন করিতেছে, কিন্তু স্কুলে স্থান নাই। এক এক মড়কে সহস্র সহস্র লোক বিনা চিকিৎসায় মরিয়া যাইতেছে, চিকিৎসক কোথায়? কে চিকিৎসা করে? সহজ অবস্থায়ও কত রোগী হাসপাতাল ডিস্‌পেন্সারিতে

স্থান পায় না, আর পল্লীগ্রামে চিকিৎসক পাওয়া যে কি দুরূহ তাহা সকলেই জানেন। এই সকল অবস্থার কিসে প্রতিকার হয়, ইহা আলোচনা করিবার জন্য তিনি ও অনেকগুলি ডাক্তার ও অন্যান্য ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ১৮৮৬ সালের জুন মাসে একটী সভা করেন। মহেন্দ্রনাথ তাহার সভাপতি ছিলেন। সভায় ধার্য্য হয় যে একটী স্বাধীন (গবর্ণমেণ্টের নয়) মেডিকেল স্কুল ও Out-door dispensary অবিলম্বে স্থাপনা করিতে হইবে। ১ মাসের মধ্যেই একটী বাটী ভাড়া করিয়া সেই বাটীতে কলিকাতা মেডিকেল স্কুল (Calcutta Medical School) নামে একটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্কুল তিল তিল করিয়া বাড়িয়া বাড়িয়া একটী স্বাধীন মেডিকেল স্কুল ও কলেজে (Medical school ও college) প্রস্ফুটিত হয় এবং ক্রমে গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণের সাহায্যে চতুর্দ্দিকে বহু স্থান অধিকার করিয়া কলেজ, রাসায়নিক কারখানা, হাসপাতাল, ঔষধালয় প্রভৃতি বহু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিস্তার করিয়া ৬০০ ছাত্র ও বহু শিক্ষক লইয়া বৃহদাকারে এখন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (Carmichael Medical College) পরিণত হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় আর, জি, কর, কুমুদনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, পি মুখার্জ্জি, সুন্দরীমোহন দাস, জগবন্ধু বসু ও লালমাধব মুখার্জ্জি প্রভৃতি অনেক ডাক্তার ইহার কার্য্যভার বহন করেন; পরে নীলরতন সরকার, এস, পি সর্ব্বাধিকারী ও আরও অনেক ডাক্তার ইহাতে যোগ দেন। মহেন্দ্রনাথ এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে বরাবর ইহাতে তন্ময় ছিলেন। ঔষধ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, হাসপাতালের চিকিৎসক ও কমিটির সদস্য ছিলেন এবং অন্যূন ২০ বৎসর কাল বৎসরে বৎসরে কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যভার (Administration work) আর জি করের হস্তে ছিল এবং তিনি ইহার জন্য বহু পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে যখন স্কুলকে কলেজ করিবার প্রস্তাব হয় ও

গভর্ণমেণ্টের সহিত স্কুলের প্রতিনিধিদিগের দার্জ্জিলিংএ পরামর্শ চলে, তখন হইতে সমস্ত ভার মহেন্দ্রনাথের উপর পড়ে। সাত বৎসর অসীম পরিশ্রম, বিপুল অধ্যবসায় ও অবিরাম চেষ্টায় এবং গবর্ণমেণ্ট (Government) ও সাধারণের অর্থ সাহায্যে তিনি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ও স্থায়ী ভিত্তিতে গঠিত করিতে সক্ষম হন। ইহাতে অনেকে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু সকল বিষয়ে যেমন একজন সাধক না হইলে কার্য্য হয় না, তিনিও সেইরূপ ইহা তাঁহারই কার্য্য বলিয়া দিনরাত্রি ইহারই বিষয় ভাবিতেন ও ইহারই কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। সরকারী সাহায্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযোগ লাভে (Govt. grant ও University affiliation) এর পথে যে কত বাধা বিপত্তি উঠিয়াছিল ও কিরূপে তিনি সে সকল অতিক্রম করিয়াছিলেন সে সমস্ত বিস্তারিত বলিলে একটী উপন্যাসের মত শুনিতে হয়। ১৯১৫ সালে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) পদে নিযুক্ত হন এবং ৮ বৎসর সেই কার্য্য করিয়া ১৯২২ সালে অবসর লন। অবসর লইবার সময় কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দেন। তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহা লেখা ছিল, 'During the struggling period of nearly 30 years amidst trials and difficulties, when most of your Co-workers deserted you, you Sir and your companion—at arms, the late Dr. Kar never wavered, because of your conviction, that an institution which depended for its existence and maintenance on self-sacrifice and self-help, could never perish. You Sir, must be filled with gratification and pride to-day at the great possibility of this institution ranking as one of the foremost centres of medical learn-

ing and research, has already been vouchsafed unto us—a vision that is found to inspire your successors in office in the performance of their arduous duties."

মহেন্দ্রনাথ কিছুদিন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর ছিলেন। যখন প্লেগ মহামারী হয়, তিনি গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটীর জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ছোটলাট স্যার জন উডবর্ণ এবং ওয়াডে'র কার্য্য দেখিতে আসিয়া ইহা জানিতে পারেন এবং সম্পাদক (Secretary) এডওয়ার্ড বেকারের দ্বারা তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া একটী সুন্দর চিঠি লিখেন। ১৯১৬ সালে যখন স্যার পারডে লিউকিস (Sir Pardey Lukis) ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলে (Imperial Council) মেডিক্যাল ডিগ্রী বিল (Medical Degree Bill) আনয়ন করেন তখন মহেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া আইন সভার সদস্য পদে নিযুক্ত হন। মেডিকেল ডিগ্রী আইন সম্বন্ধে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন এবং এই আইন সভায় তিনি একটী প্রস্তাব করেন যে, গভর্ণমেণ্ট পুনরায় বাঙ্গালা মেডিকেল স্কুল স্থাপনা বা স্থাপনার সাহায্য করুন। পূর্ব্বে ক্যাম্বেল স্কুলের (Cambell School বাঙ্গালায় পাশ করা ডাক্তারদের দ্বারা পল্লীগ্রামের কত উপকার হইত ও বাঙ্গালায় শিক্ষা দিলে অল্পব্যয়ে ডাক্তার হইতে পারিবে ও অল্প দক্ষিণাতে ডাক্তারি করিতে পারিবে এবং পল্লীগ্রামে ডাক্তারের অভাব অনেক লাঘব হইবে এই সকল বিষয় গভর্ণমেণ্ট ও আইন সভায় বুঝাইয়া এবং স্যার পারডে লিউকিসের সাহায্যে তিনি সেই প্রস্তাব ভারত সরকার হইতে পাশ করাইয়া লন। কিন্তু বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের সহিত একমত না হওয়ায় সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল না।

মহেন্দ্রনাথ যখন বেঙ্গল মেডিকেল এসোসিয়েসনের (Bengal Medical Association) এর সভাপতি ছিলেন, তখন একটী (depu-

tation) ডেপুটেশন্ এর নেতা হইয়া মিনিষ্টার স্যার সুরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া যাহাতে সরকারী হাসপাতালগুলিতে অনারারি ফিজিসিয়ান ও সার্জন (physician ও surgeon) নিযুক্ত হয়, তাহার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাহা করিবেন বলিয়াছিলেন। এই ডেপুটেশনে স্যার নীলরতন সরকার, ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র ও মেজর সুরওয়ার্ডি ছিলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ একদিন মহেন্দ্রনাথের সম্মুখে সার্জ্জন জেনেরেলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে তাঁহার কি মত। সার্জ্জন জেনেরেল বলেন,মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে বরাবর সরকারী কর্মচারী হইতেই লোক লওয়া হয়, বাহিরের লোক লওয়া সরকারের ইচ্ছা নয়। তখন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বলেন "In this case I am the Government". Surgeon General বলেন, "আপনি হুকুম করিলে আমি করিতে বাধ্য।" সুরেন্দ্রনাথের আদেশে সার্জ্জন জেনেরেল একদিন মহেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে মেডিকেল কলেজের পরামর্শকারী চিকিৎসক (Consulting Physician) করিতে চাহেন। কিন্তু সেই পদের সহিত In door beds দেওয়া হইবে না ও Out door physician এর মত কার্য্য করিতে হইবে শুনিয়া মহেন্দ্রনাথ তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাহার পর আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচন আরম্ভ হয় এবং স্যার সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী পদ হইতে অবসর লওয়ার পর হইতে এ বিষয়ে আর কোন চেষ্টা হয় নাই।

কয়েক বৎসর হইতে সমস্ত ভারতবর্ষেই আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসা লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। বঙ্গীয় আইন সভায় এ বিষয়ের অনেকবার চর্চ্চা হইয়া একটী প্রস্তাব পাশ হয়। তদনুসারে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট একটী কমিটী নিযুক্ত করেন। কিরূপে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিয়া বর্ত্তমান সময়ের উপযুক্ত করা যাইতে পারে ও কিরূপ উপায়ে শিক্ষা দিলে শিক্ষায় উত্তীর্ণ চিকিৎসকগণ দ্বারা দেশের উপকার হইতে

পারে, এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া মতামত দিবার জন্য এই আয়ুর্ব্বেদীয় কমিটীর (Ayurvedic committee) প্রয়োজন হয়। মহেন্দ্রনাথ ইহার সভাপতি নিযুক্ত হন। বহু প্রসিদ্ধ লোক লিখিয়া বা সাক্ষ্য দিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত কমিটীর নিকট ব্যক্ত করেন। সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কমিটী একটী রিপোর্ট দিয়াছেন। কমিটী বলিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ সংস্কার ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সাহায্য করা উচিত। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এখনও কিছু স্থির করেন নাই।

মহেন্দ্রনাথ অনেক বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মেম্বর সদস্য (fellow) আছেন। মধ্যে মধ্যে সিণ্ডিকেটেরও সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। State faculty of medicine ও Bengal council of Medicine এর মেম্বর পদেও অনেক বৎসর ছিলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধীয় শিক্ষা বিষয়ে তিনি বহু দিন যাবত যেরূপ অগাধ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং Medical relief ও Medical act সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সুপরামর্শ দিয়াছিলেন ও সাহায্য করিয়াছিলেন এবং কারমাইকেল কলেজ স্থাপনায় নেতৃত্ব লইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন সেই সকলের যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করেন।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ নিপুণতা আছে বলিয়া অনেকে তাঁহার চিকিৎসার্থী। কলিকাতার অধিকাংশ বড় ঘরে তিনি পারিবারিক চিকিৎসক (Family physician) এবং বহু পরিবারের মধ্যে সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ও তাঁহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি আছে।

অল্প বয়সে মহেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হন। তাঁহার যখন পূর্ণ জীবন ও

যখন বিডন ষ্ট্রীটের নিজবাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন জননী পরলোক-গমন করেন। তাহার অল্পদিন পরেই স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একজন তেজস্বী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন ও আর্য্যদর্শন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার ভাষা অতি সুন্দর ও তিনি উচ্চদরের লেখক ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যখন বক্তৃতায় সমস্ত ভারত উত্তেজিত করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ ও ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি দেশ-উদ্ধারকদিগের জীবনী লিখিয়া জলন্ত ভাষায় বঙ্গীয় যুবকদিগের মনে জাতীয় ভাবের অগ্নি উজ্জল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন ও তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন। মহেন্দ্রনাথের দুই কন্যা ও এক পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রভাবতী তিন কন্যা রাখিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া জীবন ত্যাগ করেন। কনিষ্ঠা কন্যা শোভাবতী স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া কলিকাতাতেই বাস করেন। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার এবং মার্টিন কোম্পানির কাজ করেন। পুত্র সুধীন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার (S. N. Banerjee junior) ও কেম্বি্রজের বি, এ। বিজ্ঞান ও অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ও সকল নূতন আবিষ্কারে তাঁহার সম্পূর্ণ অভিনিবেশ আছে। সুধীন্দ্রনাথ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ দশম বর্ষীয় বালক ও সেণ্ট জেভিয়ার কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র।

আরপুলীর ঘোষ বংশ।

এই সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের কলিকাতায় আদি বাস ঠণ্‌ঠণে কালীতলা। কলিকাতায় বাসস্থান হইবার পূর্ব্বে এই বংশের বাসস্থান ছিল—গোবিন্দপুরে; সেখানে এখন ফোর্ট উইলিয়াম। এই বংশের আদিপুরুষ মকরন্দ ঘোষ। ছয় পর্য্যায় এই বংশে দুই ভ্রাতা ছিল, প্রভাকর এবং নিশাপতি। প্রভাকর হইতে আকনা সমাজ ও নিশাপতি হইতে বালি সমাজ উদ্ভূত হইয়াছে। আরপুলীর ঘোষ বংশ বালি সমাজভুক্ত। আঠার পর্য্যায় এই বংশে দুই ভ্রাতা ছিলেন, মহাদেব ও ভবানীচরণ। তাঁহাদেরই শেষ বাস গোবিন্দপুরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গোবিন্দপুরে ফোর্ট উইলিয়াম্ স্থাপন করিবার মনস্থ করিলে সেখানকার সকল বাসিন্দাকে গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিতে হইল। গোবিন্দপুরের বাসিন্দাদিগকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যাহার যেখানে বাস করিবার ইচ্ছা সেখানে জায়গা লইবার অধিকার দিয়াছিলেন। উক্ত দুই ভ্রাতার মধ্যে মহাদেব কলিকাতায় বাস মনোনীত করিলেন এবং ভবানীচরণ বরিষা বেহালায় বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলেন। তখনকার কালে গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের কলিকাতায় বাসস্থান গ্রহণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মারফত কোনও দলিলাদি গ্রহণ করিতে হইত না। মহাদেবও কলিকাতায় আসিয়া আরপুলীতে (যাহা এখন ঠণ্‌ঠণে কালীতলা বলিয়া বিখ্যাত) নিজের আবশ্যক মত জায়গা লইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখন কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। কলিকাতার আদি বাসস্থান ঠণ্‌ঠণে কালীতলায়ও বংশের কয়েকটী শাখা এখনও বাস করিতেছেন। মহাদেবের ভ্রাতা ভবানীচরণের বংশধরগণও অনেকে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিয়াছেন।

জোড়াসাঁকোর গিরীশচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বংশ ও সিমলার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ আদি ভ্রাতৃগণের বংশ উক্ত ভবানীচরণের বংশ-সম্ভূত।

কুড়ি পর্য্যায় মহাদেবের বংশধর দৈবকীনন্দন ঘোষ ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। দুই পুত্র উদয়রাম ও গোরাচাঁদ অপুত্রক ছিলেন। আর তিন পুত্র, লক্ষ্মীনারায়ণ, মনোহর ও গোকুলের সন্তান সন্ততি ছিল। তাঁহাদেরই বংশধরগণ বর্ত্তমান আরপুলীর ঘোষবংশ। এই প্রাচীন বংশের কলিকাতায় 'বন কেটে বাস' এবং কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য বংশের সহিত এই বংশ কুটুম্বিতা-সূত্রে আবদ্ধ।

দৈবকীনন্দন ঘোষের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের শাখার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।
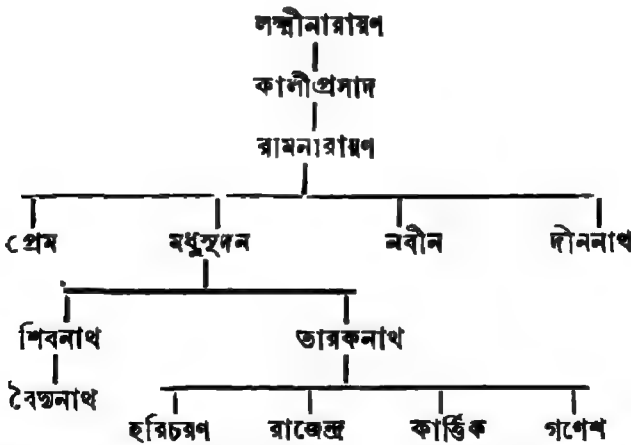
তারকনাথ ও তাঁহার চারি পুত্র ও ৺শিবনাথ ঘোষের পুত্র বৈদ্যনাথ এক্ষণে ৮৫ ও ৮৫।১ নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীটে বাস করেন।

দৈবকী নন্দনের তৃতীয় পুত্র মনোহরের বংশ তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।
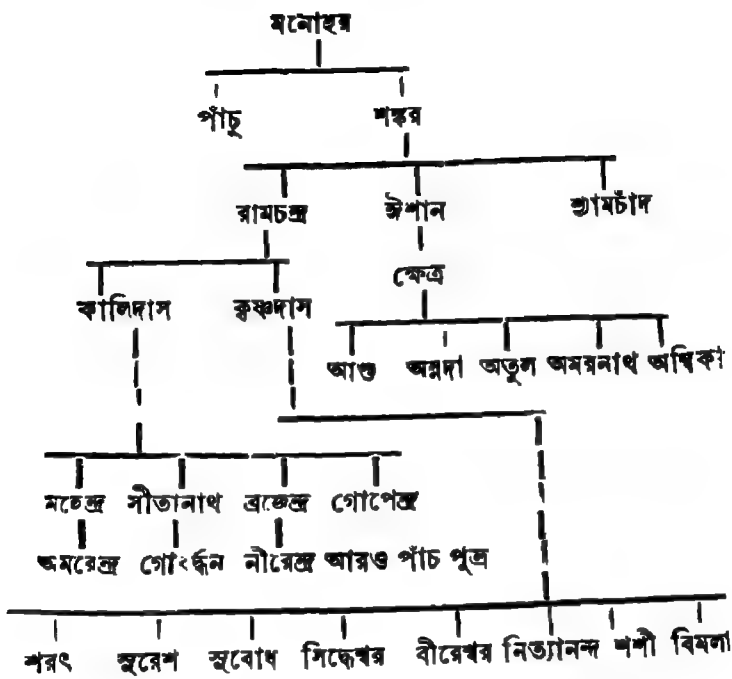
শঙ্কর ঘোষের নাম কলিকাতায় সুপরিচিত। তাঁহারই স্থাপিত শ্রীশ্রী৺ কালীমাতা। এই দেবীর জন্যই স্থানটির নাম হইয়াছে ঠণ্ঠণে কালীতলা। শঙ্কর ঘোষের নামে একটী রাস্তার নাম হইয়াছে, শঙ্কর ঘোষের লেন; যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজ স্থাপিত। রামচন্দ্র ঘোষের বংশধর অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা পুলিশ কোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল। ঈশানের পুত্র ক্ষেত্রনাথ কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার নাম কলিকাতায় কাহারও নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার পাঁচ পুত্র, সকলেই এখন গত হইয়াছেন। অন্নদাপ্রসাদ ছোট আদালতের উকিল ও অমরনাথ হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণেন্দ্রও

হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দ ডাক্তার। ইনি কুমার মন্মথনাথ মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ক্ষেত্র নাথের বংশধরগণ কতক ১২নং শঙ্কর ঘোষের লেনে আর কতক ৮৮নং বেচু চাট্যার্জ্জির ষ্ট্রীটে বাস করেন।

দৈবকীনন্দনের চতুর্থ পুত্র গোকুলের বংশ তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। গোকুল ঘোষ সেকালের একজন নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দান ধ্যান ও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার গুরুদেবের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক গরুর গাড়ী টাকা গুরুদেবের গ্রাম দক্ষিণ বারাসত পাঠাইয়াছিলেন; গুরুদেব আবশ্যক মত টাকা লইয়া বাকী টাকা ফেরত দিতেছিলেন। গোকুল ঘোষ ঘরে যাইয়া তখনই হুকুম পাঠাইয়া দিলেন যে বাকী টাকা ফিরাইয়া আনিয়া কায নাই। গুরুদেবের গ্রামে একটী দীঘি খনন করাইয়া দাও। এখনও ঐ দীঘি দক্ষিণ বারাসত গোকুল ঘোষের গঙ্গা বলিয়া বিখ্যাত।

গোকুলে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গা প্রসাদ ও তৃতীয় পুত্র দর্পনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন,। দ্বিতীয় পুত্র শিবপ্রসাদের বংশতালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

যদুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজেন্দ্র প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন এবং মৃত্যু সময়ে কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারী (Personal assiststant to the Commissinor of Chittagong) ছিলেন। যদুনাথের কনিষ্ঠ সহোদর রসিকলাল Chief superintendent of Postal accounts ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অবিনাশ এক্ষণে assistant accounts officer post and Telegraph, Government of India.

শিব প্রসাদের বংশধরগণ পূর্ব্বে শঙ্কর ঘোষের লেনে বাস করিতেন। এক্ষণে তাঁহারা কলিকাতার নানাস্থানে বাস করিতেছেন। রাজেন্দ্র বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে নিজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছিলেন। অবিনাশ কালীসিংহের লেনে বাটী ক্রয় করিয়াছেন। বিনোদের পুত্রেরা এক্ষণে মোহন বাগান রোডে নিজ বাটীতে বাস করিতেছেন।

গোকুলচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র রাজকিশোরের বংশ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

স্বর্গীয় নকড়ি ঘোষ।

স্বর্গীয় শ্রীনাথ ঘোষ

(১) রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর (২) রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর (৩) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ঘোষ (৪) রায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর (৫) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

রাজকিশোরের বংশধরগণ প্রায় সকলেই বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। হলধরের তিন পুত্রই কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠ তিনকড়ি Public works Department এর এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি বিডন ষ্ট্রীটের কাশীনাথ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অমূল্য অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুকড়ি ডাক্তার ছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি Calcutta Medical College হইতে L. M. S. পাস করেন। তিনি কিছুকাল Goverment এর চাকরী করিয়াছিলেন। তারপর কলিকাতায় ডাক্তারী করিতেন। কলিকাতার পুরাতন ডাক্তারগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা ১৮৯২ সালে Calcutta Universityর বি, এ পাস করেন। দুকড়ি বাবুর জামাতা বাবু জয়কালী দত্ত এক্ষণে রাঁচির খ্যাতনামা উকিল। দুকড়ি বাবুর পুত্র জ্ঞানচন্দ্র এক্ষণে নাগপুরের Advocate; হলধরের কনিষ্ঠ পুত্র অনন্তরাম সব জজ ছিলেন। এক পুত্র প্রমথনাথকে রাখিয়া তিনি ১৯০৮ সালে স্বর্গারোহণ করেন। হলধরের এক কন্যা ছিল। কন্যার বিবাহ হইয়াছিল বহুবাজারের বিখ্যাত উকিল বাবু শ্রীনাথ দাসের সহিত। অনন্তরামের পুত্র প্রমথ এখন ৮৯নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ক্ষীরোদচন্দ্র এখন জীবিত আছেন।

কনিষ্ঠ সাতকড়ি গত হইয়াছেন। ইহারা এক্ষণে হাওড়ায় বাস করিতেছেন।

কৈলাস চন্দ্রের একমাত্র পুত্র শিরীষ চন্দ্র তাঁহার মাতামহ প্রদত্ত রামতনু বোসের লেনের বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার এক পুত্র বর্ত্তমান উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। কৈলাসচন্দ্র দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের বিবাহ হইয়াছিল বহুবাজারের বিখ্যাত এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের পিসির সহিত। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন—সিমলার রামতনু বসুর কন্যাকে।

বেণীমাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র নকড়ির নাম কলিকাতায় কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার ন্যায় সাফল্য প্রাপ্ত শিক্ষক কলিকাতায় খুব কম ছিলেন। তিনি কলিকাতার Seal's free স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার আমলে তিনি স্কুল হইতে যত ছাত্র Universityর পরীক্ষায় পাঠাইতেন সকলেই পাস করিত এবং অনেকেই Scholarship পাইত। ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। বেণী মাধবের দ্বিতীয় পুত্র খগেন্দ্র Bengal Doars Railway এর Coaching Section এর বড় বাবু। তৃতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বি, এ পাস করিয়া অনেক রকম হিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। ইনি চিরকুমার। কলিকাতায় যাহাতে মদ্যপান নিবারণ হয় সে বিষয়ে ইহার যথেষ্ট চেষ্টা। আজ ৩৩ বৎসর ইনি International Order of good Templars সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। কলিকাতায় পতিতা স্ত্রীলোকদিগের সৎপথে আনিবার সংকল্পে ইনি বদ্ধপরিকর আছেন এবং এই বিষয়ে একখানি পুস্তিকা ইংরাজীতে প্রণয়ন করিয়াছেন। বইখানির নাম 'The social evil in Calcutta and Methods of treatment.

কনিষ্ঠ পুত্র গোপেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতার Jessop & Co র আফিসে Accounts Department এর বড় বাবু।

শ্রীনাথের ছয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভোলানাথ হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি গত হইয়াছেন। মধ্যম যোগেন্দ্রনাথ এম, এ, বি, এল। তিনি District and sessions জজ ছিলেন। এখন পেনসন প্রাপ্ত। তাঁহার ছয় পুত্র, তৃতীয় পুত্র খগেন্দ্রনাথ বিলাত যাইয়া ডাক্তারী শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি Edinburgh University র M. B C' M. I. ভবানীপুরে চিকিৎসা ব্যবসা করেন। চতুর্থ সতীশচন্দ্র Glasgow University B. Sc র ইঞ্জিনিয়ার। শ্রীনাথের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ এখন পেন্‌সন প্রাপ্ত Deputy Collector ; চতুর্থ পুত্র নগেন্দ্রনাথ Bengal Goverment আফিসে কর্ম্ম করিতেন, এখন পেনসন্ লইয়াছেন। পঞ্চম পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের অফিসে সুখ্যাতির সহিত চাকুরী করিয়া Director of statistics পদে উন্নত হইয়াছিলেন, ইনি সম্প্রতি এগ্রিকল্‌চারাল রয়্যাল কমিশনের statistician হইয়াছেন। ষষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ এক্ষণে মুন্‌সেফ্। শ্রীনাথের পুত্রের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্টের নিকট "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন।

হাওড়া খুরুট কালিকুণ্ডু লেনস্থ প্রসিদ্ধ গন্ধ বণিক বংশের বিবরণ।

আর্য্যাবর্ত্ত হইতেই প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্তানের এতদ্দেশে আগমন হয়। তন্মধ্যে কোনও সওদাগর বংশ-সম্ভূত কোনও অবিজ্ঞাত পুরুষ বাণিজ্যার্থে নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক নিজ ব্যবসার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় তাঁহার বংশের কোনও পুরুষ প্রথমে বাণিজ্য করিতে কাণা নদী তীরস্থিত হুগলীর অন্তর্গত প্রসিদ্ধ জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে আগমন করেন এবং উক্ত স্থানে পুরুষানুক্রমে উঁহারা বসবাসও করেন। তাঁহার মধ্যে কোনও পূতচরিত অবিজ্ঞাতনামা পুরুষের দুই পুত্র, প্রথম রাধাকৃষ্ণ, দ্বিতীয় জয়কৃষ্ণ, তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণের চারিটি পুত্র, ১ম বৈদ্যনাথ, ২য় গুরুপ্রসাদ, ৩য় প্রভুরাম ও ৪র্থ রামরতন। এই রামরতনের আবার তিন পুত্র—১ম রামধন, ২য় যদুনাথ, ৩য় প্যারিমোহন। এই রামধন কুণ্ডুর দুই পুত্র—১ম রামকুমার, ২য় কালিকুমার। এতন্মধ্যে রামধন কুণ্ডু মহাশয়ই প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে দুই পুত্র সমভিব্যাহারে হাওড়ায় আগমন করিয়া নিজ প্রযত্নে নানাবিধ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া দৈবকৃপায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক এখানে একজন প্রখ্যাতনামা হইয়া উঠেন। ইহার মৃত্যুর পর কৃতী জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার "ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডকের" অধীনে বন্দুকের ও অহিফেনের এবং টিম্বারের কারবার প্রভৃতিতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ঐ সম্পত্তির আরও অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। শ্রীবৃদ্ধি হইলে যেমন হয়, শত্রুও অনেক জুটে। ইহার মধ্যে স্থানীয় জমিদারদিগের সহিত ইহার কতকটা ভূমি সম্পত্তি লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত হয়, এতদর্থে ইনি মহামান্য প্রীভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত-জয়লাভ করেন। ইঁহার দেবদ্বিজে যথেষ্ট ভক্তি ছিল, ইনি গৃহদেবতা

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার কুণ্ডু

শালগ্রামগতপ্রাণ ছিলেন। মোকদ্দমার সময় নিবেদন করিতেন, "ঠাকুর এসব সম্পত্তি আপনার, আমি একটা উপলক্ষ মাত্র, আপনার দাসানুদাস, ক্ষুদ্র জীব, আপনি যাহা বিধান করিবেন তাহাই হইবে, আমি কিছুই জানি না।" ইনি ঠাকুরের যাবতীয় ক্রিয়া করিতেন, দোল-দুর্গোৎসবও করিতেন। ইনি স্থাবর অস্থাবর প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া ৬৪ বৎসর বয়সে দেহলীলার শেষ করেন।

ইহার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিকুমার উক্ত সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করেন ও জীবিতকাল বিশেষ সম্মানের সহিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি হাওড়ার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কমিশনার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বোল্লিখিত রামকুমার যেমন ভাগ্যবান্ তেমনি উচ্চমনা ছিলেন। তৎকারণ তিনি নিজের কন্যা না থাকিলেও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণকে উচ্চবংশ-সম্ভূত সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রিষড়া নিবাসী মৃত রায় গোপালকৃষ্ণ দাঁ বাহাদুরের (Retired Executive Engineer) সহিত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ কতক রিষড়ায় এবং কতক হাওড়ায় বাস করিতেছেন। মধ্যমা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে পটলডাঙ্গানিবাসী ৺ কাশীনাথ দার বংশধর ৺ মহেন্দ্রনাথ দাঁর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তৃতীয়াটির ক্ষিরপাইনিবাসী প্রসিদ্ধ হালদার বংশীয়দের বাটীতে বিবাহ দিয়াছিলেন। উক্ত রামকুমার কুণ্ডুর একমাত্র পুত্র সারদাপ্রসাদ কুণ্ডু। ইনি বড় সুসভ্য ফিটফাট্ বিলাসী মানী বাবু ছিলেন। সম্পত্তি কিছু বাড়াইতে না পারিলেও কিছু অপচয় না করিয়া সন ১৩১৩ সালে দেহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার কুণ্ডু, ইনি হাওড়ার বর্ত্তমান অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, উপস্থিত বক্তা, সদ্বিচারক, শিষ্ট ভদ্র এবং রহস্যবিদ ও সকল লোকের মনোভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ইহারই

বিশেষ চেষ্টায় "কুণ্ডু ফ্যামিলী" নামক পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন কি বাঙ্গালার সরকার বাহাদুর নিজ ব্যয়ে উক্ত লাইব্রেরীতে কলিকাতা গেজেট ও অন্যান্য প্রকাশিত পুস্তক দিয়া থাকেন। এ কারণ স্থানীয় জনসাধারণের কাগজপত্র ও বিবিধ পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। বড়ই কষ্টের কথা, এই অল্প বয়স্ক পুরুষের পত্নী সপ্তকন্যা ও এক মাত্র পুত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ কুণ্ডুকে রাখিয়া গত ১৩৩১ সালের ৪ঠা আষাঢ় পরলোকগত হইয়াছেন। শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার এই মহাশোকে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচল ও অটল হৃদয়ে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কালীকুমার কুণ্ডুর একমাত্র পুত্র চন্দ্রকুমার কুণ্ডুরও ৪টি কন্যা। কন্যাগুলি কে কোথায় বিবাহিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রকুমার কুণ্ডু একজন সুদক্ষ বিচক্ষণ সংসারী পুরুষ ছিলেন। ইনিও সম্পত্তির বিশেষ কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি না করিয়া দেহলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার ৮টি পুত্র। ১ম শরৎ (মৃত) ২য় সুরেন্দ্র; ইহার দুই পুত্র—সন্তোষ কুমার কুণ্ডু এক্ষণে নাবালক, ইহার কনিষ্ঠ খোকা। ৩য় নরেন্দ্র, ইহার দুই পুত্র অজিৎ কুমার ও সুজিৎ কুমার, আর ৫টী কন্যা। ৪র্থ দেবেন্দ্র, ইহার ৩টি পুত্র—পঞ্চানন চণ্ডী ও অভয়চরণ এবং ১টি কন্যা। ৫ম জ্ঞানেন্দ্র, ইহার ২টি পুত্র ও তিনটি কন্যা। ষষ্ঠ মনীন্দ্র ইহার ১ পুত্র, গণেশ ও দুটি কন্যা। ৭ম ননীন্দ্রের এক মাত্র কন্যা। ৮ম কনিষ্ঠ ভুপেন্দ্র অবিবাহিত।

উল্লিখিত সারদা প্রসাদ ও চন্দ্রকুমার এযাবৎ একত্রে নির্ব্বিবাদে দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। সম্প্রতি ২ বৎসর হইল পরস্পর পৃথক হইয়াছেন। এতাবৎ ইঁহারা সম্পত্তির ক্ষয় না করিয়া যে সুখেসচ্ছন্দে ভোগ করিতেছেন ইহা প্রশংসার কথা এবং ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যের কথা ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই

শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায়।

বর্দ্ধমান জিলাস্থ কাটোয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায়ের বংশ তালিকা।

গঙ্গানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ
|
রামকৃষ্ণ ন্যায়রত্ন
|
নীলকণ্ঠ ন্যায়বাগীশ
|
উমাকান্ত বাচস্পতি
|
ভবানন্দ বিদ্যাবাগীশ
|
সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়
|
দীনদয়াল চট্টোপাধ্যায়—ইনি ১২৯৭ সালে শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জিউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৩০০ সালে ৭ই চৈত্র ৺ধাম গমন করেন।

- যদুপতি
  - প্রভাদ
  - নিবারণ
  - বৃন্দাবন
- রঘুপতি
  - গোবিন্দ দেব
- রমাপতি
  - গোবিন্দমাধব
  - গোবিন্দগোপাল
  - তুলসী
  - অগুরু
  - ভৃগুরাম
- ভুবনপতি
  - গতিগোবিন্দ
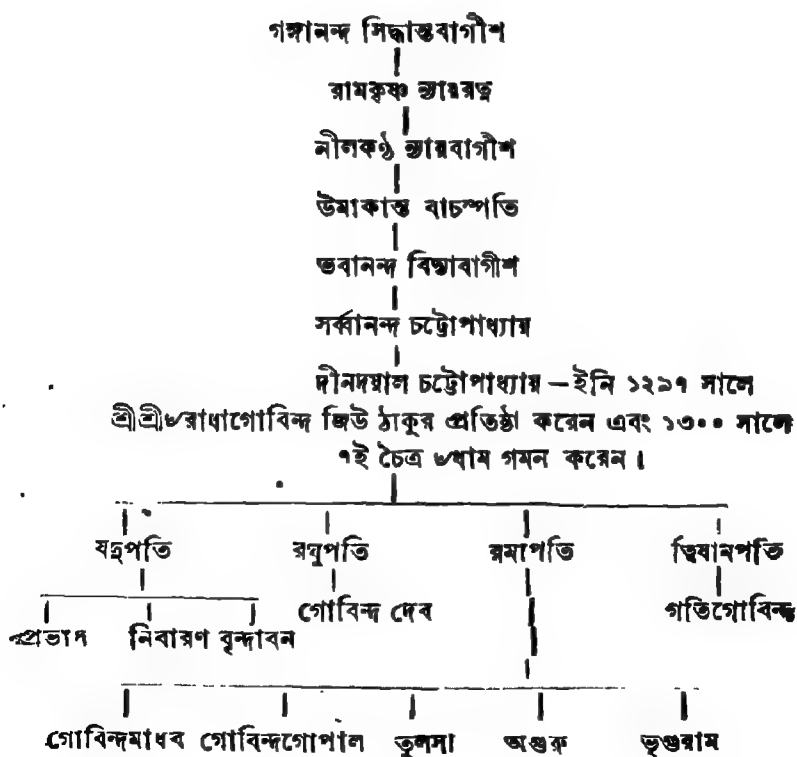
মুর্শিদাবাদ ফতেসিং পরগণার খোন্দকার বংশ।

মুর্শিদাবাদের মধ্যে ফতেসিংহের খোন্দকার বংশ অতি প্রাচীন বংশ। ইহাঁরা প্রথম খালিফ আবু বকরের পুত্র মহম্মদের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহম্মদ ইজিপ্টের গবর্ণর ছিলেন। মহম্মদের একজন বংশধর—খাজা মহম্মদ সারে আরব পরিত্যাগ পূর্ব্বক খোরাসানে বাস করেন। তাঁহার বংশধর শাহ রুস্তম চেঙ্গিজ খাঁয়ের অত্যাচারে খোরাসান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে বাধ্য হন। শাহ রুস্তম সেই সময়ে সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সম্রাট শাহ আলম শাহজীর সমাধির ব্যয়ের জন্য বেশ মোটা রকমের টাকার বরাদ্দ করিয়াছিলেন; এই সম্পর্কে সম্রাট্ যে "ফার্ম্মাণ" দিয়াছিলেন, তাহা এখনও ইঁহাদের বাটীতে আছে। শাহ রুস্তমজীর পুত্র ও পৌত্র শাহ শিয়া জিয়াউদ্দীন ও শাহ সুরাজুদ্দীন বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত।

সুলতান গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বকালে সুরাজুদ্দীন "কাজী উল কুজ্জত" বা দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন সুলতান সেকেন্দারের পুত্র ছিলেন। ১৩৬৭—১৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা ছিলেন।

বাঙ্গালার ইতিহাসে ষ্টুয়ার্ট প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ কাজি সুরাজুদ্দীন সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্যজনক গল্প লিখিয়াছেন। গল্পটী এই—একদা সুলতান গিয়াসুদ্দীন শর চালনা বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় হঠাৎ এক বিধবার পুত্রের অঙ্গে সেই শর লাগায় পুত্রটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিধবা কাজি সুরাজুদ্দীনের নিকট অভিযোগ করিলে কাজী তৎক্ষণাৎ সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে শমন দেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন শমন পাইয়া কাজীর

খানবাহাদুর ফজলুল হক।

নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেলাম দেন এবং দোষ স্বীকার করেন। কাজীর আদেশে সুলতান বিধবাকে উপযুক্ত অর্থ দণ্ড দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। আদালত হইতে যাইবার সময় সুলতান গিয়াসুদ্দীন কাজীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আজ যদি তুমি আমাকে "রাজা" বলিয়া অব্যাহতি দিতে এবং শমন জারি করিতে ভয় করিতে তাহা হইলে এই বেত্রাঘাতে তোমার শরীর খণ্ড বিখণ্ড করিতাম। কাজীও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আজ যদি রাজা বলিয়া তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক আমি দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতাম।"

বলা বাহুল্য কাজীর এই দৃঢ়তাব্যঞ্জক উক্তিতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

কাজী সুরাজুদ্দীনের পৌত্র শাহ আজিজুল্লা নুর কুলবল আলামের খালিফ পদের উত্তরাধিকারী হন। তিনি একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধু ছিলেন এবং বঙ্গের রাজা প্রজাদের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। *

শাহ আজিজুল্লার নামের পরেই প্রথমে "খোন্দকার" উপাধি সংযুক্ত হয়। তাঁহার সময় হইতেই এই বংশ মুসলমানদের ধর্ম্মগুরুর কাজ করিতে থাকেন। কয়েক পুরুষ বংশপরম্পরায় এই বংশ ধর্ম্ম গুরুর কাজ করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত এই বংশের একটী শাখা—মুর্শিদাবাদ জেলার বিনোদিয়া গ্রাম নিবাসী খোন্দকারেরা পিতৃপুরুষের সেই গুরুগিরি কর্ত্তব্য করিয়া আসিতেছেন। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, যশোহর, ফরিদপুর, নদীয়া, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, খুলনা ও চব্বিশ-পরগণায় তাঁহাদের শিষ্য আছে।

গৌড়ের রাজা ও বাঙ্গালার সুবাদারের নিকট হইতে খোন্দকারেরা অনেক "আয়মা' ও লাখেরাজ সম্পত্তি অর্থাৎ নিষ্কর জমি লাভ করিয়া-

---

* Vide stewart's "History of Bengal" and the Ain-i-Akbari

ছিলেন। এখনও কিছু কিছু তাঁহাদের বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন। এই সম্পর্কে শাহ সুজা, শাহাজাদা মহম্মদ আজিম, সায়েস্তা খাঁ ও মুর্শিদকুলী খাঁ ১৬৫৯, ১৬৮০, ১৬৬৫ ও ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে যে সনদ দিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও ইহাঁদের ঘরে আছে। মুসলমান রাজত্ব কালে এই বংশের ব্যয় উক্ত জমা জমির দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। খোন্দকারেরা কখনও চাকুরী গ্রহণ করিতেন না। যদি কখনও চাকুরী গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে "কাজী" ছাড়া অন্য পদ গ্রহণ করিতেন না।

এদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে এই খোন্দকার বংশের কয়েক জন সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং বাঙ্গালার নবাব নাজিমের অধীনেও তাঁহারা কেহ কেহ চাকুরী করিয়াছিলেন।

এই বংশের কয়েক জন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সম্মানজনক পদে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রিটিশ দপ্তরে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে ফার্সী ভাষার প্রচলন হইলে তাঁহারা সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইস্‌লাম ধর্ম্মে নিষেধ থাকায় তাঁহারা ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। আজকাল খোন্দকার বংশের অনেক যুবক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, সরকারের অধীনে তাঁহারা চাকুরীও পাইতেছেন, ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বা ইংরাজী ভাষা জানেন না, আরবী ও পার্শী ভাষাতেই তাঁহারা সুপণ্ডিত। তাঁহারা পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত গুরুগিরি করেন। তাঁহারা উত্তরাধিকার-সূত্রে জমি জমা লইয়াছেন। ইহাঁদের বিবাহাদি আপন বংশে ছাড়া অন্য কোথাও হয় না।

খোন্দকার বংশের পূর্ব্ব পুরুষেরা কিছুকাল গৌড়ে বাস করিতেন। গৌড়ের অধঃপতনের সময় তাঁহারা গৌড় পরিত্যাগ করেন এবং ফতেসিংহ, সরকার ও সারিফাবাদে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখন মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ফতেসিংহের অন্তঃপাতী নিম্ন

লিখিত গ্রাম সমূহে বাস করিতেছেন। যথা সলার, ভরতপুর, শিজগাঁও, তালিবপুর, সাপুর, বিনোদিয়া, মনসুরপুর, সিয়াদকুলু দিয়া, তালেগাঁও ও জজান। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—বিনোদিয়ার শাহ আবদুল হক সাহেব, সাহাজাদা নসীম মৌলবী মবু দীন হোসেন, তাঁহার ভ্রাতা মৌলবী মেদি হোসেন (সিজ-গাঁওয়ের জমিদারগণ) মৌলবী ফজলুলহক (ভরতপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) দেওয়ান ফজলী রব্বি খাঁ বাহাদুর ও শাহ ফরহাদ আলি (সলারের জমিদারগণ) ইহাঁদের সকলেই মৃত, কেবল খাঁ বাহাদুর হাজি খন্দোকার ফজলুল হক জীবিত। ইহাঁদের সন্তান সন্ততি আছে। খাঁ বাহাদুর আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার তিন পুত্র খোন্দকার ফজলে হাইদার, ফজলে আকবর ও ফজলে শোভান। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পুত্র বিলাতে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ খোন্দকার গোলাম মোর্সেদ সিবিলিয়ান অন্যান্য অনেকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ফতেসিংহের খোন্দকার বংশ ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও বিখ্যাত বংশ। এই বংশের সকলেই শিক্ষিত হইয়াছেন এবং বঙ্গদেশীয় সরকারের অধীনে অনেক উচ্চ পদে কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁরা পিতৃপুরুষের কীর্ত্তি ও গৌরব বজায় রাখিয়াছেন।

সিমুলিয়া বিশ্বাস বংশ।

সিমুলিয়া বিশ্বাস বংশ অতি পুরাতন ও প্রাচীন বংশ। সুবা বাঙ্গালা যখন মুসলমানের অধীন, বিশ্বাস বংশের তখন গোবিন্দপুরে বসতি ছিল পরে পলাশীক্ষেত্রে ভাগ্যবিধাতা যখন ইংরাজের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন তখন ঐ গোবিন্দপুরেই ইংরাজ দুর্গ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। এই সম্পর্কে বিশ্বাস বংশ গোবিন্দপুর ছাড়িয়া সিমুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন। বিডন-ষ্ট্রীটস্থ "শিব বিশ্বাস লেন" এই বংশেরই পরিচায়ক। ইহাঁদের প্রকৃত উপাধি 'দে'। মুসলমানদিগের আমলে ইহাঁদের উপাধি ছিল "বিশ্বাস। "দে" বংশ আলম্বায়ন গোত্রীয় কর্ণসোনা সমাজভুক্ত। অতি প্রাচীন বংশ হইলেও বংশের সাত পুরুষের পূর্ব্ব ইতিহাস সংগ্রহ করা সুকঠিন; সেইজন্য "দে" বংশের বংশধর গোকুলচন্দ্র হইতে আমরা এই বংশের শাখাক্রম নির্দ্দেশ করিতেছি।

গোকুল চন্দ্র।

গোকুল চন্দ্রের মধ্যম প্রপৌত্র চিন্তামণি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বানহাউসের মুচ্ছুদ্দী এবং প্রখর ব্যবসা বুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক রাজা দিগম্বর মিত্র, প্রসিদ্ধ ধনকুবের মতিলাল শীল, শোভা-বাজার রাজবংশের বংশধর রাজেন্দ্র নারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ চিন্তামণির অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। চিন্তামণির এক জামাতা ছিলেন ৺নবগোপাল মিত্র। এই নবগোপাল কলিকাতা কর্পোরেসনের লাইসেন্‌স্ অফিসার ছিলেন। তিনিই এদেশে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর সার্কাস প্রদর্শন করেন। নবগোপালেরই উদ্যোগে National magazine প্রথম প্রচারিত হয়। চিন্তামণির অন্য এক জামাতার পুত্র ৺মহেন্দ্র নাথ বসু বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের

স্বর্গীয় চণ্ডী চরণ দে

শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র দে

একজন অদ্বিতীয় অভিনেতৃ ছিলেন। তাঁহার তুল্য অভিনেতা বোধ হয় সে সময়ে দ্বিতীয় ছিল না।

চিন্তামণির জ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখর ভীম ঘোষের লেনস্থ ঘোষ বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চণ্ডীচরণ বিদ্যা, বুদ্ধি প্রতিভা ও সততায় বংশের, দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা, স্বধর্ম্মনিরত, সদালাপী ও সদানন্দ পুরুষ অল্পই দেখা যায়। অসাধারণ মেধা ও মনীষাবলে ১৮৫৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের একজন সিনিয়র স্কলার হইয়াছিলেন। সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তখনকার দিনে শ্লাঘার বিষয় ছিল।

কলেজ ছাড়িয়া চণ্ডীচরণ বিখ্যাত ব্যবসায়ী মেসার্স কুক এণ্ড কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত হন। বিশ্বাস বংশের এই সুসন্তান আট বৎসর কাল উচ্চ সম্মানের সহিত উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এক্ষণে তাঁহারই কৃতী মধ্যম পুত্র গোবর্দ্ধন পিতৃ-আশীর্ব্বাদে ঐ বিখ্যাত কারবারের অন্যতম অংশীদার হইয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিতেছেন।

চণ্ডীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ চন্দ্র দে পূতচরিত পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অশেষ গুণের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে সলিসিটর মেসার্স মানুয়েল আগরওয়ালা এণ্ড কোম্পানীর সত্বাধিকারী ও কলিকাতা মহানগরীর একজন শ্রেষ্ঠ এটর্ণী। গণেশচন্দ্র বিশ্বাস পরিবারের মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র। পিতা চণ্ডীচরণের কখনও অর্থ স্বাচ্ছল্য ছিল না। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন এবং সামাজিক ও পারিবারিক লোকলৌকিকতায় তাহার সমস্তই ব্যয় হইত। সুতরাং তাঁহার পুত্রেরা পিতার নির্ম্মল চরিত্র বল ও সুশিক্ষা ব্যতীত কোনরূপ অর্থের উত্তরাধিকারী হন নাই। অসাধারণ অধ্যবসায়, অদম্য উদ্যম, অপূর্ব্ব পুরুষকারই গণেশচন্দ্রের

উন্নতির একমাত্র কারণ। নিজের শক্তিতে তিনি আজ উন্নতির চরম সোপানে উপনীত। বিধাতার কৃপায় ও পিতৃ-পুণ্যবলে তিনি আজ বহু লোকের অন্নদাতা পিতা। দুস্থ আত্মীয় কুটুম্বের আশ্রয়, পীড়িতের বন্ধু, অসহায়ের সহায় হইয়া গণেশচন্দ্র আজ কায়স্থ সমাজের একজন বরেণ্য ব্যক্তি। গণেশবাবু ১৩৩১ সালে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ হইলে এবং ১৩৩৩ সালে মিঃ বি এন্ মিত্র এড্ভোকেট জেনারেল হইলে ঐ দুইজন বন্ধুর অভ্যর্থনা করিবার জন্য গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডস্থ তাঁহার বৃহৎ বাগান বাড়ীতে দুইটী মজলিসের অধিবেশন করেন। সেই মজলিসে হাইকোর্টের অনেক বিচারপতি, উকিল, ব্যারিষ্টার, রাজা, রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর মিঃ কে সি দে প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে তিনি জনসমাজে কিরূপ জনপ্রিয়।

চণ্ডীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র অতুলচন্দ্র দে বি, এস্ সি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ গণেশচন্দ্রের অফিসের একজন প্রধান সহকারী। তিনিও জ্যেষ্ঠের ন্যায় উদার হৃদয় ও পরহিতৈষী।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক গণেশচন্দ্রের মাতুল দেশবিখ্যাত ধনকুবের রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর। ইঁহারই পূর্ব্বপুরুষ বাগবাজারের ৺মদনমোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। বিহারীলালই উপস্থিত উক্ত ঠাকুর বাড়ীর প্রধান সেবায়েৎ। এই বিহারীলালই বহু ব্যয়ে, বহু যত্নে ও বহু চেষ্টায় মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য জগতের সমক্ষে জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্ম্মের এক অভিনব উপহার দান করিয়াছেন।

চন্দ্রশেখরের মধ্যম পুত্র হলধর অফিসিয়াল এসাইনীর আপিসের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺খগেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের এটর্ণী, মধ্যম শ্যামাচরণ একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তৃতীয় পুত্র

শ্রীযুক্ত গণেশ চন্দ্র দে কর্ত্তৃক তাঁহার বাগান বাটীতে মাননীয়
বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা।

চারুচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়া উন্নতির প্রথমাবস্থাতেই কাল কবলিত হন। সর্ব্বকনিষ্ঠ সচ্চরিত্র, সদালাপী, স্বধর্ম্মনিরত হারাণচন্দ্র বংশগত বহুগুণের অধিকারী। নিম্নে ইহাঁদের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—
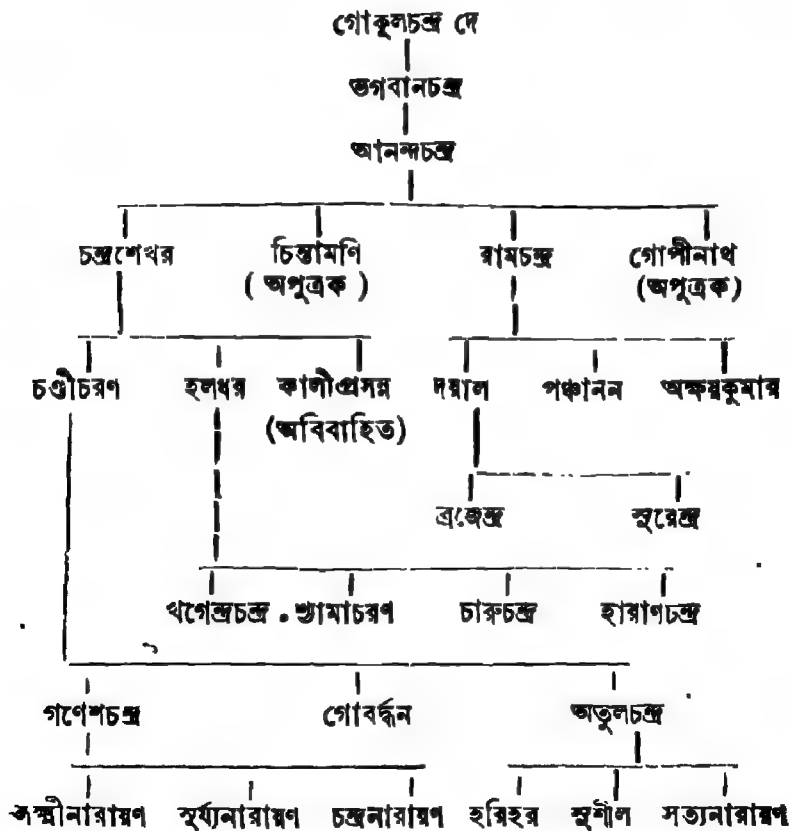
৺মতিলাল গোস্বামী

জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী নলদী গোস্বামীবংশ তত্রত্য অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গোস্বামী বংশ কুলীন "গঙ্গোপাধ্যায়" শ্রেণীভুক্ত হইলেও বহু সংখ্যক শিষ্য থাকায় বহুকাল হইতে "গোস্বামী" আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া আসিতেছেন। মতিলাল গোস্বামী মহাশয় এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুত রূপলাল গোস্বামী ও শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী। রূপলাল পূর্ব্বে ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন, এখন পৈতৃক বিষয় কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করেন। শ্যামলাল কয়েক বৎসর দৈনিক হিন্দুস্থান ও দৈনিক বসুমতীর সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে "আর্য্যাবর্ত্ত" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন। শ্যামলাল অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং সুবক্তা বলিয়াও তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে।